ভবেশ গঙ্গোপাধ্যায়

শেষপ্রান্তর



সাধারণ পাবলিশার্স

৭ ওয়েষ্ট রো :: কলিকাতা-১৭

প্রথম প্রকাশ—শ্রাবণ ১৩৬৪

সাড়ে চার টাকা

সাধারণ পাবলিশার্স, ৭ ওয়েষ্ট রো, কলিকাতা—১৭ হইতে নরেন মল্লিক কর্তৃক প্রকাশিত এবং সরোজ কুমার রায় কর্তৃক শ্রীমুদ্রণালয়, ১২-সি, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬ হইতে মুদ্রিত।

বাবা ও তাঁদের সাহিত্যিকেরা

'স্বাধীনতা'র বার্তা সম্পাদক শ্রীসুকুমার [illegible] অসীম কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁর উৎসাহ না পেলে এ বই হয়তো লেখাই হতো না। আর কৃতজ্ঞতা জানাই অধ্যাপক সুধাংশু ঘোষকে যাঁর অভিমতে সাহায্য পেয়েছি অপরিমেয়।

—লেখক

গরুটা মরছে।

সাতভিটের নবীন মণ্ডল আর তার স্ত্রী মাদারীর বুকের রক্ত দিয়ে বাছুর-কাল থেকে পালন-করা কালো রং-এর বলদ কাজলা মরছে অতি ধীরে ধীরে ওদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে, গ্রাম্য গো-চিকিৎসক আর ফকীরের দাওয়াই আর ঝাড়ফুক পায়ে ঠেলে, ওদের সন্তান-স্নেহের সবক'টি বন্ধন ছিন্ন করে।

কাজলার না-মরে উপায় নেই। আজ পাঁচ ছ'দিন ধরে গাল-গলা ফুলেছে। সবাই বলছে পশ্চিমা রোগ হয়েছে। যে-রোগে আর সব গরু মরেছে, যে-শিবের অসাধ্য রোগের হাত থেকে একটি গরুকেও বাঁচানো যাচ্ছে না, সেই রাক্ষুসে রোগের হাত থেকে-যে কাজলা বাঁচবে এমন আশা নেই কারো। তবু তো যমে-মানুষে টানাটানির হাত থেকে কাজলা রেহাই পাচ্ছে না, টানাটানির ভেতর দিয়ে অতি অনিবার্যভাবেই সে আর-দশটা গরুর মত যমরাজের বাড়ীর দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে কানন সাপে-কাটা মৃত্যুপথযাত্রী রোগীর মত অতি সুনিশ্চিত পা ফেলে-ফেলে।

কাজলার কোন দোষ নেই। এবার শ্রাবণে ধারা-বাদল নামেনি, নেমেছে পচা কাচতে। সেই থেকে সুরু করে এই অঘ্রাণের গোড়া পর্যন্ত যদি প্রকাণ্ড-দেহ একটা জীব ঘাস খড়, এমন কি ছুটো লতাপাতাও খেতে না পায়, যদি বিশ্রাম করবার জন্যে এতটুকু যায়গা না পায়, যদি রাতে ঘুমোবার ঘরের চাল দিয়ে আকাশের বৃষ্টি মাটিতে পড়ার আগে ঝর-ঝর করে সেই ঘরের ভেতরই নেমে যায়, তবে গরু কেন, কঠোর-প্রাণ কচ্ছপও বোধ হয় বাঁচতে পারে না।

এবারে জলের অভাবে ফসল হয়নি মাঠে, আমনের ধান মাড়াই-করা পল ফুরিয়ে গেছে অনেকদিন। আউষ ধান মোটেই হয়নি, তার পলেরও প্রশ্ন ওঠে না। শুধু মাঠ আর বিলের জলো ঘাস মুখ দিয়ে খুঁটে-খুঁটে সারাদিন ধরে পেট ভর্তি করার চেষ্টা, তাতে না ভরে পেট, না হয় স্বাস্থ্যরক্ষা। বর্ষা কালের জলো ঘাসে উপকারের চেয়ে অপকারই বেশী। তাই খেয়েছে সাতভিটের বিখ্যাত বনেদী মণ্ডল বংশের ছেলে নবীন মণ্ডলের সাধের কালো বলদ কাজলা আর মেটে রংএর হাবলা। নবীন এখান-থেকে সেখান-থেকে এক এক দিন শুকনো ঘাস কেটে এনেছে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা'হয়েছে সমুদ্রে পাদ্যর্ঘ বিশেষ। ফলে নবীন আর মাদারীর চোখের ওপরই তাদের সাধের গরুগুলো শুকিয়ে গেছে দিনের পর দিন।

বিচুলির অভাবে গোয়াল ঘরের চাল ছাওয়া যায়নি। পচা কাচতেয় পুরোনো খড় পচে-পচে চাল আলগা হয়ে গেছে। গোয়ালের মেঝের গোবর, চোনা, আর ফিস্‌ফিসে জলে গরুর পায়ের চাপে চাপে যে অপূর্ব সর-কাদার সৃষ্টি হয়েছে তাতে বোধ করি যে-কোন বৃক্ষ জাতীয় জীব সহস্রগুণ ফল ধারণ করতো, কিন্তু গো-জাতীয় কাজলা আর হাবলা সেই অতি-সার হজম করতে না পেরে দিনে দিনে কাঁটাসার হয়ে উঠেছে। তাদের খুরের ঘা সারেনি, গায়ের লোম আর ছাল উঠে গেছে, লেজে আর বস্তীর হাড়ে কাদা লেগে লেগে জমাট বেঁধে ইটের মত হয়ে উঠেছে। এইভাবে চলেছে আশ্বিন পর্যন্ত।

তারপর এসেছে শামুকে মাস-না-থাকা আর বেতাগে শাঁস-না-থাকা কার্তিক মাস। তখন ওপর মাঠের ঘাস শুকিয়ে গেছে, নিচের মাঠে সবাই ছিট কলাই বুনেছে, তলা বিলে চেঁচো আর কেউটী ঝোপে ফুল ধরেছে, তাদের পাতাগুলো শুকিয়ে ভেঙ্গে পড়েছে, শোলার ফল-ধরা ডালও শীতের হাওয়ায় এবার অনেক আগে শুকিয়ে গেছে।

মাদারী মণ্ডল-বাড়ীর বউ, তবু ঘোমটা খুলে লজ্জা সরমের মাথা খেয়ে এপথ-সেপথ থেকে খুঁটে-খুঁটে মরা বাচড়া ঘাসের গোড়া পর্যন্ত তুলে এনেছে কোঁচড় ভরে। মাঠের ধারে ঝোপ থেকে আর-দশটি মেয়ের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে ঢোল-কলমী আর বুনো পুঁই ছিঁড়ে এনেছে, অন্ধকার রাত্রে কারো কলা গাছের খোলা, আর কারো-বা শুপুরী পাতা চুরি করে কেটে এনেছে। কিন্তু অতবড় দুটো বলদের হাতীর খোরাক তাতে পোষায়নি, কাজলা আর হাবলা শুকিয়ে উঠেছে শোলা গাছেরই মত।

সাতভিটের আদি আর মানী মণ্ডল বংশের বুদ্ধিমান ছেলে নবীন মণ্ডল প্রতাপনগরের জমিদার পাড়ায় গেছে। নদীর ধারের উঁচু পাড়ে তৈরী খট্‌খটে শুকনো গ্রাম। আম কাঁঠাল বাঁশ এবং আরো কত রকম গরুতে-পাতা-খাবার গাছের জঙ্গলে গ্রামখানি যেন ঠাসা। ইচ্ছে হয়েছে কাজলা আর হাবলাকে নিয়ে গিয়ে সেই গাঁয়ের শুকনো হাওয়াতে বেঁধে রাখতে, ঢলঢলে সবুজ কাঁঠালের পাতা খাওয়াতে, বাঁশের আগা টেনে ধরে দুটো গরুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকতে, অন্তত খোড়ো ঘাসে ভর্তি উঁচু রাস্তার পাশে গরু দুটো বেঁধে দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে বসে তামাক খেয়ে আর কারও সঙ্গে গল্প করতে এবং শেষে সন্ধ্যেবেলা রাখালদের মত তাড়িয়ে তাড়িয়ে তাদের বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। কাজলা আর হাবলার গণেশের মত দুটি নাদা পেট দেখে মাদারীর চোখে-মুখে যে খুশীর বন্যা নামবে তার কল্পনাও এসেছে তার মাথায়। কিন্তু প্রতাপনগরে গরু নিয়ে যাবার সাহস তার হয়নি। কেদার বিশ্বাসের দুর্দশার পর সে সাহস কেমন করেই বা হবে।

কেদার বিশ্বাস তার মিতে নব বিশ্বাসের কাকা। রাজাপুরের নাম-করা বিশ্বাস-বংশের বুড়ো লোক। দুটো গাই আর দুটো বলদ নিয়ে মনের সুখে চরিয়ে আনতে গিয়েছিল জমিদারদের গ্রাম প্রতাপনগরে।

গরুর দড়ি-বাঁধা খুঁটোগুলো পাকারাস্তার ধারে পুঁতে পুরোনো খেজুর গাছটায় হেলান দিয়ে তামাক খাচ্ছিল মনের আনন্দে। এমন সময় তার দামড়া দুটো খুঁটো উপড়ে রাস্তার পাশে মুখুজ্জে বাবুদের বাগানে ঢুকে যায় এবং প্রাণখুলে কলাগাছ খেতে সুরু করে। মুখুজ্জে মশাইয়ের ইয়া তাগড়াই দুই উড়ে চাকর চিৎকার করতে করতে কি যেন সব দুর্বোধ্য ভাষায় বলতে বলতে বুড়োকে আর গরু চারটেকেই ধরে নিয়ে যায়। মুখুজ্জে মশাই হচ্ছেন গ্রামের বিখ্যাত জমিদার রায় বাবুদের সদর মহলের বড় নায়েব নিবারণ মুখুজ্জের জ্ঞাতি ভাই এবং ছোটখাট তালুকদার।

একসঙ্গেই নাকি বাঘ আর ভালুক দুই-ই হাঁক দিয়ে উঠলো। কেদার বুড়ো চমকে উঠে তাকিয়ে দেখলে বাঘও নয় ভালুকও নয়, স্বয়ং মুখুজ্জে মশাই।

কেদারের বয়সও যেমন অনেক, দেখেছেও তেমনি অনেক এবং ঠেকেচেও তার চেয়ে অনেক বেশী। দুটি হাত জোড় করে বললে—কত্তা বাবু, গরু অবলা জাত, ন'লি অমন অধম্মডা কি ফস করে করে বসে। আর আমিউ বুড়ো লোক, বিপাকে পড়েই না আমি নিজি আইচি আপনারগে মাঠে। দুডো কলার বোগই তো খেয়েছে, কালই আবার তার মাথা গজাবে। অপরাধ হয়েছে, মাপ চাচ্ছি কত্তা। যদি তাতেও না হয় তো বাড়িত্তে দুডো বোগ আ'নে না হয় পুতে দিয়ে যাবো আমি কালই।

—অ্যাত্তোবড়ো আস্পদ্দা তোর! তুই আমাকে কলার বোগ দ্যাখাস্! চাষা, কুকুরের জাত কোথাকার! গলা দিয়ে আবার বাঘ ডাকালেন মুখুজ্জে মশাই। সরু হাত দুখানা তাঁর কুকুরের হাতার মতই নড়তে লাগলো।

তাঁর হুকুমে চাকররা বুড়োকে দিয়ে তার নিজের কান মলালে, নাকে খত দেওয়ালে, দয়া করে তার বলদ দুটো ছেড়ে দিলে এবং

দুপুর বেলা নিজেদের বাছুর দেখিয়ে গাই দুটো দুয়ে নিয়ে খোঁয়াড়ে দিয়ে এল বিকেল বেলা।

এ-সংবাদ হাটে গিয়ে চাষীরা শুনে এসেছিল। তার পর থেকে গরু নিয়ে প্রতাপনগর যাওয়াটাকে যমপুরে যাওয়ার সামিল বলেই তারা ধরে নিলে।

যমপুরে অবশ্য না গিয়েও উপায় ছিল না নবীনের। চাষীর বড় সম্বল গরু। তাদের না বাঁচিয়ে নিজেরাও বা বাঁচবে কেমন করে। কাজেই হাতে গাছি-দা আর কোমরে দড়ি নিয়ে প্রতাপনগর যেতেই হয় গো-খাদ্য আহরণে।

আর-দশজন চাষীর মতই মাঠের ধারের বাঁশ বাগানে ঢুকে ঝড়ে কাত-হয়ে-পড়া বাঁশ থেকে সে কঞ্চি কেটে কেটে বোঝা বাঁধে, দু-চারখানা শুকনো কঞ্চিও বেঁধে নেয় সেই সঙ্গে। মনে ভাবে, বাঁশের পাতাগুলো খাবে গরুতে, কঞ্চিগুলো দিয়ে হবে জ্বালানী কাঠ। এক বাগান শেষ হতে আর এক বাগান, তারপর আর এক বাগান। পড়া-বাঁশ কটাই বা থাকে এক বাগানে। বাঁশের সব কঞ্চিই তো আর কেটে নেওয়া যায় না। কিন্তু অজান্তে চক্কোত্তি মশায়ের ঝাড়ে হাত দিয়ে বিপদে পড়লো নবীন। চক্কোত্তি মশাই পূজোরী বামুন। রায়েদের দেওয়া নিষ্কর জমিতে তাঁর বাড়ী আর বাগান। বাগিচার ফসল তাঁর বড় আয়। গাড়ু হাতে করে নবীনের বাঁধা কঞ্চির আঁটির ওপর পা চাপিয়ে তিনি বললেন—চোর-ছ্যাঁচোড়ের জ্বালায় কি দেশ ছাড়তে হবে নাকিরে নব্‌নে?

নবীনের প্রার্থনা সত্ত্বেও মা বসুমতী যখন পায়ের তলায় মোটেই দুভাগ হলেন না তখন সে ঘাড় নিচু করে নির্বাকেই দাঁড়িয়ে রইলো।

এরপর থেকে সে কাঁঠাল পাতা পেড়ে আঁটি বেঁধে বেঁধে নিয়ে যেতে সুরু করলো। কিন্তু একটা কি দুটো গাছ থেকে এতো কাঁঠাল পাতা কাটা যায় না যে, প্রতিদিন তার গরুদের পেট ভরানো

যাবে। পাতা-কেটে-নেওয়া ন্যাড়া কাঁঠাল গাছের দিকে তাকিয়ে নিজেরই লজ্জা করতে থাকে। সে ছাড়া আরও লোকে যখন কাঁঠাল পাতা ভাঙতে শুরু করলো তখন তাকে বাধ্য হয়েই ব্যবস্থা বদল করতে হয়।

গুলঞ্চ লতায় বাবুদের বাগানের বড় বড় গাছের মাথা ছাওয়া। সকালে খেয়ে-দেয়ে এসে নবীন আম গাছে চড়ে আর এ-ডাল সে-ডাল করে গুলঞ্চ লতা কাটে। গাছের মাথায় বসে তার গ্রাম আর বাড়ী দেখা যায়। ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে সেই দিকে তাকিয়ে তার মনে হয়, গুলঞ্চর মত সারী খাবার খেয়ে তার কাজলা আর হাবলার আ.গর মত চেহারা হয়েছে, এমন কি কাজলার গলায় দু'একটি কুলটিও নেমেছে। কি চাই, তারা নিজেরাও গুলঞ্চ রস করে সকালে খেতে পারে, পিলে-জ্বরের সময়টা হয়ত বিনা অসুখেই কাটিয়ে দিতে পারবে। দিন কয়েক বাদে এহেন বহু-গুণসম্পন্ন গুলঞ্চ কেটে যখন সে গাছ থেকে নেমেছে তখন মিত্তির মশাইয়ের বিহারী চাকর এসে তাকে ধরে ফেললো। হিন্দিতে নানারকম চিৎকার করে যে-সব কথা সে বললে, তার মর্ম বুঝতে পারলে নবীন তার ছাপ্পান্ন পুরুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অত্যন্ত চিন্তিত না হয়ে পারতো না। চাকরের পেছন পেছন গিয়ে ঠিক গলায় দড়ি বাঁধা বিড়ালের মত মিত্তির মশাইয়ের সামনে দাঁড়ালো।

মিত্তির মশাই মহাশয় ব্যক্তি। তাঁর এক ভাই শহরে রায়বাবুদের উকিল, আর এক ভাই রায়বাবুদের দানে-তৈরী পশ্চিমের কোন এক স্কুলের হেড মাষ্টার। বাড়ীতে থেকে তিনি স্বয়ং রায়বাবুদের অধীনে তাঁদের বংশের পত্তনী তালুক রক্ষা করেন। মিত্তির মশাই মানী লোক এবং মানীর মানও রাখতে পারেন। মানের দিকে নজর রেখে তিনি বললেন—নব্‌নে, তুই না সাতভিটের মণ্ডল-বাড়ীর লোক।

নবীন বংশগত সত্যটা অস্বীকার করতে না পেরে গো-খাদ্যের অভাব, মিত্তিরদের মহানুভবতা এবং আমগাছের ক্ষতিকারক গুলঞ্চ

লতা সাফ করার উপকারিতা সম্পর্কে সবিনয়ে নানাবিধ নিবেদন জানালো।

কিন্তু মিত্তির মশাই তার কথা বুঝলেন বলে মনে হলো না, নইলে বলবেন কেন—তোদের তো নেই কিছু, থাকলে বুঝতিস গুলঞ্চ কাটতে গিয়ে তুই আমগাছের কত বড় ক্ষতি করেছিস।

নবীন সত্যিই বুঝতে পারেনি। তাই ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে মিত্তির মশাইয়ের মুখের দিকে। মিত্তির মশাই বুঝিয়ে বলেন—আমগাছের ওম ভেঙেছিস কেন? অতঃপর তিনি বুঝিয়ে বললেন, শীতকালে আমগাছের ওমের কত দরকার, নইলে আমের বোল হবে না। সেই জন্যেই যে তাঁরা গুলঞ্চ লতা পুষে-পুষে আমগাছদের ঢেকে ওম করিয়ে রেখেছেন, তাও বুঝিয়ে বললেন।

এর পর যা-হবার তাই হলো। খাবার না পেয়ে-পেয়ে চোখের ওপরই গরুগুলো শুকোতে লাগলো, শুকোতে শুকোতে হাড়-সার থেকে চামড়া-সার হয়ে উঠলো। পাহাড়ের মত কাজলা আর হাবলার নড়বার শক্তি যখন ধীরে ধীরে কমে আসতে লাগলো তখন নবীন প্রতিদিন পিতৃশোক অনুভব করতে লাগলো আর মাদারী সবার অলক্ষ্যে তাদের আদর করতে করতে চোখের জল ফেলতে লাগলো এবং এ-ও তাদের বুঝিয়ে বলতে লাগলো যে, প্রাণ গেলেও তারা যমরাজের দরবারে যেতে দেবে না তাদের।

কিন্তু কারো ইচ্ছাই ভগবান শুনলেন না। চারিদিকে যখন ম্যালেরিয়ার মড়ক পাঠিয়ে তিনি গরীব মানুষদের উচিত শিক্ষা দিতে লাগলেন তখন গরুদেরও বা তিনি ছাড়বেন কেন? নানাবিধ আধিব্যাধির সঙ্গে শিবের অসাধ্য গালগলা ফুলো পশ্চিমা রোগ পাঠিয়ে দু'চার দিন করে তাদের ভুগিয়ে ভুগিয়ে শেষ পর্যন্ত গোভাগাড়ের হাড়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে লাগলেন। এমনি মড়কের স্রোতের টান চামড়া-সার কাজলা আর সহ্য করতে পারেনি।

আজ ছ'দিন কাজলা তাই উঠোনে পড়ে আছে। তার গাল দিয়ে ফেনা গড়াচ্ছে, শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্টে চোখ-ত্বটো অস্বাভাবিক প্রসারিত হয়েছে। সারা গায়ের অনুভব শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে, গায়ে হাত দিলে চামড়ার ওপর কোনো সাড়াই জাগে না। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিং ত্বটোর পাশে মাথাটা হেলে পড়েছে, প্রসারিত চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে ধারায় ধারায়। মাঝে মাঝে যখন শ্বাস প্রশ্বাসে ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে তখন সামনের আর পেছনের ত্ব'জোড়া পা হঠাৎ আছড়ে যতদূর সম্ভব দূরে প্রসারিত করে দিচ্ছে। সেই শক্তি ব্যয়ের তুর্বলতায় মাথাটা এমন ভাবে মাটির ওপর আছড়ে ফেলে দিচ্ছে যে শিংয়ের পাশ দিয়ে কাত হয়ে মাথাটা মাটিতে চিত হয়ে থাকছে আর তার সাদা চিত্-কপালখানা সামনে ঝক্-ঝক্ করে উঠছে। চোখত্বটো পলকহীন ভাবে এমন করে তাকিয়ে থাকছে যে মাদারীর বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে সেদিকে চেয়ে চেয়ে। নবীন নারকেলের পাতা কেটে মৃত্যু-পথযাত্রী কাজলার মাথার ওপর একটা শেষ আচ্ছাদন করে দিয়েছে।

কাজলা ত্বপুরের আগেই মুক্তি দিয়ে গেল। মাদারী সেই-যে উঠোনে গড়িয়ে পড়েছিল কাজলার পাশে, আর. ওঠেনি। নবীন ঘরের ডোয়া হেলান দিয়ে হুঁকো হাতে করে বসে রইলো আবিষ্টের মত। তেমনি অবস্থায় থাকতে থাকতে এক সময় স্ত্রীকে উদ্দেশ করে বললে—তোর কাজলা কিন্তুক মহাপুরুষ, পরের জন্যি পরাণ দেলে, বুঝলি।

মাদারী কিছু বলতেও পারলো না, বুঝতেও পারলো না, শুধু ত্বটি জল-ভরা চোখ তুলে চেয়ে রইলো স্বামীর মুখের দিকে।

—বুঝলি, কাজলা তোর জেবন দেলে, তবু পিরতাপনগরের বাবুদের আমগাছের ওম ভাঙ্‌লে না। কাজলা তোর দধীচি মুনি, তাই না রে!

শুনে মাদারী কেঁদে উঠলো, আস্তে আস্তে সুর করে করে, দুটী চোখের জলে তার বুক ভেসে গেলো।

ওদের মাথার ওপর দিয়ে ঝাঁকে-ঝাঁকে উড়তে উড়তে গো ভাগাড়ে গোমড়কে-মরা গরু খাবার জন্যে পাক দিয়ে দিয়ে অসংখ্য শকুন নামতে লাগল বাতাসে সোঁ সোঁ শব্দ তুলে। মরা গরুর পচা ছেঁড়া ঠ্যাং মুখে করে প্রাণপণে ছুটতে ছুটতে কুকুরগুলো পাড়ায় ঢুকতে লাগলো। গোভাগাড়ের মহোৎসবে শিয়াল কুকুর আর শকুনি মিলে যে-তাণ্ডব জুড়েছে তার শব্দে মাঝে-সাঝে ওদের শোকার্ত হৃদয় ভয়ে চমকে উঠতে লাগলো। সেই মহাশ্মশানে কাজলাকে কেমন করে পাঠাবে ভেবে মাদারী শোকের ভেতরেও শিউরে শিউরে উঠতে লাগলো। এমনি করে চাষী পাড়ার শত শত গরুর পথ ধরে নবীন আর মাদারীর পরম স্নেহের বলদ শ্রীমান কাজলা বৈতরণী পার হয়ে চলে গেল।

এরপর দু'পাঁচ দিন অন্তর-অন্তর যখন হরিধ্বনির সমারোহ আর আগে পিছে আমকাঠের বোঝাধারীদের মিছিলের মাঝখানে যুবকদের কাঁধে শুয়ে বুড়োরা ম্যালেরিয়া জ্বরকে চিরতরে ফাঁকি দিয়ে শ্মশানে গিয়ে হাজির হতে লাগলো তখন শুধু মাদারী আর নবীনই নয়, সারা বিল-অঞ্চলের নরনারীই বুঝতে পারলো যে, অনাবৃষ্টি আর ফসল মারের পথ বেয়ে সত্যাই এক মহা দুর্বৎসর এসেছে, এবং সে দুর্বৎসর ভাত-কাপড়-নেই, চালে খড়-নেই, খালে জল-নেই, এমন কি শামুকে মাস-নেই আর বেতাগে শাঁস নেই-অবস্থার চেয়ে অনেক বেশী, অনেক ব্যাপক আর অনেক গভীর। দুর্বোধ্য আশঙ্কায় সবাই অসহায় হয়ে পড়ে, দিনের আলো নিভে এলেই বারান্দায় গিয়ে বসে থাকে, কেউ কেউ দুশ্চিন্তায় হাঁটুর ভেতর মাথা রাখে, কেউ-বা গালে হাত দিয়ে অন্ধকার মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকে, আর কেউ-বা অতি শীর্ণ খালের

দিকে চেয়ে-চেয়ে আস্তে আস্তে চেপে চেপে দীর্ঘশ্বাস ফেলে যেন কেউ শুনতে না পায় এমনিভাবে।

দুই

রস জ্বালাবার বান নামক প্রকাণ্ড উনোনে কাঠ ঠেলতে ঠেলতে নবীনের ভাবনা নিজেকে ঘিরে কালো কালো জাল বোনে। অন তে ধান .হয়নি এবার। বিলের নিচে ছ'বিঘে জলা-জমিতেই যা হয়েছে দু'চারটে। তাও তো ধান নয়, চিটে। অথচ সারাবছর কোন দিকে দৃকপাত না করে গায়ের লাল রক্ত কালো করে ষোল আনার যায়গায় আঠারো আনা খাটুনী বিনা প্রতিবাদে সে খেটেছে সেই ধানের পেছনেই। ডাঙার আট বিঘেতেও যদি ফলতো তো, চিটে হোক আর ভূষি হোক, বছর খোরাকী ধানটাও তো উঠতো, কিন্তু কিছুই ফলেনি, হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর সব চিহ্নই রোদে পুড়ে খাক হয়ে গেছে ধান গাছের মাথায় শুধু থোকা-থোকা পোকার বাসা রেখে। ওর ঠাকুরমার বলা শ্লোক মনে পড়ে—

বুনলাম ধান, হলো তিল,
ভাবলাম দুটো খাব ঘসে,
কপাল গুণে তাও হলো গ'লঘেসে···

ওর মা কষ্ট দিলে দুঃখে পড়ে ঠাকুমাবুড়ি এই শ্লোকটা বার বার আওড়াতো আর দীর্ঘশ্বাস ফেলতো। সেই ঠাকুমাবুড়ির মত করে ওরও দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ইচ্ছে করে।

—এই আলুকয়ড়া সিদ্ধ করে দ্যাওদিনি।

কোঁচড় ভতি সাদা আলু নিয়ে ওর স্ত্রী মাদারী এসে দাঁড়ালো বানশালায়। ছেঁ [illegible] কোঁচ [illegible] দি [illegible] -শিকড় বেরিয়ে পড়েছে।

—কনে পা'লে অতগুলোন সাদা আলু এই বিয়ান বেলায় ?

—বাছাড়ের খেতে। না বুলে চায়ে আনলাম। পাড়াপরশী হয়ে খালি নাকি গো-জন্ম আর হয় না ?

—একদিনিই গো-জন্ম খালাস করতি চাস তুই আলু চুরি করে, তোর আশা তো বড় কম না।

—গো-জন্ম আমি খালাস দিতি চাইনে। তা'দিলি এই পিরাচিত্তির ভোগবে কিডা ? বলতে বলতে আলুগুলো কোঁচড় থেকে একটা একটা করে রসে ফেলতে লাগলো মাদারী।

নবীন চেয়ে দেখলো মাদারীকে। চাষীর ঘরের বউ। ভরা পোষ মাসে কুলো-হাতে ধান উড়োতো সকাল-বিকেল, বাঁশের কাঁদল দিয়ে পল শুকোতো ঠিক দুপুরে, জনমজুরের ভাত বাড়তো সকাল বেলা। পেশী আর হাড়ের ঘোর-পেঁচে আর ওঠা-নামায় সর্বাঙ্গ তার চক্-চক্ করে উঠতো। সেই চাষীর বউ মাদারী, ঘরে তার ধান ওঠেনি একদানা, ভবিষ্যতের স্বপ্ন নেই চোখের তারায়, কাজ দিয়ে জীবন ভোগের তাগিদ নেই। অনাবশ্যক অন্ন দিয়ে দেহের ক্ষুধা মিটাবারও পথ নেই। রস জ্বাল দিয়ে কাজে মেতে থাকার যতটুকু পথ খোলা ছিল, আত্মরক্ষার তাগিদে নবীন নিজেই তা আগলে নিয়ে বসে আছে। মাদারীর সারা দেহ-মনে তাই শূন্যতার দুর্বহ বোঝা। নবীনের বুকের মধ্যে মমতার দোলা লাগে, মাদারীর জন্যেও দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ইচ্ছে করে তার।

—গুড় কি আজ হাটে নিতি পারবানে ? বানের ওপর সোঁ-সোঁ-করা রসের দিকে তাকিয়ে মাদারী মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে।

রস জ্বাল দেওয়ার জ্বালাইতে আগুনের তাত লেগে মাতলা উঠছে রসের, ময়লা জমে উঠেছে দু'আঙ্গুল পুরু হয়ে। নারকেলের মালায় বাঁশের কাঠি পরিয়ে তৈরী-করা উড়কি দিয়ে ওপরে ওপরে মাতলা কেটে একটা ছোট মালসায় রাখতে রাখতে নবীন বললে—গুড়তো এখন টাকায় তিন ভাঁড়। ভাবতিছি, এখন না বেচে বর্ষার দিকি ছাড়বো, চার ডবল দাম পাওয়া যাবে।

পুরুষ মানুষ যে বোকা জাত সে সম্বন্ধে মাদারীর কোন দিনই সন্দেহ ছিল না। নবীনের কথায় সেই ধারণাটা তার বদ্ধমূল হলো মাত্র। অবজ্ঞার হাসি হেসে বললে—সুংসার-ধম্মো কি হরি ঠাকুরির পরে ছাড়ি দিবা?

—ক্যান্? চলতিছে তো সব।

—হ্যায়, চলতিছে ঠিক। য্যামোন বাছাড়ের সাদা আলু চুরি করে, য্যামোন ওলা রস গিলে-গিলে, তুনার ছাগলডা চুরি করে বেচে দিয়ে······

রাগ হয় নবীনের। সাধারণভাবে সংসার চালানো যাচ্ছে না বলে এই সকাল বেলায় এমন বিশ্রী খোঁটাটা দিতে আসার কি দরকার ছিল মাদারীর। রাগে গোঁ-গোঁ করতে করতে সে বললে—রাজা কেষ্ট চন্দরের মতো না চললিউ, চলতিছে তো গড়ায়ে গড়ায়ে। কারুর পেট তো আর কম থাকতিছে না।

খাওয়ার খোঁটায় মাদারীর সর্বাঙ্গ জ্বালা করে ওঠে। ইদানীং পেটের ভাত ঠিকমত মিলছে না। আউষের আশায়, খাজনা আর দেনা শোধ করবার জন্যে ছ'মাসের খোরাকী রেখে, আমন ধান সব বেচে দিয়েছিল নবীন। অথচ অনাবৃষ্টির খরার আগুনে ধানের আবাদ পুড়ে ছাই হয়ে গেল, না-হলো আউষ ধান, আর না-ফললো আমন ধান। ভাদ্র থেকে আরম্ভ করে এই ক'মাস চলেছে নব মিতের ধান কর্জ করে। তারও গোলা কাবার, এখন যে কি-করে চলবে ঠিক নেই।

ভয়ানক বিপদের আশঙ্কায় মাদারীর বুক কাঁপে সব সময়। ওর মনের অতল গভীরে কোথায় জানি বাসা বেঁধেছে আশঙ্কা। হাজারো চেষ্টায় তাকে ঝেড়ে ফেলতে পারে না, বরং যতই চেষ্টা করে ততই সে চেপে ধরে। গম্ভীরভাবে সে বলে—যারগে আপন পেটটা ভরলিই চলে, আর কুনু দিক তাকাতি হয় না, তারগে মুখি পরের পেট কম-না-থাকার কথাডা ভাল শুনোয় না। কিডা কি খালে আর পরলে তুমি কি চোখ তুলে দেখিছো কুনু দিন। যদি তুমার সে চোখ থাকতো, দেখতি পাতে আমার মুখি কয়ড়া দানা পড়ে। আজ এই খাওয়ার খোঁটাও তা'লি দিতে পারতে না।

ওর কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে ওঠে, আসন্ন জলভারে চক্‌চক্ করে ওঠে চোখ দুটো। তাড়াতাড়ি উড়কিটা নিয়ে সাদা আলুগুলো খুঁজতে থাকে রসের জ্বালাইয়ের ভেতর।

অমন কথাটা বলা যে ভাল হয়নি নবীন তা বুঝতে পেরেছিল কথাটা বলে ফেলেই। নিজের স্বার্থপরতায় লজ্জা অনুভব করে সে। মনে মনে একটা কৈফিয়ৎ খাড়া করে বলে—ভাবতিলাম-যেন, এই-গেন্, নিচের জমির ধানকয়ড়া উঠলি সব কষ্ট চলে যাবে। এই-গেন্, যে-কয়ডা দিন সে-ধান না ওঠে, এট্টু কষ্ট দুক্‌খু চলবে, তার পরে···

মাদারী আর কিছু বলে না, আস্তে আস্তে উঠে যায়। মাথার কাপড় খুলে আঁচলটা উড়ে পড়ে পেছন দিকে, শীত লাগলেও তুলে গায়ে দিতে ইচ্ছে করে না তার।

নবীন তার চলন্ত দেহের দিকে তাকিয়ে থাকে। ক'মাসের আগের ক্ষিপ্রতাও নেই তার গতিতে, মন্থর পদক্ষেপ দ্রুত করার চেষ্টায় দেহের টাল সামলাতে পারছেনা সে। পেছনের ঝুলন্ত আচলটা ছেঁড়া, যেন অসংখ্য গেরো বেঁধে জোড়া-দেওয়া ছেঁড়া ন্যাকড়া ঝুলছে আর দুলছে। মাথার চুলে জট নেমেছে, খেজুর গাছের পাতার

মত সেগুলো ঝুলে পড়েছে তার পিঠে আর কাঁধে আর চলবার তালে তালে তারা দুলছে ডাইনে বাঁয়ে।

উড়কিটা ধরে রেখে সেই ঝুলন্ত চুলের ছড়ের আর গেরো-বাঁধা আঁচলের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে থাকে নবীন অনেকক্ষণ। সমস্ত অতীত জীবনটা যেন একটা অন্ধকার রাত্রি বলে মনে হয় তার কাছে। তবু আশার একটা মৃদু আলো জ্বলতে থাকে ওর মনে—ক'টা দিনই বা, নিচের জমির ধানক'টা উঠলেই……

রসের গাদ উঠে গেছে, জলের রং কেটে গিয়ে তাত-রসের লালচে রং ধরতে সুরু করেছে। নবীন সতর্ক হয়ে ওঠে, এখনি এমনভাবে রস উৎলে উঠবে যে, সামলানো যাবে না। তাড়াতাড়ি খেজুরের কাঁচা পাতা ছেড়ে দেয় একখানা জ্বালাইয়ের রসের ভেতর। সরষের তেল দেওয়ার দরকার ছিল। তার অভাবে নারকেলের দুধও সে দিতে পারতো। কিন্তু কোথায় পাবে আজ সে-সব। জমিতে সরষে হয়নি, গাঁটের পয়সা খরচ করে তেল কিনে রসে দেওয়ার বিলাসিতা দেখাবার ক্ষমতা তার নেই, আর গাছের নারকেল তো বেচেই শেষ করে দিয়েছে। ফল যা হবে সে বুঝতে পারে, এবার গুড়ের রং আর কাঁচা হলুদের মত হবে না। নবীনের মনে কেমন দুঃখ হয়—ওদের বাড়ীর গুড় কোনদিন কালো হয়নি। আজ তারই আমলে কালো গুড় দিয়ে বংশের যোগ্যতার ওপর ও নিজেই কালি লেপে দিচ্ছে যেন। যাক্‌গে, গুড়টা জমে যদি দানা বাঁধে তাহলেই চলবে, কাঁচা হলুদে আর কাজ নেই। আবার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে ওর।

বড় ছেলে দোনা একটা খালি মাটির কলসী এনে বানশালায় ওর পাশে রাখলো। আর একটা হাঁড়িও টানতে টানতে আনছে মেজ ছেলে মোনা।

—কই দ্যাওদিনি ও বাবা। দোনা তার বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে কলসীটা সোজা করে ধরলে, এখনি যেন একটা কিছু ঢেলে দেবে নবীন।

ঘরের চাল-রাখার কলসীটা এইভাবে বানশালায় আসতে দেখে নবীন ঘাবড়ে গেল। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞসা করলো—কি-রে ও দোনা, কি? চালির হাঁড়ি-কলসী বানশালায় ক্যানো?

দোনা চেঁচিয়ে উঠলো—বা-রে, মা-যেন বোললে, তুমি চাল আনে রাখিচো। তাই হাঁড়ি কলসী সব পাঠায়ে দেলে, বললে চাল ভরে নিয়ে আয়গে। আমি কিন্তুক অ্যাতো-বড় কলসী চাল ভরে নিতি পারবো না, তা কয়ে দিলাম আগে থাকতি।

—আমিউ না। বাব্বা, চাল যে ভারী। মোনাও এসে পড়েছে, হাঁড়িটা নামিয়ে সে অক্ষমতা জানাচ্ছে দাদার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে।

নবীন এতক্ষণে বুঝলো। মাদারীর এই কঠিন তামাসার আকস্মিক আঘাতে তার সারা দেহ আর মুখের ওপর এক আহত উত্তেজনা তীব্র হয়ে উঠলো। প্রবল ইচ্ছা হলো—ছুটে গিয়ে মাদারীর হাতখানা ধরে বলে আসে—কওদিন, এমন মম্মোঘাতী তমোসা কোন্ পরাণডায় করতি পারলে।

—এই রস-গুড় থাকলো, বুলিস তোগের মা-রে। আমি চললাম চাল আনতি। যদি পাইতো ফেরবো, না'লি···

কোনো দিকে দৃকপাত না করে নবীন উঠে পড়লো।

মাদারী এতক্ষণ বানশালা-ঘেরা খেজুরের পাতার বেড়ার পাশ থেকে সবই দেখছিল। দু'একটা গালাগালি কি চড়-চাপড় ছাড়া নিজের কঠিন তামাসায় যে এমন উল্টো ফল হবে ভাবতে পারিনি। নবীনের শেষ কথায় তার মন কেঁপে উঠলো নারীর সহজাত আশঙ্কায়। নবীন পা বাড়াতেই সে চেঁচিয়ে উঠলো—যায়ে না, যায়ে না কইচি বলো, যায়েনা দুহাই তোমার······

নবীন চলে গেল।

আজকাল সাতভিটেয় বাছাড়ের মত বুদ্ধিমান ব্যক্তি আর একটিও নেই। তার অনেক বিঘে ধানের জমি, অথচ খরচ নেই মোটেই—একটি ছেলে আর একটি বহু দূর-সম্পর্কের তথাকথিত বিধবা বোন, ব্যস্। কাজেই তার টাকা না হওয়াটাই অস্বাভাবিক।

যেদিন সে পাশের গ্রামের গরীব চাষী অটল সর্দারের জমি গোপনে বন্ধক রেখে, সুদে আসলে চার বছর বাদে অনেক টাকা হ'লে প্রতাপনগরের হরিদাস ঠাকুরের মত পাকা দালালের সহায়তায় কোর্ট থেকে মামলা করে, সেই বন্ধকী জমি নীলামে চড়িয়ে, অতি অবহেলায় খাস করে নিলে, সেদিন সে-যে কত বড় বুদ্ধিমান হয়েছে সে-কথাটা খাস-দখলী ঢাকের বাদ্যির সঙ্গে বিল-অঞ্চলের লোকেদের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়ে বুঝিয়ে দিলে।

সেদিন আহ্লাদ করে সে ছেলে আর বোনকে কাছে ডেকে নেয়। পরম খুশীতে জিজ্ঞাসা করে, অ্যাটটা চিঁড়ে বাইশ ফেরা দিয়ে খাতি পারিস?

পিসি ভাইপো অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। রাম বাছাড়ের পুরু-পুরু ওষ্ঠ দুটো দাড়ি গোঁফ শুদ্ধ হাঁ হয়ে যায়। তার পড়া-দাঁতের ফাঁকে মাড়ির উপর লালা চক্ চক্ করে।

—ধিস্ তুরগে, তুরা মানুষ না-তো গাধা, আস্ত···

দাদার এই উচ্চ প্রশংসায় পরম খুশী হয়ে ভগ্নী যখন ভীষণ চেঁচিয়ে উঠে সরে পড়ে, পুত্রও তখন গজরাতে গজরাতে কেটে পড়ে পিসির পেছনে পেছনে। রামবাছাড় নিজের সূক্ষ্ম রসিকতায় পরম পুলকিত হয়ে সেই পুরোনো দিনের কথা মনে করে, যেদিন সে হাট থেকে ফিরে ঘুমিয়ে থাকা বাবার কোমরের জালি থেকে নিশুতি অন্ধকার রাত্রে সাতটা টাকা আত্মবৎ করে নিয়েছিলো। তারপর একটা চিঁড়ের বাইশ ফেরার সুনিশ্চিত পথে যা-যা ঘটেছে বারো হাত মুখওয়ালা গোলার দিকে তাকিয়ে একে একে মনে পড়ে যায় তার সবই।

এহেন রাম বাছাড় নিজের সদর উঠোনে বিভিন্ন গ্রামের একদল লোকের মধ্যে মোড়ার ওপর বসে তামাক খাচ্ছে এবং সদস্যবৃন্দের বিতর্কের উপসংহার-জবাবে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছে—ঠিক কইচো, যখন ধান নেই, পল নেই, মানুষ নেই, গরু নেই, তখন বারোশো ছিয়াত্তোর সালের মানান্তর বেম্মদত্তি হয়ে ইবার ত্যারোশো পোইতিরিশ সালের ঘাড়ে ভর করবে।

নবীন এলো ঠিক এমনি সময়। এবং বিনা আহ্বানে গায়ে পড়ে মন্তব্য করলো—ঠিক বুলিচো বাছাড়-কা। ইবার মানান্তর হবেই হবে। ইবারকের নাম থাকপে পোইতিরিশির মানান্তর। ইবার মানুষ থাকপে না, গরু থাকপে না, গাছ-গাছালি পশু-পাখালি কিচ্ছু থাকপে না, থাকপে শুধোই ধুলো-খা-খা মরুভূমি, আর থাকপা মানষির সেরা তুমি আর পিরতাপনগরের বাবুরো। বলেই নবীন খপ করে বাছাড়ের হুঁকোর মাথা থেকে কলকে তুলে নিয়ে টানতে সুরু করলে।

এতবড় দুর্ঘটনায় বাছাড়সহ সমগ্র জমায়েৎ যখন নবীনের ধূম্রাচ্ছাদিত কলকের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অবাক হয়ে আছে, তখন আবার বাছাড়ের হুঁকোয় কলকেটা পরিয়ে দিয়ে নবীন বললে—ও কাকা, একশলি (বিশ) ধান দ্যাওদিন্।

বাছাড়সহ সবাই কলকে থেকে ওর মুখের দিকে আবার যখন অবাক হয়ে চেয়ে দেখল, তখন নবীনের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো—ও বাছাড়-কা, তুমিতো আজকাল বাবু হইচো—পিরতাপনগরের ঘোষবাবু হয়েছেন সাতভিটের বাছাড়বাবু। মোড়লবাড়ীর ছবাল বাছাড়বাড়ী হাত পাততেছে, মোটে দশটা দিনির জন্যি, বুঝলে ও কাকা। নিচের জমির ধান তুলে আগেই শোধ দেব তুমার ধান। খালি এই কয়ডা দিনির জন্যি, তা কত ব্যাজ দিতি হবে কও।

নবীনের স্বস্তিবচনে রাম বাছাড় খুশী। প্রতাপনগরের বাবুদের

সমান করে গালাগালি দিলেও ও খুশী হয়ে হ্যা হ্যা করে দাঁত বার করে। সঠিক কি জবাব দেবে বুঝতে না পেরে নির্বাকে আঙ্গুল তুলে বারান্দাটা দেখিয়ে দিলে সে। সেখানে বস্তা-বস্তা ধান একটার পর একটা সাজান রয়েছে।

সেই দিকে তাকিয়ে নবীন নিভে গেল। সত্যদর্শী সাধুর মত সে আস্তে আস্তে বললে—ধান চালান দেচ্ছ। মানান্তর তাইলি আপনি আসপে না, তুমরাই আনবা।

বাছাড় মণ্ডলবাড়ীর ছেলের আক্রমণ সামলে নিয়ে বললে—আমি না, ব্যাপারী শয়তানরা। অস্তা ব্যাপারী শালার ছাবাল জোর করে গোলা খুলে ধান নামালে। আমি বুলি, করিস কি, করিস কি? আমার গোলা মারলি তুই? দেশের লোকে খাবে কি? সে বোললে—তুমার নিয়ে য্যামোন আর অ্যাক দেশের পেট ভরতিছি, তেমনি আর এক দেশেত্তে আনে তুমারগে পেট ভরাবো। শালা পাতিশিয়েল, ধরে পিটোন দেব-দেব করতিছি, তার আগেই শালা টাকা ফেলে দে পালান···

বেশী ব'লতে হলো না, নবীন মণ্ডলবাড়ীর ছেলে, উত্তরমুখো রওনা দিলে শুধু এইটুকু বলে—যম জমিদার মহাজন, র-মানে না এ তিনজন।

বাছাড় হেসে উঠলো—হ্যা-হ্যা-হ্যা, যা কইচো, যম জমিদার মহাজন···

এই তিন মহাশক্তির সমপর্যায় ভুক্ত করায় নবীনের ওপর কেমন যেন পিতৃস্নেহ অনুভব করে বাছাড়।

মাঠে এসে তবে স্থির হয়ে দাঁড়ালো নবীন। মনে-মনে ও ক্ষেপে গেছে মাদারীর ওপর। মাদারীকে লাঞ্ছনা দেওয়ার নানারকম কৌশল ওর মাথায় এলো। কিন্তু বাড়ীর দিকে না গিয়ে ও রওনা দিল মাঠের উত্তর পারের দিকে।

প্রকাণ্ড বিলের একটা শীষে এই মাঠটা। তিন পাশ ঘেরা তার

গ্রাম দিয়ে, আর একটা পাশ ক্রমেই প্রশস্ত হয়ে বিলে মিশে গেছে। নিচের দিকে জল থাকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত; কোন বার বোরো ধানও হয়। মাছ থাকে কোই, মাগুর,সিঙ্গি চ্যাং, শোল ও পুঁটি ট্যাংরার তো অন্ত নেই। কুয়ো কেটেছে অনেকে। ছোট ছোট পুকুর এগুলো, বিলের জল শুকিয়ে গেলেও জলাশয় হয়ে থাকে, মাছেরা শুকন্ত বিল থেকে এখানে এসে আশ্রয় নেয় শ'য়ে-শ'য়ে হাজারে হাজারে।

এই সেই মাঠ আর বিল। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে একে ঘিরে সাতভিটে, রাজাপুর, হরিদাসকাটি, গাবোখালী, নাউলী, কাটাখালি, আরও অনেক গ্রামের হাজার হাজার চাষীর সঙ্গে নবীনও স্বপ্ন দেখেছে বাল্য থেকে কৈশোরে, কৈশোর থেকে যৌবনে এবং স্বপ্ন দেখেছে আজও সকালে।

সেই মাঠের একটা উঁচু আলের ওপর দাঁড়িয়ে আজ কিন্তু নবীনের মনে আশার ছোঁওয়া লাগলো না, রোমাঞ্চিত আবেগে সে দালান দেওয়ার বা ধান বাড়ী দিয়ে বড়লোক হবার স্বপ্নও দেখলো না। অদ্ভুত এক অবসাদে পা-দুখানা তার অচল হয়ে রইলো শুধু।

সামনে-পিছনে ডাইনে-বাঁয়ে যতদূর দৃষ্টি চলে, কোথায়ও সে শস্য-পূর্ণা বসুন্ধরার চিহ্নমাত্র দেখতে পেলো না। খাটো-খাটো ধানের ঝাড় শুকিয়ে-শুকিয়ে সারা মাঠের বর্ণ ফ্যাকাশে করে দিয়েছে। মাথায় দু'আঙ্গুল লম্বা শীষের গায়ে চিটেগুলো চিমড়ে হয়ে লেগে আছে শুকিয়ে। এক গোছা ধানের শীষ আঁচড়ে নবীন হাতের চেটোটা আলগা করে ধরলো, বাতাস লেগে চিটেগুলো ফুর্‌-ফুর্‌ করে উড়ে গেলো উত্তর থেকে দক্ষিণে। এরই মধ্যে মাঠখানা ফেটে গেছে চাকা চাকা হয়ে। চিটেগুলো সেইসব ফাঁকে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। কোন কোন ফাটলে মাকড়সারা জাল পেতেছে, ছোট ছোট পোকা মরে জমে আছে সেই জালের গায়ে। খেত পটুপটি আর ছোট ছোট পাতির ঝাড়

শুকিয়ে আছে মরে মরে। তাদের পাশ দিয়ে বিবর্ণ বাগঝামা ঝাড়ের বাঁচবার চেষ্টা নিতান্ত বেদনাদায়ক। মাংসহীন গরু চরছে তার ভেতর, খোঁটার চারিপাশে ঘুরছে আস্তে আস্তে মুখ উঁচু করে, ভাগাড়ে যেন শিয়ালেরা খাবার খুঁজছে বাতাস শুঁকে শুঁকে।

আরও নিচে কেউটি আর শোলার ঝাড় এখানে সেখানে মরে-মরে কাত হয়ে পড়ে আছে নিহত গোলন্দাজ সেনিকের মত। তাদের ফাঁকে ফাঁকে ছিট–বুননের খ্যাসারীর গাছ গজিয়েছে, যেন কবরের উপর নতুন ঘাস। তারও নিচে কূয়োর সারি দুর্গ রচনা করেছে। পাড়গুলো কাওরাপাড়ার শূয়োরে খুঁড়ে খুঁড়ে ওলট পালট করে দিয়েছে। তার পাশে ইঁদুর আর কাঁকড়ার মাটির ঢিপি। কাঠ শোলার বন উল্টে উল্টে শুকিয়ে আছে। কারা যেন গোলা চালিয়ে দুর্গের পাড় ভেঙ্গে চুরে ধ্বংস করে দিয়েছে। বহুদূরে বিলের ওপর এমন সময় যেখানে বক আর পানকৌড়ির মেলা বসে, অনেক ওপরে যেখানে মাছরাঙ্গারা স্থির হয়ে থেকে অকস্মাৎ নিচেয় ছোঁ মারে, সেখানে কাক বসেছে ঝাঁকে ঝাঁকে, নীলকণ্ঠ পাখীরা ডেকে ডেকে নিচে থেকে ওপরে উঠে যাচ্ছে। নিচেয় যেখানে জলের ওপর ধান ঝক-ঝক করে সেখানে কেউটি আর চেঁচোর ঝোপ বাগঝামা বনের ওপর খবরদারী চালাচ্ছে। কেউটি ঝাড়ের চুমরীর ডাঁটায় শালিক বসছে আর ফিঙেগুলো সাঁক করে ঠুকরে যাচ্ছে তাদের। অনেক ওপরে খুব ছোট ছোট পাখী উড়ছে আকাশে, বোধ হয় চাতক। তাদের ওপর এক আধটা শকুন দেখা যায়। আকাশের গায়ে পাঁশুটে মেঘ পাহাড়ের মত স্থির হয়ে আছে। আকাশ যেন অনেক ওপরে উঠে গেছে মরা মাটির মায়া কাটিয়ে।

নবীন দাঁড়িয়ে রইলো আলের ওপর। সারা মন ওর দুর্বোধ্য বেদনায় কন্-কন্ করে। চোখে ওর অসহায় দৃষ্টি, ধীরে ধীরে একধার থেকে

আর একধারে প্রসারিত হচ্ছে আশ্রয়ের আশায়। অথচ জনমানব নেই কোথাও। প্রবল ইচ্ছে সত্ত্বেও কারও সঙ্গে সে ডেকে কথা বলতেও পারলো না। মাঠের পাড়ে কুলগাছে সোনালতার অপূর্ব শোভা, এক সময় তারই ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আলের মাটিতে শক্ত করে পা বাধিয়ে কাত-হওয়া খেজুরের গুঁড়িটায় জোর করে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো নবীন।

দুপুরের রোদ পড়েছে নবীনের চারিপাশে, তেলাকুচো আর ঢোল কলমীর ফুলন্ত লতাঝোপে, খেজুরের দোল-খাওয়া চিকন চিকন পাতার ওপর আর সোনালতার টোপর-পরা কুল গাছের ঝাঁকড়া মাথায়। উজ্জ্বল রোদ পড়েছে ওর ডাইনে-বাঁয়ে পায়ের গোড়ায়, মরা ফসলের খোলস-পরা জীর্ণ ফ্যাকাসে মাঠের ওপর, খান্‌-খান্‌-হয়ে ভেঙ্গে-যাওয়া আঠালো মাটির ফাটলে ফাটলে। নবীনের মনে হয়, হাজার হাজার ফাটল দিয়ে মাটির রস যেন উবে যাচ্ছে রোদের গায়ে, লাখো লাখো শুড় দিয়ে মাটীর রক্ত শুষে নিচ্ছে মরা ফসলেরা, শুকনো শোলার ঝাড়েরা আর সবুজ গাছ-পালারা। আকাশ আর রোদ, বাতাস আর প্রকৃতি, ফসল-দেওয়া মাটীকে চুষে চুষে খোলা করে ফেলছে প্রতিনিয়ত। কেমন যেন একটা শব্দ উঠছে শোঁ-শোঁ করে। অতি সঙ্গোপনে মাটী যেন কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে অনেক দূরে অনেক তলায়, পৃথিবীর পাঁজর ছাড়িয়ে বুকের ধুক-ধুকুনির যায়গা থেকে, জীবনের মর্মতল থেকে। সমগ্র শরীর দিয়ে মন দিয়ে অস্পষ্ট চেতনা দিয়ে ফাটা মাটীর সেই বাকহীন স্পর্শাতুর কান্না অনুভব করে নবীন। বসুন্ধরার অস্পষ্ট এই কান্না যেন অদৃশ্য এক তারের বাজনা। নিঃশব্দ ঝঙ্কারে আর ব্যঞ্জনায় মর্মস্থল তার ভরে যায় করুণ বিলাপে। অনাস্বাদিত গভীর বেদনায় দেহ-মন অবশ হয়ে আসে।

—হাম্বা—আঁ—আঁহ……

মথুর পাড়-এ দেখে তার গাই গরুটা ডেকে উঠেছে। নবীনের সংজ্ঞা ফিরে আসে, মানুষের সঙ্গে কথা বলার জন্যে চঞ্চল হয়ে ওঠে সারা হৃদয়।

নিজের জমিতে গিয়ে নবীন ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো একপাশ থেকে আর একপাশ পর্যন্ত। জমিতো ছোট নয়, ছ'-ছ' বিঘে। এমন বড় জমি সবার ভাগ্যে একসঙ্গে থাকে না। কিন্তু মণ্ডলবাড়ীর কথাই আলাদা। একদিন তারা এ-অঞ্চলের মোড়োল ছিল শুধু নামে নয়, সম্পত্তিতেও। সেদিন আর নেই অবশ্য, অনেক সম্পত্তিই চলে গেছে জমিদার আর মহাজনের পেটে। গিয়ে-ছেড়েও যা আছে তারই এক ভগ্ন অংশ পড়েছে নবীনের ভাগে। এই জমিটাই নবীনের ভাগের সেরা। বিয়ের দেনায় এটাও যে বাঁধা আছে প্রতাপনগরের উদ্ধব ঘোষের কাছে সেজন্য আশঙ্কার অন্ত নেই।

নবীনের বুক ভেঙ্গে যায় জমির দশা দেখে। দক্ষিণের নিচু অংশটায় এখনও মাটী নরম, সেদিকেই যা-কিছু ধান হয়েছে। আর সব পাশে তো শুধু নাড়া পড়ে আছে গাদা মেরে।

নাড়া দেখে সর্বাঙ্গ জ্বলে যায় নবীনের। কট্-কট্ করে ছিঁড়ে ফেলে নিষ্ফলা ধান গাছ, ছিঁড়ে ছিঁড়ে গাদা করে রাখে নাড়া, উড়িয়ে দেয় উত্তুরে বাতাসে, ছড়িয়ে দেয় জমির সর্বাঙ্গে। নাড়া তোলা সাদা যায়গাটুকুর ওপর নেচে বেড়ায় ধুপ্-ধুপ্ করে, লাথি মেরে ভেঙ্গে ফেলতে চায় ও নিষ্ফলা জমির বুক।

আসচে হাটবারের পরদিন অনেক লোক বেগার নিয়ে ধান কাটবার সিদ্ধান্ত করে নবীন ফিরে চলে বাড়ীতে।

বাছাড়বাড়ীর সামনে পড়তেই নবীনের মনে হলো বাড়ী ফেরা আর হাটে যাওয়া আজ যত জরুরীই হোকনা কেন, তার চেয়ে অনেক বেশী জরুরী আপাততঃ পেট বাঁচাবার ব্যবস্থা করা। তবুও বাছাড়ের

আগড়ের মুখে গিয়ে নবীন পিছিয়ে এলো, তারপর আবার এগিয়ে গেল এবং শেষ পর্যন্ত যেন কারো অদৃশ্য তাড়নায় আগড় খুলে ভেতরে ঢুকে গেল।

কাউকে না ডেকেই বানশালায় ঢুকে এক অভাবিত পরিস্থিতির সামনে পড়লো নবীন। বাছাড়ের তথাকথিত বহু দূর সম্পর্কের বোন ফুটকী ভাঁড়ের ভেতর বালি ভরছে আর বাছাড় তার ওপর জ্বালাই থেকে গুড় ঢেলে দিচ্ছে উড়কী কেটে কেটে। নবীন সরে আসবে কি দাঁড়াবে সিদ্ধান্ত করবার আগেই ফুটকী তার আঁচল ছড়িয়ে দিলে বালির ধামাটার ওপর আর ভাঁড় ও জ্বালাই অদৃশ্য করে তড়াং করে উঠে দাঁড়ালো বাছাড় নবীনের ঠিক সামনে। বাছাড়ের মুখ চোখ ভয় আর আত্মরক্ষার উত্তেজনায় অদ্ভুত দেখাতে লাগলো। তাড়া-খাওয়া খেঁকী কুকুর দাঁত বের করে যেমন তেড়ে আসে খা-খা করে, সামনের না পড়া দাঁতটা বার করে বাছাড় তেমনি করে তেড়ে উঠলো অশ্লীল ভাষায়—ছবাল, এখানে আইচো ক্যানো? সং চলতিছে নাকি? ক্যানো ঢুকিচো পাছ দরজায়? মায়ে মানষির খোঁজে, না আর কিছু?

এই কুৎসিত ইঙ্গিতে চেতনা ফিরে এলো নবীনের। এক অব্যক্ত যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে সারা অঙ্গে অনুভব করলো প্রতিবাদের উত্তেজনা। সোজা হয়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললে নবীন—তুমার মতো ভাবিচো নাকি আমারে যেন্ বানশালায় বসে বসে। মণ্ডলবাড়ীর ছবাল আমি, মুখ সামলায়ে কথা কয়ো কিন্তুক! নিতান্ত কাকা বুলে ডাকি, তা'-না'লি......

বাছাড়ের মনে তার স্বাভাবিক কাপুরুষতা দেখা দিলে। চুপ্‌সে গিয়ে বললে—রাগতিচো ক্যান? অ্যাট্টা কিছু বুলতি তো আইচো, সেইডে কি, তাই বুললিই তো চুকে যায়।

নবীন সামলে নিয়েছে এতক্ষণে। গম্ভীর কণ্ঠে স্পষ্ট স্পষ্ট উচ্চারণ করে বললে—তুমার বানশালার চুরা থামারে ঢুকবার কুনু মতলব ছিল

না আমার। [illegible] ভঠো[illegible] না পায়েই না ঢুকিছি। আমি আইলাম গেন্—সেই যেন্, সেই যেন্ সকালে কলাম না তুমারে, সেই গেন্......

জুয়োচুরির কথায় বাছাড় আবার রেগে গেল। টাকাই হোক আর ধানই হোক, কর্জ নিতে এসে, কেউ খোসামোদ না করে, দু'চারদিন না-হাঁটাপেটা করে, এটা সেটা উপহার না দিয়ে, তাকে আর তার বোনকে খুশী না করে, চোখ রাঙিয়ে যে কাজ উদ্ধার করে যাবে, ইদানীং বাছাড় আর তা কল্পনাও করতে পারে না। সে প্রায় হুঙ্কার দিয়েই বললে—তুমি মনে করিচো কুনডা! ছাগুলে শিং নাড়ায়ে ধানের পাতো চাটে যাবা ভাবিছো?

ছাগলের সঙ্গে তুলনা করায় নবীনের ভীষণ রাগ হলো। বংশ গৌরবের অহঙ্কারে সে বলে উঠলো—মণ্ডলবংশের মেকুর বাছাড়কুলে নেংটি ইঁদুর খ্যালায়েই কাজ সারে চিরকাল।

বাছাড় আরও রেগে গেল। ভীষণ চিৎকার করে বললে—তুমি মণ্ডল আছো তো আছো, নিজির বাড়ীর মদ্দি্য আছো, তাতে আমার কি! তুমি চলে যাও। একচিটে ধানও দিতি পারবো না। যাও, চলে যাও···

ঠেলতে ঠেলতে নবীনকে আগড় পার করে দিলে বাছাড়। কোনদিকে না তাকিয়ে সে বাড়ীর ভেতর ঢুকে গেল বলতে বলতে—শালা, ভা[illegible] মচকায় না। ভিক্ষে করতি আয়েচো, তবু ড্যামাক মারো 'মণ্ডল' 'মণ্ডল'। আমি রাম বাছাড়, ভয় করিনে দুনেয় কারো......

নবীন চরম অপমানে খুঁটি ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো কানমলা-খাওয়া গাধার মতো বাছাড়ের আগড়ের সামনে বাঁশের বেড়া ধরে। ওর মনে হলো, যেন যুগ-যুগান্তের মোড়ল বাড়ীটা ওর চোখের সামনেই ভেঙ্গে পড়ছে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে নওদা মহাজন রাম বাছাড়ের উদ্ধত শাবলের ঘা খেয়ে খেয়ে।

তিন

পরদিন সকাল। উঠোন ভরে তখন রোদ্দুর উঠেছে। ছোট ছেলেমেয়েগুলো মহা উল্লাসে ঘুরছে কলরব করতে করতে। গায়ে তাদের ছেঁড়া ন্যাকড়া পাট করে বাঁধা। হাট-থেকে-আনা ছোলা-পাটালী খাচ্ছে তারা। গায়ে গামছা জড়িয়ে হুঁকো টানতে টানতে সেই দৃশ্য দেখছে নবীন। মাদারী চেয়ে আছে তাদের দিকে ঢেঁকি ঘরে সকালের ফ্যানা ভাত রাঁধতে রাঁধতে। ওদের চোখে সেই খুশী, শীতকালের সকালের রোদ্দুরে যা ছড়িয়ে পড়ে সর্বাঙ্গ দিয়ে মনের ওপর।

ঠিক এমনি সময় হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এলো হরিবোল। ওদের আগড়ের সামনে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়েই সে চেঁচিয়ে বললে—ও কাকা, শীগ্‌গীর আসো, সব্বোনাশ হচ্ছে তুমার।

আকস্মিক আহ্বানে হতচকিত হয়ে গেল নবীন, শুধু তার চোখ দু'টো ভীত জিজ্ঞাসায় তাকিয়ে রইলো হরিবোলের দিকে। মাদারী ভাত নাড়ছিল খেজুরের কাঠি দিয়ে, ঠিক সেই অবস্থাতেই সে চেয়ে রইলো হরিবোলের দিকে বিহ্বলের মতো।

নবীন কোন ব্যগ্রতা প্রকাশ করছে না দেখে হরিবোলের ব্যগ্রতা বাড়লো চতুর্গুণ। আগড়ের ভিতর দিয়ে গলে প্রায় দৌড়েই উঠোন পার হয়ে নবীনের সামনে এসে দাঁড়ালো এবং ভীষণ উত্তেজিতভাবে বললে—অ্যাখোনো দাঁড়ায়ে আছো তুমি! তুমার ধান সব কাটে নেলে যেন……

নবীন অকস্মাৎ চেঁচিয়ে উঠলো—ওরে কনে রে, কিডা রে, শীগ্‌গীর বল, ওরে কুন দিক রে……

নবীনের হাত থেকে হরিবোল হুঁকোটা ছিনিয়ে নিয়ে দু'চারবার দম মেরে নিয়েছে ইতিমধ্যে। হাঁপানো-ভাবটা কিন্তু তেমনি জোরালো

রয়েছে তার, চোখ দুটোও বি‍ স্ফারিত হয়ে আছে তেমনি। মুখ দিয়ে গল্ গল্ করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সে বললে—উত্তোরের বিলি, মোড়ল মেদেয়। পিরতাপনগরের ঘোষবাবুরা কাটতেছি।

ছুটতে ছুটতে মাঠের ধারে গিয়ে নবীন দাঁড়িয়ে গেল। কপালে হাত লাগিয়ে তাকিয়ে দেখলো নিচেয়। যেন শকুন পড়েছে তার জমিতে, একটা নয়, দুটো নয়—ঝাঁকে ঝাঁকে।

আন্দাজে তার মনে হলো, বোধ হয় একশো দেড়শো লোক নেমেছে, মোড়ল মেদের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে তারা। ধান কাটছে নিচু হয়ে, মুঠি ঠিক করছে উঁচু হয়ে, আবার উপুড় হয়ে রাখছে সেগুলো, আঁটি বাঁধছে, আবার কাটছে তারপর। অনেকগুলো লোক লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জমির চারিপাশে, বোধহয় পাহারা দিচ্ছে তারা। কেউটি ঝোপ যেখানে শুকিয়ে গেছে সেখানে খান আষ্টেক মোষের গাড়ী। মোষগুলো শুয়ে আছে। কোনটা বা জাবর কাটছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

পেছন থেকে নবীনের সামনে আঙ্গুল তুলে হরিবোল বলে উঠলো—হু-উ-ই-যেন্, দেখতিচো, হু-উ-ই-ই…

নবীন আবার ছুটতে স্বরু করলো।

মোড়ল মেদের খানিকটা দূরে থাকতে নবীন দেখলো, যারা পাহারা দিচ্ছিল ওকে দেখেই তারা নিজেদের ভেতর কি যেন বলাবলি করছে। সারা জমিতে উঠলো একটা অস্পষ্ট চাপা কলরোল। সবাই সোজা হয়ে দাঁড়ালো ধান কাটা ছেড়ে। তাদের হাতে লাঠি আর কাস্তে আস্ফালিত হয়ে উঠলো শূন্যে। লাঠিধারীরা ঘন হয়ে দাঁড়ালো নবীন যে দিক দিয়ে যাচ্ছে সেই দিকটায়।

সাদা জামা-কাপড়-পরা দুজন ভদ্রলোক মোষের গাড়ীর উপর উঠে দাঁড়িয়েছে। দূর থেকেও চেনা যায়, প্রতাপনগরের ঘোষ বাবুদের ছোটকর্তা উদ্ধববাবু স্বয়ং, পেছনে তাঁর তহশীলদার রামলোচন চক্কোত্তি।

নবীনের সকল ভয় দূর হয়ে গেছে এতক্ষণে, সারা মনে ওর অদ্ভুত এক সাহস আপনা থেকে এসে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। ত[illegible] ক্রমেই গায়ের গামছা কখন জানি কোমরে বেঁধে ফেলেছে সে, হাতে নিয়েছে একখানা শুকনো কাঠ-শোলা। সমান লয়ে সুস্থির পা ফেলে ফেলে নিশ্চিত প্রত্যয়ে এগিয়ে এগিয়ে ঘন সারিবদ্ধ লাঠিধারীদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো সে।

সর্দার লাঠিয়ালকে নবীন সুস্পষ্ট কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো—কারা তুমরা ?

কেউ উত্তর দিলে না।

আবার নবীন প্রশ্ন করলে—কনথে আইচেন আপনারা ?

এ প্রশ্নেরও কেউ জবাব দিলে না। শুধু লাঠিয়ালদের পেছনে এসে কাস্তেধারীরা গোল হয়ে দাঁড়ালো।

নবীন এবার জোরে প্রশ্ন করলো—আমার জমির ধান কাটতিচেন ক্যানো আপনারা ?

এবার বিদ্যুৎ খেলে গেল লাঠিয়ালদের চোখে মুখে। সর্দারের চোখ মুখ আর ভ্রু কুঞ্চিত হয়ে উঠলো। পেছনে কাস্তেধারীদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হাসি ছড়িয়ে পড়লো একজনের মুখ থেকে আর একজনের মুখে।

নবীন আবার বললে—এ জমি আমার, আপনারা ক্যানো ধান কাটতিছেন ?

তবু কেউ কথা বললে না। শুধু প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপে মুখগুলো তাদের ব্যঙ্গময় হয়ে রইলো।

সর্দার লাঠিয়ালের ইঙ্গিতে আট দশজন লাঠিয়াল চলে গেল। তারা উদ্ধববাবুকে হাত ধরে মোষের গাড়ী থেকে নামালো। গোল চক্র করে ঘিরে রেখে তাঁকে নিয়ে এলো সর্দারের পাশে। রামলোচন চক্কোত্তিও তাদের সঙ্গে এসে দাঁড়িয়ে রইলো।

সর্দার জিজ্ঞাসা করলো—বাবু, এ জমি আপনার, না এই লোকটার ?

রয়েছে তার, চোখ দুটোও বিস্ফারিত হয়ে আছে তেমনি। মুখ দিয়ে গল্ গল্ করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সে বললে—উত্তোরের বিলি, মোড়ল মেদেয়। পিরতাপনগরের ঘোষবাবুরা কাটতেছি।

ছুটতে ছুটতে মাঠের ধারে গিয়ে নবীন দাঁড়িয়ে গেল। কপালে হাত লাগিয়ে তাকিয়ে দেখলো নিচেয়। যেন শকুন পড়েছে তার জমিতে, একটা নয়, দুটো নয়—ঝাঁকে ঝাঁকে।

আন্দাজে তার মনে হলো, বোধ হয় একশো দেড়শো লোক নেমেছে, মোড়ল মেদের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে তারা। ধান কাটছে নিচু হয়ে, মুঠি ঠিক করছে উঁচু হয়ে, আবার উপুড় হয়ে রাখছে সেগুলো, আঁটি বাঁধছে, আবার কাটছে তারপর। অনেকগুলো লোক লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জমির চারিপাশে, বোধহয় পাহারা দিচ্ছে তারা। কেউটি ঝোপ যেখানে শুকিয়ে গেছে সেখানে খান আষ্টেক মোষের গাড়ী। মোষগুলো শুয়ে আছে। কোনটা বা জাবর কাটছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

পেছন থেকে নবীনের সামনে আঙ্গুল তুলে হরিবোল বলে উঠলো—হু-উ-ই-যেন্, দেখতিচো, হু-উ-ই-ই···

নবীন আবার ছুটতে স্থরু করলো।

মোড়ল মেদের খানিকটা দূরে থাকতে নবীন দেখলো, যারা পাহারা দিচ্ছিল ওকে দেখেই তারা নিজেদের ভেতর কি যেন বলাবলি করছে। সারা জমিতে উঠলো একটা অস্পষ্ট চাপা কলরোল। সবাই সোজা হয়ে দাড়ালো ধান কাটা ছেড়ে। তাদের হাতে লাঠি আর কাস্তে আস্ফালিত হয়ে উঠলো শূন্যে। লাঠিধারীরা ঘন হয়ে দাড়ালো নবীন যে দিক দিয়ে যাচ্ছে সেই দিকটায়।

সাদা জামা-কাপড়-পরা দুজন ভদ্রলোক মোষের গাড়ীর উপর উঠে দাঁড়িয়েছে। দূর থেকেও চেনা যায়, প্রতাপনগরের ঘোষ বাবুদের ছোটকর্তা উদ্ধববাবু স্বয়ং, পেছনে তাঁর তহশীলদার রামলোচন চক্কোত্তি।

নবীনের সকল ভয় দূর হয়ে গেছে এতক্ষণে, সারা মনে ওর অদ্ভুত এক সাহস আপনা থেকে এসে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। তীব্রতায় ক্রমেই গায়ের গামছা কখন জানি কোমরে বেঁধে ফেলেছে সে, হাতে নিয়েছে একখানা শুকনো কাঠ-শোলা। সমান লয়ে সুস্থির পা ফেলে ফেলে নিশ্চিত প্রত্যয়ে এগিয়ে এগিয়ে ঘন সারিবদ্ধ লাঠিধারীদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো সে।

সর্দার লাঠিয়ালকে নবীন সুস্পষ্ট কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো—কারা তুমরা ?

কেউ উত্তর দিলে না।

আবার নবীন প্রশ্ন করলে—কনথে আইচেন আপনারা ?

এ প্রশ্নেরও কেউ জবাব দিলে না। শুধু লাঠিয়ালদের পেছনে এসে কাস্তেধারীরা গোল হয়ে দাঁড়ালো।

নবীন এবার জোরে প্রশ্ন করলো—আমার জমির ধান কাটতিচেন ক্যানো আপনারা ?

এবার বিদ্যুৎ খেলে গেল লাঠিয়ালদের চোখে মুখে। সর্দারের চোখ মুখ আর ভ্রু কুঞ্চিত হয়ে উঠলো। পেছনে কাস্তেধারীদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হাসি ছড়িয়ে পড়লো একজনের মুখ থেকে আর একজনের মুখে।

নবীন আবার বললে—এ জমি আমার, আপনারা ক্যানো ধান কাটতিছেন ?

তবু কেউ কথা বললে না। শুধু প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপে মুখগুলো তাদের ব্যঙ্গময় হয়ে রইলো।

সর্দার লাঠিয়ালের ইঙ্গিতে আট দশজন লাঠিয়াল চলে গেল। তারা উদ্ধববাবুকে হাত ধরে মোষের গাড়ী থেকে নামালো। গোল চক্র করে ঘিরে রেখে তাঁকে নিয়ে এলো সর্দারের পাশে। রামলোচন চক্কোত্তিও তাদের সঙ্গে এসে দাঁড়িয়ে রইলো।

সর্দার জিজ্ঞাসা করলো—বাবু, এ জমি আপনার, না এই লোকটার ?

উদ্ধব ঘোষ কেমন যেন ইতস্তত করতে লাগলেন। নবীনের মধ্যে যুগ যুগান্তের মণ্ডল বংশের দুর্জয় সাহস দেখা দিল। সম্ভজাগ্রত সেই সাহস দুর্বার করে তুললো ওকে। বীরের মত সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সে হুঙ্কার দিয়ে বললে—এ জমি আমার, আমার বাপ ঠাকুর্দার, আমার হাজার পুরুষির। চন্দোর সূয্যি যদ্দিন, এ জমি মণ্ডলদেরও তদ্দিন।

উত্তেজনায় নবীন নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলো ঘন ঘন। সর্বাঙ্গ তার কাঁপতে লাগল ধীরে ধীরে। বীরত্বের ব্যঞ্জনায় চোখ মুখ তার উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

পেছন থেকে পাশে এসে রামলোচন চক্কোত্তি ফিস্-ফিস্ করে উদ্ধব ঘোষের কানে কি বললো। উদ্ধব ঘোষ দু'পা এগিয়ে এসে সর্দারকে বললে—এ জমি আজ আমার। কর্জা টাকার দরুন নালিশ করে নীলাম করে কিনে নিয়েছি আমি। ঢোল সহরতে বাঁশ গেড়েছি, তারপর সাতষট্টি ধারায় নোটিশ জারি করেছি আশ্বিন মাসে। এ জমিতে নবীনের আজ আর কোন স্বত্বই নেই, এ জমি আজ আমার।

নবীন উত্তেজিত কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়ে বললে—মিছে কথা সব আপনার বাবু। দেখাতি পারেন কাগজপত্তোর।

আসল উদ্ধব ঘোষ এবার জেগে উঠেছে। ক্রুর ভঙ্গী করে পুরু পুরু ঠোঁট দু'খানা জিভ দিয়ে চাটতে চাটতে তাঁর বৈষয়িক রহস্য ভরা কণ্ঠে বললেন—আমার জমির ধান আমির কাটছি, কাগজ পত্র দেখবার তুমি কে হে। দরকার হয় কোর্টে যাও, কাগজ পত্র সেখানেখ দেখবে।

মহাখুশীতে রামলোচন হেসে উঠলেন। কাস্তেধারীদের উল্লাসে ধান্যভূমি কেঁপে উঠল ত্রাসে। লাঠিধারীদের উৎসাহে লাঠিতে লাঠিতে ঠোক্কর লেগে ধারাবাহিক শব্দ উঠলো ঠকা-ঠক্ করে।

সর্দার পরম উৎসাহে বললে—হুকুম দ্যান বাবু, আমরা আবার কাজ আরম্ভ করি।

—হাঁ আমি হুকুম দিচ্ছি—ধান কাটো। খুন হয় জখম হয়, সেও-ভি-আচ্ছা ধান যেন একটাও পড়ে না থাকে জমিতে।

হুকুম দিলেন উদ্ধব ঘোষ। তাঁর ডান হাত সামনে প্রসারিত, তর্জনী উদ্যত, মুখে তাঁর মহারাজের নির্ভয় দৃঢ়তা। লাঠিধারীরা বর নিয়ে যাওয়ার মত আস্তে আস্তে পা ফেলে ফেলে ঘোষ মশাইকে তেমনি চক্রব্যূহের মধ্যে করে নিয়ে গেল ঘোষের গাড়ির কাছে, পেছনে রইলো রামলোচন।

সারিবদ্ধ লাঠিধারীদের বড় অংশটা পাতলা হয়ে ছড়িয়ে পড়লো সারা জমিতে। তাদের পেছন পেছন কাস্তেধারীরা এগিয়ে গেল কাস্তে আন্দোলিত করে। মহা উল্লাসে এক সঙ্গে সারিগান গেয়ে, তারা উপুড় হয়ে পড়লো ধানের মুঠিতে কাস্তের পোঁচ দেওয়ার জন্য।

ঠিক সেই মূহূর্তে নবীন বাঘের মতো লাফিয়ে পড়লো সর্দার লাঠিয়ালের ওপর। হ্যাঁচকা টান দিয়ে তার লাঠিখানা কেড়ে নিলে। উপুড় হয়ে পড়ে গেল সর্দার মুখ থুবড়ে। বাঁ হাতে ধরা সড়কি আর ঢালখানা তার ছিটকে গেল খানিক দূরে। সে দু'খানা ক্ষিপ্র গতিতে কুড়িয়ে নিল নবীন।

অস্ত্রধারীদের কেউ কিছু করবার আগেই তীব্র গতিতে ব্যূহ ভেদ করে জমির ভেতর ঢুকে গেল। অগ্রগামী কাস্তেধারীদের আগে গিয়ে সে ঢালখানা সামনে ধরে সড়কি উঁচিয়ে চিৎকার করে বললে—অ্যাই ওপ্। খবর্দার, এক পা বাড়াইচো কি গিছো। অ্যাট্টা পোঁচ দিছ কি······!!

নবীনের চুলগুলো উস্কো খুস্কো হয়ে গেছে, চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে, রক্তের চাপে মুখখানা ফুলে উঠেছে, তার ওপর পড়ছে তীব্র রোদ্দুরের আভা। ফুলে উঠেছে হাত আর বুকের পেশী, দড়ার মত শিরাগুলো ভেসে উঠেছে চামড়া উঁচু করে, শ্বাস

প্রশ্বাসের ওঠা নামায় সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হচ্ছে পেশী আর শিরাগুলো। একক বীরত্বের এই অপূর্ব দৃশ্যের সামনে কাস্তেধারীরা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

সর্দার ততক্ষণে সম্বিত ফিরে পেয়েছে। ধারণাতীতভাবে আক্রান্ত হয়ে সে ভেবেছিল ভবলীলা তার শেষ হয়েছে বুঝি, কিন্তু নবীন তাকে অক্ষত রেখেই যখন জমির ভেতর ঢুকে গেল, তখন সর্দার বুঝতে পারলে ওদের খুন করবে না, শুধু ধানই ঠেকাতে চায়। কিন্তু শিষ্যদের সামনে নবীনের হাতে এইভাবে লাঞ্ছিত হওয়াটাও সে সম্মানজনক বলে মনে করলে না। তীব্র না হলেও, একটা মাঝামাঝি উত্তেজনায় প্রতিশোধের ইচ্ছা তার মধ্যে দেখা দিল এবং তারই আবেগে সে অন্য লাঠিয়ালদের সংহত করে ধীরে সুস্থে এগিয়ে গেল অর্ধচন্দ্র ব্যূহ রচনা করে।

লাঠিধারীরা নবীনকে ঘিরে ধরলো পিছনে আর ডাইনে বাঁয়ে। সর্দারের হুকুমে তারা একসঙ্গে চিৎকার করে ঢাল সামনে বাগিয়ে সড়কী উঁচিয়ে ধরলো।

সর্দার চেঁচিয়ে বললো নিরাপদ দূরত্ব থেকে—অ্যাই শয়তান, সড়কি রাখ্, রাখ্ বলতিছি।

হঠাৎ একখানা সড়কি নবীনের ঠিক সামনে পড়ে মাটিতে বিঁধে রইল।

'অ্যাই ওপ্' বলে লাফ দিয়ে পিছনে হটে গেল নবীন এবং চাপ খাওয়া স্প্রীং-এর মতো সঙ্কুচিত হয়ে ঢালের আড়ালে ঠমকে ঠমকে ঘুরতে লাগলো সড়কী উদ্যত করে। চোখ দুটো তার তীব্র উজ্জ্বলতায় জ্বলতে লাগলো শিকারী শ্বাপদের মতো।

লাঠিয়ালরা চিৎকার করে উঠলো সমবেত কণ্ঠে। একখানা, দু'খানা, তিনখানা করে অনেকগুলো সড়কি তার সামনে পিছনে মাটিতে বিগিয়ে পুঁতে রইল।

নবীন তখনও ঘুরছে তেমনি করে আর 'অ্যাই ওপ্, খবরদার,

বলছে। গা দিয়ে তার ঘাম বেরিয়ে আসছে। উত্তেজনায় কাঁপছে তার সারা অঙ্গ। মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছে ঘুরতে ঘুরতে।

লাঠিধারীরা ধীরে ধীরে ওর কাছে এগিয়ে যেতে লাগলো আর চেঁচাতে লাগলো বাঘ শিকারের মত সমবেত শব্দ তুলে। তার সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে সড়কি পড়তে লাগলো শিলাবৃষ্টির মতো।

অকস্মাৎ সর্দার ছুটে গিয়ে পেছন থেকে জাপটে ধরলো নবীনকে। লাঠিধারীরাও এক সঙ্গে ছুটে গিয়ে নবীনকে ঠেসে ধরলো মাটিতে।

নবীন তাদের হাত ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলো প্রাণপণে। সর্দার লাঠিয়াল নবীনের বুকের ওপর চেপে বসলো। অন্য লাঠিয়াল একে একে তার ঢাল সড়কী কেড়ে নিলে। তার কোমরের গামছা খুলে পা বেঁধে ফেললো। কাপড় খুলে হাত বাঁধলো পিঠমোড়া দিয়ে। তার পর সবাই মিলে তাকে ধরাধরি করে নিয়ে গেলো এবং যে মোষের গাড়ীতে বসেছিলেন উদ্ধব ঘোষ আর রামলোচন চক্কোত্তি, তার নিচে মাটির ওপর ফেলে রাখলো তাকে।

উদ্ধব ঘোষ সাফল্যের গর্বে উঠে দাঁড়ালেন গাড়ীর ওপর। আবার তাঁর মোটা ঠোঁট জিভ দিয়ে চেটে নিলেন। আবার ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন সামনে এবং তর্জনী উঁচিয়ে হুকুম দিলেন—বাঁধো, বাঁধো হারামজাদাকে চাকার সঙ্গে।

লাঠিয়ালরা উলঙ্গ অর্ধচেতন নবীনকে মোষের গাড়ীর চাকার সঙ্গে বেঁধে রাখলো তারই কাপড় আর গামছা দিয়ে। ধান চাপার দড়ি দিয়ে পা থেকে কণ্ঠ পর্যন্ত পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে জড়িয়ে রাখলো চাকার কাঠের সঙ্গে। সেই গাড়ীর উপর বসে রইলেন তালুকদার মহাজন উদ্ধব ঘোষ আর রামলোচন তহশীলদার। ঘোষের মুখে কখন জানি আপনা থেকে ফুটে উঠলো আলেকজাণ্ডারের বিজয়ী হাসি।

রামলোচন হঠাৎ দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে সুরু করলেন সেই বিরাট

বিলের ভেতর। অতিশয় প্রয়োজনের সময় টাকা কর্জ দিয়ে লোকের উপকার করার পর তারা যে কেমন নিমকহারাম হয় চাকায় বাঁধা নবীনের দিকে আঙুল দেখিয়ে তিনি তা বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। বক্তৃতা শুনে শুনে কাস্তেধারীরা ধান কাটতে আরম্ভ করলো দ্রুত বেগে। ল্যাঠয়ালরা সারা জমিতে ছড়িয়ে পড়ে পাহারা দিতে লাগলো আবার।

মাদারী পাড়ায় ছুটে গিয়েছিল সাহায্যের আশায়। কিন্তু এমন বিপদে সাহায্য করতে কেউ এগিয়ে আসেনি। মাঠের মাঝখানে এসে সে কাঁদতে লাগলো উচ্চৈঃস্বরে। পেছনে দাড়িয়ে কাঁদতে লাগলো তার ছেলেমেয়েগুলো করুণ সুরে। এই সমবেত কান্নার শব্দ উত্তুরে বাতাসে ছড়িয়ে পড়লো সারা মাঠে, গাঁয়ের ভেতর আর বিলের সর্বত্র।

মাদারীর ও তার সন্তানদের সমবেত সেই কান্নার সুরে উদ্ধব ঘোষ কেমন এক অস্বাভাবিক দুর্বলতা অনুভব করতে লাগলেন।

চাকার তলা থেকে এক সময় বাঁধনের যন্ত্রণা উপেক্ষা করে অস্পষ্ট চেতনার ভেতর থেকেই চেঁচিয়ে উঠলো নবীন—অ্যাই ওপ্, মণ্ডলদের হাজার পুরুষে জমি, খবরদার……

উদ্ধব ঘোষ নিজেকে ক্ষত্রিয় বলে মনে করেন। অসহায় নবীনের উদ্ধত উক্তিতে তিনি বীরের মতই বেদনা বোধ করলেন, এবং সর্দারকে ডেকে বললেন—আর কেন, জমির বার করে কাপড় পরিয়ে, ওকে বাড়ীমুখো করে পাঠিয়ে দ্যাওগে।

সারা দিন রাত বারান্দায় শুয়ে রইলো নবীন, নড়বার শক্তি ছিল না একবিন্দু। একদানা অন্নও সে মুখে দেয়নি, দু'ফোঁটা জল মুখে দিয়ে শুধু চোখ বুজে পড়ে রইলো।

প্রতিবেশীরা এসে নানারকম সান্ত্বনার বাক্য শুনিয়ে গেল আর

কলকে কলকে তামাক পুড়িয়ে গেল সেই সঙ্গে। জ্ঞাতিরা এসে রইলো বিকেল পর্যন্ত। নবীন একটি বাক্যও উচ্চারণ করলো না।

মাদারী ঢেঁকিশালে বসে রইল ঢেঁকির পোয়া হেলান দিয়ে, কারো সঙ্গে কথা বললো না। জ্ঞাতি জায়েরা এসে তাকে রাঁধতে বললো, সন্তানদের খাওয়াতে অনুরোধ করলো আর বুকে অনেক বল করতে উপদেশ দিল। মাদারী তবু নিশ্চল পাথরের মতো বসে রইলো। জ্ঞাতি মেজগিন্নি বাড়ী থেকে ভাত এনে সন্ধ্যার সময় খাইয়ে গেল ছেলেমেয়েগুলোকে।

সন্ধ্যের পরেই নবীন বেহুঁস হয়ে পড়লো প্রবল জ্বরে। ছেলেমেয়েগুলো একে একে নবীনের পাশে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। শুধু কোলের শিশুটি মাই খেতে খেতে ঘুমিয়ে পড়লো মাদারীর বুকে।

শেষ রাত্রে জ্বর কমে এলে নবীনের হুঁস হলো। শিয়রে-রাখা ঘটি থেকে ঠাণ্ডা জল খেলো আধবোঁজা চোখে তাকিয়ে দেখলো জোছনার আলোয় ভরে গেছে সারা পৃথিবী। হিমেলো বাতাস বইছে ধীরে ধীরে। উঠোনের ঘাসে আর ধূলোর ওপর শিশির চক্-চক্ করছে জোছনার আলোয়।

মাদারী মৃদুকণ্ঠে করুণ সুরে কাঁদছে—ওরে আমার বিয়ে হলো ক্যানো রে, তাই জন্যিতি এই সব্বোনাশ হোলো রে, আমার মরোণ হয় না ক্যানো রে, এ জেবন আর রাখপো না রে, অ্যামোন বিয়ে আর য্যানো কারু না হয় রে……

নবীনের জ্বরে-উত্তপ্ত কল্পনায় যৌবনের দিনগুলো ভীড় করে দাঁড়ায়। উদ্ধব ঘোষের বাবার কাছ থেকে টাকা কর্জ করে তার বাপ তারণ মণ্ডল বিয়ে দিয়েছিলেন নবীনের। আজ উদ্ধবের বাবাও নেই, নবীনের বাবাও নেই।

কিন্তু আনন্দের দিনের সেই বিয়ের সঙ্গে কর্জ করা সেই টাকাগুলো

বেঁচে আছে আজও। তবে তফাতটা এই যে, সে-দিনের সেই একগুণ টাকা দশগুণ হয়ে আজ তাদের সমগ্র জীবন গিলে ধরেছে অজগর সাপের মতো। সেদিন যে টাকায় দু'টি নরনারীর দু'টি হৃদয় এক করে দিয়েছিল, আজ সেই টাকাই সেই মিলনের সকল মহিমা ধূলায় লুটিয়ে দিয়েছে। দু'টি দিনের এই পার্থক্য অদ্ভুত বলে মনে হয় নবীনের। তার আরও মনে হয়, টাকার অজগর তাদের সব কিছুই গিলে খেয়েছে। সামনের দিকে আর তাদের জীবন নেই, সেই অজগরের পেটে হারিয়ে গেছে কবে জানি।

মাদারীর কান্না তখনও চলেছে সমানে। জোছনার আলো পড়েছে তার গায়ের ওপর। চুলগুলো খুলে পড়েছে মুখের ওপর। পা দু'খানা প্রসারিত হয়ে নেমে এসেছে ঢেঁকি ঘরের ছাঁইচে। কোলে তার ঘুমন্ত শিশু।

নবীন গভীর বেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। সকলের লাঞ্ছনা, সারাদিনের গ্লানি, দেহ মনের দুর্বলতা, তার বিবাহোত্তর জীবন, ঘর সংসার সব কিছুকে ছাপিয়ে এক গভীর অনুভূতির বন্যা ধীরে ধীরে সুনিশ্চিত গতিতে জীবনের মর্মমূল থেকে উৎসারিত হয়ে প্রসারিত হতে হতে তার স্নায়ুতন্ত্রী, দেহের পেশী আর মনের চেতনাকে প্লাবিত করে দেয়।

এই নৈর্ব্যক্তিক ভাব প্লাবনের শ্বাসরোধী যন্ত্রণায় পাগল হয়ে যেতে যেতে সে যেন আবছা আবছা অনুভব করে—বহুযুগের বুকে প্রসারিত মণ্ডলবংশের সহস্র শিকড় আজ মহাবলশালী এক দুনিবার শক্তির আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে, সে শক্তির কূল নেই কিনারা নেই, অবিশ্রান্ত স্রোতের বেগে আবর্ত রচনা করে করে সে শক্তি ভাসিয়ে ভাসিয়ে ভেঙ্গে ভেঙ্গে নিশ্চিহ্ন করেছে চাষীপাড়া, মুছে ফেলেছে বিল অঞ্চল।

পরদিন যখন নবীনের বাড়ীতে অনেক লোকের জটলা চলছে তখন চন্দোর ঢালী কাঁদতে কাঁদতে এসে সবার সাহায্য চাইলে।

প্রতাপনগরের চক্কোত্তিরা বন্ধকী দেনার দরুণ তার জমির ধান কেটে নিচ্ছে। সবাই এগিয়ে গেলো, মাঠের ধারে গিয়ে সবাই চেয়ে দেখলো অনেক লোকে ধান কাটছে, এবং নিজেদের মধ্যে ফিস্-ফিস্ করে ধানকাটা দাওয়াল আর চক্কোত্তিদের বাপমায়ের নামে খিস্তি করতে লাগলো। তারপর তাদের মধ্যে কারও বাড়ীতে ছেলের অসুখ নিতান্ত প্রবল হয়ে উঠলো, কারও বা নাকে গুড় পোড়া গন্ধ লাগলো, আর কারও বা কানে বাড়ী থেকে ডাকার শব্দ ভেসে এলো।

অতএব বুড়ো চন্দোর ঢালীকে সেখানে রেখেই প্রস্থান করলো তারা। চন্দোর অনেক দেখা লোক, বোকামী করে জমিতে গিয়ে মার খাবার চেয়ে সমব্যথী নবীনের বারান্দায় বসে তামাক পোড়ান তার পক্ষে অনেক ভালো।

পরদিন, পরদিন এবং তারও পরদিন।

আজ সাতভিটের হরিবোল সর্দার, ভীম সর্দার আর কেষ্ট ঢালী, কাল গাবোখালির চন্দোর মণ্ডল আর পঞ্চা দফাদার এবং পরশু হরিদাস কাটীর মতি বিশ্বেস, কালী বাছাড়। প্রতাপনগর, সুবলকাটী আর ঢাকুরের মহাজনেরা, জমিদারেরা, তালুকদারেরা, জোদ্দারেরা আর চুনোপুঁটি বাবুরা, শিয়াল কুকুর কাক শকুনিতে যেমন করে মড়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তেমনি করে ঝাঁপিয়ে পো'লো প্রকাণ্ড বিলটার ওপর, যেমন করে মড়ার মাস দাঁত দিয়ে কেটে নেয় শ্বাপদেরা আর মাংসাশী পাখীরা, যেমন করে শবদেহ থেকে টেনে হিঁচড়ে নাড়ীভুড়ি বার করে নিয়ে কলহ করে তারা নিজেদের মধ্যে, যেমন করে মড়ার ঠ্যাং আর মাথা নিয়ে পালিয়ে যায় কুকুর শিয়াল, তেমনি করে পাওনাদারেরা ছেঁড়াছিঁড়ি, কামড়াকামড়ি করলে, এবং নানাভাবে নানা ফন্দিতে দেনদার চাষীদের জমির ধান নিয়ে জমা করলো নিজেদের ছোট বড় খামারে।

অনাবৃষ্টির জন্যে ফসল ভাল হয়নি। ছ'চার মুঠো যা পাওয়া যাবে নিজেদের খোরাকীর জন্যে রেখে দেনা যে আর কেউ শোধ দেবে না পাওনাদারেরা এ কথাটা ধ্রুবসত্য বলে ধরে নিয়েছিলো। এমন অবস্থায় কি করা যাবে বুঝতে না পেরে দুঃশ্চিন্তায় যখন পাওনাদারদের মনের শান্তি আর চোখের ঘুম নষ্ট হবার উপক্রম, পাকা তালুকদার মহাজন উদ্ধব ঘোষ তখন সশরীরে নবীনের জমিতে সসৈন্যে অবতীর্ণ হয়ে পথ দেখিয়ে দিলেন এবং তাঁর মতো তালুকদার মহাজনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ছোট বড় সবাই পাওনা সমুদ্রের তীরে ওয়াশীলবায়ু সেবনে ইতস্তত করলেন না আর একদিনও।

নিজেদের হাতে যারা নিজেদের জমিতে ফসল ফলিয়ে অনাবৃষ্টি দেবতার উচ্ছিষ্টের দিকে তাকিয়ে জীবনধারণের আশায় বুক বেঁধেছিলো, এই জমিদারী মহাজনী মূষলের চরম আঘাতে মাথায় হাত দিয়ে বসে প'লো শুধু তারাই। মুখের গ্রাস বিনা নোটীশে কেড়ে নেওয়ার জন্যে প্রথমে তারা প্রতিবাদ জানাবার নানা ফন্দি এঁটেছিলো বাতুলের মতো। কিন্তু ঘণ্টা বাঁধতে গিয়ে, ছ'চারটে লাঠির বাড়ি, সড়কীর খোঁচা, এক আধবার লালপাগড়ীর হাতকড়া আর থানার হাজতদর্শনের সুফলেই সে সব ফন্দি বানচাল হয়ে গেল ছ'দিনেই। ফলে চাষীর হাতের তৈরী ধান হাসতে হাসতে গিয়ে জমিদার মহাজনের থামার আলো করে রইলো।

চার

নবীনের মিতে রাজাপুরের নব বিশ্বাস। নবর বাবা জমিদার কাছারীতে প্রথমে বরকন্দাজী, পরে নায়েবের পদসেবা এবং আরও পরে মহাজনদের সঙ্গে দালালি করে যা-কিছু জমিজমা করেছিলো

মৃত্যুর পর তার অধিকাংশই আবার তাদের হাতেই চলে গিয়েছিলো পুত্র নবকুমারের সুযোগ্য বুদ্ধির জোরে। নবর বাবা ছেলেকে বুদ্ধিমান বানাবার জন্যে কোন উপায়ই বাদ দেয়নি, এমনকি যা তখন প্রায় অসম্ভব ছিল সেই কাছারী বাড়ীর পাঠশালাতেও ছেলেকে সে পড়িয়েছিল। কিন্তু বাবুপাড়ার অস্পৃশ্যতাবোধের গণ্ডী অতিক্রম করে সে বিদ্যে তার পক্ষে বেশীদিন রপ্ত করা সম্ভবপর হয়নি। কোনমতে বেঞ্চির নিচে তালপাতার চাটাইতে বসে বসে তৃতীয় মান অবধি উঠেই সে মা সরস্বতীকে স্কুলবাড়ীর আমতলায় দাঁড়িয়ে শেষ প্রণাম জানিয়ে প্রথমে গরু চরানোটা ভালভাবেই রপ্ত করে নিলে। বাবার মৃত্যুর পর আদরের দুটো বলদ জুড়ে সুখের গাড়ীখানা রাথীমালের ব্যবসায়ের নামে এ-হাট থেকে ও-হাটে চালাতে চালাতে ভুলে গেল আপন ঘর-সংসারের কথা। কিন্তু বাঁশী বাজানোর পরামান্দ আর হাটের আলোকসজ্জা যখন নিভে এলো, যখন তেলিকুড়ের ফরসা বড়বৌ আর চমকডাঙ্গার বিধবা বড়দি ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো এবং নির্বিঘ্ন শান্তিভরা নিজস্ব গৃহকোণে আপনার একজন স্থায়ী কারো নরম দেহের উষ্ণ স্পর্শ আর প্রাণের সেবার উদগ্র কামনা দেহমনে বিপ্লব সুরু করে দিলে, সেই সময় মাঠের দিকে তাকিয়ে নব জীবনে সেই প্রথম অনুভব করলো তার পায়ের তলা থেকে অনেক মাটী প্রতাপনগরের বাবুদের বাড়ীতে গিয়ে জমে রয়েছে। সেই সময় প্রায় পাগলের মতো হয়ে অবশিষ্ট মাটিটুকু সে আঁকড়ে ধরলো। ধান বুনে, মূলো পুঁতে বছরের শেষে নবকুমার যখন স্পষ্ট বুঝতে পারলো বাবার কৃপায় তার ছোট একটা সংসার চলে যাবে কোনমতে, তখন তার মায়ের উৎসাহের আর অন্ত রইলো না। আত্মীয়-স্বজনে বাড়ী প্রায় ভরেই রইলো বারো মাস। অবশেষে ফাগুন মাসের এক জ্যোৎস্না রাত্রে নব যাকে নিজের বিছানায় দেখতে পেলো তার ছোট্টদেহের ফুটফুটে রং

দেখেও শ্রীমানের রাগ কমলো না। পরদিন সে মাকে ডিমে তা'দিতে বলে আবার বেবাগী হয়ে গেল। তবে সেটা বেশীদিন নয়। অন্ততঃ পুতুল খেলাটাও তো করা যাবে, এই ভরসায় আষাঢ় মাসের প্রথম জলে নব স্থায়ীভাবে সংসারী হয়ে গেল। কিন্তু রাখীমালের ব্যবসায়ের নামে গাড়ী চালিয়ে তার একহাট থেকে আর এক হাটে যাওয়াটা বন্ধ হলো না কোনমতে, আর হাটের পাশে, কি মাঠের মাঝে গাড়ী থামিয়ে বাঁশী বাজাবার বদভ্যাসটুকু রয়েই গেলো সেই সঙ্গে। অবশ্য তেলিকুড়ের ফরসা বড়বৌ আর চমকডাঙ্গার বিধবা বড়দি তখনও তার সেই সঙ্গীতমুখর স্বপ্নে ঘোরাফেরা করতেই লাগলো আগের মতো।

নবীনের দুঃখে এহেন নব-মিতে এসে দুঃখী হলো এবং 'ধিত্তুমার' বলে পিঠ চাপড়ে অভয় দিয়ে মুখ থেকে হুঁকো কেড়ে নিয়ে তামাক টানতে টানতে নবীনের চোখ অশ্রু সজল করে তুললো।

সেদিন বিকেলে এই নব-মিতের নেতৃত্বে নবীন গিয়ে উঠলো উদ্ধব ঘোষের বাইরের বাড়ীতে। সামনেই খামার, সেখানে অনেকগুলো ধানের সঙ্গে তার ধান কটাও গাদা দেওয়া আছে দেখা গেল। সেইদিকে নবীন কয়েকবার প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে নবর পেছন পেছন ভেতরে ঢুকলো। উদ্ধব ঘোষ মশাই তখন সেরেস্তা তথা গদিতেই উপবেশন করে ছিলেন। অদূরে তাঁর তহশীলদার রামলোচন চক্কোত্তি নানা আকারের খেরো-বাঁধান খাতার ছোট-বড় স্তূপে পরিবৃত হয়ে যমপুরীতে চিত্রগুপ্তের মত নির্ভুল হিসেব কষছিলেন এবং মাঝে মাঝে মুখ উঁচু করে কোন্ খাতকের বা প্রজার তামাদীর শেষ দিন কবে সমুপস্থিত হবে সুতো-বাঁধা চশমার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে সে-কথা উদ্ধব ঘোষকে জানিয়ে দিচ্ছিলেন। জার্মান সিলভারে বাঁধানো হুঁকোর খোলে মুখ লাগিয়ে নিমিলিত চোখে গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন উদ্ধব ঘোষ। নব আর নবীন বাইরের ঘরের দরজা থেকেই 'বাবু সেলাম' দিলে। নবীন

সেলাম করতে করতে প্রায় উপুড় হয়েই রইল। নব উঠে বললে—ছোট কত্তা পেন্নাম হই।

উদ্ধব ঘোষ চোখ আধখোলা করে বললেন—কে-র‍্যা, নবা? বোস্। সামনের দিকে মুখভঙ্গী করে উপুড় হয়ে থাকা নবীনকে দেখিয়ে বললেন—উটা কে-র‍্যা?

নবীন ততক্ষণে উঁচু হয়েছে। ঘোষ মশাই যেন বিস্মিত হয়েছেন এমনি ভাবে বললেন—আরে নবনে য্যা। বস্ বস্।

এই সস্নেহ আহ্বানে নবীন প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে উঠেছে। এমন সময় রামলোচন চক্কোত্তি বললেন—বিলক্ষণ, ওতো নবীন নয়, ও যে মহারথী জয়দ্রথ।

রসিকতাটায় ঘোষমশায় হাসলেন না দেখে চক্কোত্তি আরও রসালো করে বললেন—"যথা ভীম ভীমসেন কৌরব সমরে।"

ঘোষমশাই এবারও হাসলেন না দেখে চক্কোত্তি নিজেই ফ্যাকসা হেসে ক্ষতিটা পূরণ করে নিলেন এবং অবশিষ্ট যে নড়া দাঁতটা তাঁর নিচের ঠোঁটে ঝুলে পড়েছিল হুস্ হুস্ শব্দ করে সেটাকে ভেতরে টেনে ফস্ করে মুখ বুজিয়ে ফেললেন।

ঘোষমশাই হুঁকো থেকে স্বহস্তে কলকে নামিয়ে খাটের পাশে রেখে বললেন—নে তামাক খা।

কলকে নিতে গেলে খাট ছুঁতে হবে, সেটা অন্যায় হবে কি হবে না বুঝতে না পেরে যখন নবীন আর নব মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছিল ঘোষ মশাই তখন আবার বললেন—কি রে, রাগ করলি নাকি।

ঘোষ মশাইয়ের গলায় আত্মীয়তার সুরে চক্কোত্তি পর্যন্ত বিস্ময় বোধ না করে পারলেন না। এর পর আর খাট থেকে কলকে না নিয়ে পারা যায় না। কর্তার সামনে তামাক খেলে অসম্মান করা হবে ভয়ে কলকে নিয়ে নবীন আর নব বাইরে চলে গেল। সেখানে বারান্দায়

দেওয়ালে নিচু জাতের জন্যে ছোট বড় কড়ি-বাঁধা যে সব হুঁকো ঝোলানো আছে তা-থেকে একটা হুঁকো নিয়ে ওরা তামাক খেতে লাগলো। ঘোষমশাই চোখ বুজে তাকিয়া ঠেস দিয়ে কাত হয়ে রইলেন হাতের ওপর মাথা ঠেকিয়ে।

নব আর নবীন তামাক খেয়ে কলকে এনে খাটের ওপর রাখতেই ঘোষ মশাই সেটা তুলে নিয়ে আবার হুঁকো টানতে লাগলেন এবং নব কিছুক্ষণ উস্‌-খুস্‌ করে—'ছোটকত্তা, অ্যাট্টা, নিবেদন'···পর্যন্ত বলতেই বললেন—নবীনের ব্যাপারটাতো ?

অন্তর্যামী ঘোষ মশাইয়ের অগ্রিম সায় পেয়ে নবীন আর নব অত্যন্ত উৎসাহ বোধ করলো। নবর পাশে নবীন উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে রইলো।

ঘোষ মশাই বললেন—অন্য যায়গায় যা খুসি করগে, কিন্তু আমার সামনে অমন করে থাকবে না কোন দিন। মানুষের অসম্মান আমি সইতে পারি নে, ওতে নারায়ণও অসম্মান বোধ করেন।

ঘোষ মশাইয়ের মতো পরাক্রান্ত তালুকদার আর মহাজনের মুখে এমন কথা শুনে ওরা দুজনে বসতে গিয়েই আবার উঠে দাঁড়ালো। রামলোচন চক্কোত্তিও বিস্ময়ের উত্তেজনায় কানে কলম গুঁজে ফেললেন তাড়াতাড়ি এবং এরপর আরও কি বিস্ময় আছে দেখবার জন্যে খুলির ভেতর ঢুকে-যাওয়া তাঁর বিড়ালের মত দু'টো চোখ যতদূর পারা যায় প্রসারিত করে সোজা হয়ে বসে রইলেন।

ওরা বসলে ঘোষমশাই জিজ্ঞাসা করলেন—বাড়ীর খবর কি তোর, নবীন। ছেলেমেয়েরা কেমন আছে ?

অতবড় আত্মীয়তার আঘাতে নবীন কি বলবে বুঝতে না পেরে ধরা গলায় যা বললে তার শব্দ কেউ না বুঝলেও শব্দার্থ বুঝতে কষ্ট হল না কারো।

নবকেও তিনি কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। বললেন—আমাদের রাঙ্গা-বউমা কেমন আছে রে নবা? তোর মা বেঁচে আছে তো?

ঘোষ মশাইয়ের কাণ্ড দেখে চক্কোত্তি তাজ্জব বনে গেলেন। চশমার ফাঁক দিয়ে রামলোচন তাঁর ভাবান্তর লক্ষ্য করতে লাগলেন গভীর উদ্বেগ ও আশঙ্কার সঙ্গে।

এর পরে ঘোষ মশাই বললেন—তোরা আসবার সময়ও আমি নবীনের কথা ভাবছিলাম। এ দু'দিন আমি নিজেই কেমন অস্বস্তি বোধ করছি ব্যাপারটা নিয়ে। বেচারা ছেলে-পুলে নিয়ে ঘর করে। একবারে উচ্ছেদ করলে যাবেই বা কোথায়। আর কি জমি আছেরে তোর নবনে?

এমন উদার ও আত্মীয়তার কথা শুনেই নবীন কেমন হয়ে গেছে। কথা বলা তো দূরের কথা অনুভব শক্তিও যেন নেই তার। নবই জবাব দিল—আজ্ঞে ছোটকত্তা, এই গেন্, বসত বাড়ী ছাড়া আর কিছু নেই ওর। একপাল ছবাল মায়ে······

—হুঁ, তা বেশ, তা কি করতে চাস তোরা?

সহানুভূতির এমন তীব্র আঘাত সহ্য করতে না পেরে নবীন ছুটে গেল হাত জোড় করে খাটের দিকে। চক্কোত্তি মশাই হেই—হেই করে উঠলেন। নব হাত ধরে মাটিতে বসিয়ে দিল নবীনকে।

নবীন কিছু বলতে পারছিল না। বুকের কোমল অংশ থেকে একটা অতি দুর্বোধ্য দুর্বলতা তার সর্বাঙ্গ যেন দুমড়ে মুচড়ে দিচ্ছিল আর সব সময়ই ইচ্ছে হচ্ছিল ঘোষ মশাইয়ের পা দু'খানা হাউ-মাউ করে জড়িয়ে ধরতে। তাড়া খেলে বা বকুনি খেলে যা হোক সে বলতে কইতে পারতো দু'চার কথা। সে অবস্থায় সে চেতনা ঠিক রাখবে বলে বাড়ীতে ও পথে মনে মনে তৈরি হয়েই এসেছিল। কিন্তু আশাতাত এই সস্নেহ প্রাপ্যে সে ভেঙ্গে-চুরে তছনছ হয়ে গেছে। হাজার চেষ্টাতেও ঠিক কথাটি ঠিক করে বলতে পারছে না। অবস্থা

দেখে মিতে নব তার পক্ষ হয়ে বললে—আপনি তো ছোটকত্তা প্রায় অন্তরজামীন। মিতে যাতে মণ্ডল বংশের মান বজায় রাখে ছবাল-পবাল নিয়ে বাঁচে থাকতি পারে তার যাহোক অ্যাট্টা ব্যাওস্তা আপনি নিজে থাকে করে দ্যান্। আর কি নিবেদোন করবো ছোটকত্তা, আমই কয় খুঁচি ধান দিয়ে উরগে বাঁচায়ে রাখতিচি। ওর ধান কয়ডা যদি……

উদ্ধব ঘোষ সত্যই অন্তর্যামী। বললেন—আমার পরে যখন ছেড়ে দিচ্ছ, ব্যবস্থা তখন একটা করবোই আমি। মোড়লদের সঙ্গে আমাদের সাত পুরুষের সম্পক্কো। বাপ ঠাকুদ্দা যাদের রেখে এসেচেন আমি কি আর তাদের ফেলতে পারবো নব।

এতবড় উদারতার ঘটনা পৃথিবীতে আর ঘটেনি কোনদিন ভেবে নবীন হাউ মাউ করে ঘোষ মশাইয়ের পা জড়িয়ে ধরে বলে উঠলো—আপনি আমার পিৎরি তুল্লো, বাঁচান আমারে।

ঘোষ মশাইয়ের মহৎ উদারতায় ব্যাবস্থা একটা হলোই। ধান যখন তিনি কেটেছেন তখন আর ফেরৎ দিতে পারবেন না, কারণ সম্মান নষ্ট হবে। রাজভাগ রেখে বর্গাভাগই নবীন নেবে। তিনি ছাড়া অন্য লোক হলে তাও যে দিত না, উল্টে যে ধান কাটাবার খরচাটাই দাবী করে বসতো, নিতান্ত তিনি উদ্ধব ঘোষ, তাই মণ্ডলদের বাঁচাবার জন্যেই এমন মহৎ ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। তারপর আরও আছে, সপ্তাশ্চর্য তখনও শেষ হয়নি, নবীনের জমিও তিনি কেড়ে নিতে চান না, কারণ যে মণ্ডল বংশের সঙ্গে তাঁদের সাত পুরুষের সম্পর্ক, তারা যে দোরে দোরে জন খেটে খাবে তা তিনি দেখতে পারবেন না। বরং তাদের মান যাতে উঁচুই থাকে সেই জন্যেই তিনি জমিটা নবীনকে দিয়েই দিলেন। তবে নবীনের কাছ থেকে পাওনা তিনি জোর করে আদায় করতে চান না, নবীনই বলুক, দেনা শোধ না করলে পরজন্মে সে কেন, মণ্ডলবংশের সাত পুরুষ ধরে কোনদিনই মুক্তি পাবে না, কাজেই নবীনই বলুক, দেনা

সে শোধ করবে কি না, সে যদি বুকে হাত দিয়ে ভগবানের নামে শপথ করে বলতে পারে, তার নিজের বিয়ের দেনা সে নিজেই শোধ না করে তার মরা বাপকে নরকে পচাবে, তবে সব পাওনা টাকাই তিনি ছেড়ে দেবেন হাসতে হাসতে, ধর্মের জন্যে অমন দু'দশ টাকা জলে যাওয়াতে প্রতাপনগরের ঘোষেদের কিছুই যায় আসে না। নবীন যখন বুকে হাত দিয়ে অস্বীকার করতেই পারছে না, তখন দেনাটাও যাতে তার গায়ে না লাগে তেমনি করেই তিনি ব্যবস্থা করবেন। জমির তো একটা রাজস্ব দিতেই হবে, বিনা করে তো আর মাটি পাওয়া যায় না, কাজেই বিঘেপ্রতি পাচ টাকা হারে বছরে ছ'বিঘেতে মোট তিরিশ টাকা আর কিস্তী-খেলাপী সুদ, সেস্ বার্‌বরদালী নিয়ে আর এক টাকা করে, মোট ধরগে এই ছত্রিশ টাকা করে দিলেই চলবে। তবে সেটা যতদিন দেনা শোধ না হয়। দেনাটা শোধ হয়ে গেলেই তিনি আগের নিরিখে খাজনা কমিয়ে দেবেন। এখন কোন লেখা-পড়ার ব্যবস্থা সেই জন্য হবে না, দেনা শোধ হলেই চলতি-হারে খাজনা ঠিক করে যখন খুশী একটা কবুলতি যেন নবীন দিয়ে যায় তাঁর কাছে।

এমন সুবন্দোবস্তের কথায় রামলোচন চক্কোত্তির পাকা মাথাই ঘুলিয়ে যাচ্ছে, তো নব আর নবীন কোন ছার। নবীনের মনে হলো, সে যেন কঠোর সাধনার পর কোন প্রসন্ন দেবতার বর লাভ করছে। দু'চোখ বেয়ে তার জলের ধারা গড়িয়ে পড়লো। নব'র মনে হলো বহু-যুগের মধ্যেও এমন মহত্ত্বের ঘটনা এই ধূলোমাটির পৃথিবীতে আর ঘটেনি, কাজেই পৃথিবীতে সত্যযুগ নেমে আসতে আর বিলম্ব নেই। শুধু বিস্ময়ে অতি-বিস্ফারিত রামলোচনের দু'টি চক্ষু চশমার ফাঁক দিয়ে বোধ হয় ঘোস মশাইয়ের অঙ্গে ঠিকরে পড়তে লাগলো অন্ধকার রাত্রে বিড়ালের দু'টী জ্বলন্ত চোখের মত।

চোখবুজেই ঘোষ মশাই প্রশ্ন করলেন—খুশী হয়েছিস নবীন?

নবীন উঠে খাটের পাশে দু'হাত জোড় করে দাঁড়ালো। তার পর খাটের পায়া ধরে বসে পড়ে সে আবার ফোঁস্-ফোঁস্ করে কাঁদতে লাগলো। সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করতে করতে এক সময় তার অভিভূত অন্তর থেকে গদ-গদ কণ্ঠে উচ্চারিত হলো—আমার মত অধোমরে খ্যামা করেন ছোটকত্তা।

ওরা অর্ধেক ধান নেওয়ার জন্য মোষের গাড়ী খুঁজতে বেরিয়ে গেল।

অনেকক্ষণ ঘোষ মশাই নীরবে চোখ বুজে রইলেন তাকিয়া হেলান দিয়ে। অনেকক্ষণ একটা হিসাবের ওপর চোখ রেখে রামলোচন নির্বাকে বসে রইলেন। অত্যন্ত আস্তে আস্তে শীতকালের বিকেলের ছায়া ঘরের ভেতর নামতে লাগলো আবছা হয়ে। বাইরে নারকোলের পাতায় পড়ন্তবেলার রোদ নড়তে লাগলো মন্থর উত্তুরে বাতাসে সম্প্রতি আরোগ্য লাভ-করা বিধবা রোগীর ফ্যাকাশে ঠোঁটের নিষ্ফল হাসির মত।

হঠাৎ ধীর কণ্ঠে ডাকলেন উদ্ধব ঘোষ—রামলোচন!

রামলোচন তেমনি করে উত্তর দিলেন—আজ্ঞে।

—ব্যবস্থাটা কেমন হলো?

—রাজার কাছে প্রজা যেমন ব্যবস্থা প্রত্যাশা করে মহারাজ!

এইবার হাসলেন উদ্ধব ঘোষ, অত্যন্ত প্রাণ-খোলা আর অত্যন্ত জোরালো হাসি। ছাদের কড়ি বরগা পর্যন্ত সে হাসিতে কেঁপে উঠলো।

রামলোচনের ঠোঁট দু'খানা অর্থপূর্ণ হাসিতে কুটিল হয়ে উঠলো। তার নড়া দাঁতটা আবার ঝুলে পড়লো নিচের ঠোঁটের ওপর এবং হুস্ করে একটা শব্দ উঠলো তার ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে।

বর্গা ভাগের অর্ধেক ধান মোষের গাড়ীতে করে বাড়ীতে পালা দিয়ে সাজিয়ে রাখতেই রাত্রি হয়ে গেল। খাওয়া দাওয়া সেরে তামাক টেনে দুই মিতেতে বারান্দায় শুয়ে পড়েছিল এক মাদুরেই।

কারও চোখে ঘুম এলোনা অর্ধেক রাত্রি পর্যন্ত। সারা দেহ মনে একটা অব্যক্ত যন্ত্রনায় পীড়িত হতে হতে নবীন এক সময় উঠে পড়লো এবং বারান্দায় পায়চারী করলো খানিকক্ষণ ধরে। তারপর আবার শুয়ে পড়লো, এবং বিরামহীন ছেদহীন সেই অতি মৃদু অদ্ভুত যন্ত্রনায় আবার উঠে পড়লো।

নব গায়ে হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করলো—কি হলো, ও মিতেন?

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো নবীন। সারা দেহ তার নড়তে লাগলো বিক্ষোভে।

নব উঠে বসে তার পিঠে নাড়া দিয়ে বললো—এর মধ্যি তুমার কি হলো, ও মিতেন!

—অজগর সাপের পেটে চলে গিলাম রে মিতেন, আর আমরা বাঁচপো নারে—এ-এ, বলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো নবীন অসহায় স্ত্রীলোকের মত।

নব সবই বুঝতে পারে। উদ্ধব ঘোষের গোঁফ জোড়া সে স্পষ্ট দেখতে পায়। নবীনের পিঠে তেমনি হাত রেখে স্তব্ধ হয়ে নবও বসে রইল।

সামনে ধানের পালাটা বাতাসের ধাক্কায় ধাক্কায় আর চাপে চাপে আস্তে আস্তে কাত হয়ে পড়লো মাটীতে। সেই পড়ে-যাওয়া ধানের পালা অতিক্রম করে উদ্ধব ঘোষ-সাপরাজের কুলোর চেয়েও বড় ফণাটা এগিয়ে আসতে লাগলো নবীনের বেদনার্ত চেতনার ওপর দিয়ে এঁকে বেঁকে।

কয়েকদিন পরে ওরা গেল ভীম সর্দারের কাটা ধানের ফয়সালা করতে মাধব মুখুজ্জের বাড়ীতে।

মাধববাবু বড় গাঁতিদার হলেও উদ্ধব ঘোষের প্রাণের বন্ধু। ঘোষ মশাই চাষী বাঁচিয়ে হাতের মুঠোয় রেখে প্রতিনিয়ত তাকে শোষণ

করবার অতি উদার যে বৈষয়িক তত্ত্বটা আবিষ্কার করেছিলেন মাধব মুখুজ্জেও সেটা কার্যে প্রয়োগ করলেন। ওদের তিনি পরম যত্ন করলেন, চিঁড়ে মুড়ি নারকেল ও তামাক খাওয়ালেন এবং বর্গা ভাগের ধানও ভীমকে ফেরত দিলেন। তবে একটুখানি তফাৎবাদ করে বললেন যে, ধানটা তাঁর খামারেই মাড়াই করে ভীম যেন অর্ধেক তাঁর গোলায় তুলে দিয়ে নিজের অর্ধেক অংশ নিয়ে যায়। জমি সম্পর্কেও তিনি উদ্ধব ঘোষের মতই লিখিত-পড়িত কিছুর ভেতর না গিয়ে মৌখিক বন্দোবস্ত করলেন। তবে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্যে, বার্ষিক খাজনার হারটা একটু বাড়িয়ে বিঘে-প্রতি সাড়ে সাতটাকা করে দিলেন। বুঝিয়ে বললেন যে, এতে-করে ভীমের দেনা শোধের খুবই সুবিধে হবে, তাঁর যা লাভ, তা হলো টাকাটা একটু তাড়াতাড়ি ফেরত পাওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

ফেরার পথে কালাবাড়ীতে প্রণাম করতে গিয়ে ওরা দেখলো, বড় বটগাছটার বেদীর ওপর একজন লোক উপুড় হয়ে শুয়ে দুই হাত কপালের তলায় দিয়ে উচ্চৈস্বরে শুধু 'মা,' 'মা,' 'মাগো' বলে কাঁদছে। কাছে গিয়ে দেখলো ভগীরথ মা-কালীর কাছে করুণ প্রার্থনা জানাচ্ছে।

নবীন আর নব তাকে ধরাধরি করে বসিয়ে দিলে। তার চোখ দু'টো জবাফুলের মত হয়ে গেছে কাঁদতে কাঁদতে, মুখ ভিজে গেছে চোখের জলে, মুখের দুপাশে চড় মারবার পাঁচ আঙুলের দাগ কালো কালো হয়ে ফুটে উঠেছে। পিঠেও চাওড়া চাওড়া কালো কালো দাগ পড়েছে। বুকের পাশে বাহুর পেশীতে সরু সরু দাগ ফুলে উঠেছে রক্তমুখী হয়ে।

নবীন জিজ্ঞাসা করলে—কি হয়েছে, ও মাজদা?

ভগীরথ হায় হায় করে কেঁদে উঠলো। অনেক কষ্টে ওরা শান্ত করলো ওকে। তারপর ধরাধরি করে বাড়ীর দিকে নিয়ে চললো।

দীঘির পাড়ে এসে ওরা ভগীরথকে বসিয়ে দিলে, সিঁড়ির 'পরে।

শুয়ে পড়লো সে। অনেকক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে নিজেই গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে আঁজলা আঁজলা জল খেয়ে ফেললো এবং আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে রানার ওপর স্থির হয়ে বসে রইলো।

ভীম সর্দারের দেওয়া হুঁকো টানতে টানতে ভগীরথ বললে যে, গতকাল শ্মশানকালীর পূজা দেওয়ার পর তাঁর কৃপা হয়েছে মনে ভেবে ধানের মীমাংসা করবার জন্যে আজ সকালেই সে কাছারীতে যায়। প্রথমে ওকে কেউ ঢুকতেই দেয়নি কাছারীতে। দুপুরের পর বরকন্দাজদের হাতেপায়ে ধরে ও কাছারীর সীমানায় ঢুকতে পায় এবং চার আনা দক্ষিণে দিয়ে কাছারীর ঘরে ঢুকবার সুযোগ পায়। নায়েব মশাই কোন কথাই বলেননি তার সঙ্গে। বড় মুহুরীর সঙ্গে কথাবার্তা হয়। তারা বর্গাধান দিতে, কিংবা জমির বন্দোবস্ত করতে রাজী নয় কোনমতে। বলে, ধান যা হবে তা দিয়ে দেনার কানাকড়িও মিটবে না। আর নিলামী জমি খাসদখল করেছে তারা, ভগীরথের যদি ইচ্ছে হয় ন্যায্য সেলামী দিয়ে আবার বন্দোবস্ত নিতে পারে। কোন উপায় না দেখে ও পায়ে ধরে পড়েছিল হেড মুহুরীর। নিচু জাতের ছোঁয়া লেগে তাঁর পা যে অপবিত্র হয়েছে তার খেসারৎ বাবদ সর্বাঙ্গে বরকন্দাজ দিয়ে চড় কিল থেকে শুরু করে লাথি ও জুতো পর্যন্ত মেরেছে। যন্ত্রণায় বুকের ছাতি ফেটে যাবার মত হ'লে জল চেয়েছিল ভগীরথ, কিন্তু এক ফোঁটা জলও তারা না দিয়ে মুখে প্রস্রাব করে দিতে চেয়েছিল।

নিজের সর্বাঙ্গের দাগ দেখিয়ে দেখিয়ে ভগীরথ চিৎকার করে করে কাঁদতে লাগলো। কান্নার ভেতর সে বলতে লাগলো—আর কিছুই থাকলো না আমার, কাছারীর গভ্যে সব গেছে। মা কালী আমার সব নেলে, মা কালী আমার সব নেলে। সবই যখন নিলে মাগো তখন আমারেও ন্যাও, ন্যাও মা......মা......

বলতে বলতে ভগীরথ এক অস্বাভাবিক উত্তেজনায় সিঁড়ি পার হয়ে দীঘির জলের দিকে ছুটে গেল। নব লাফ দিয়ে দু'সিঁড়ি নিচে পড়ে ভগীরথকে জাপটে ধরলো। তারপর ধরাধরি করে তাকে দীঘির পাড় থেকে বার করে বাড়ীর দিকে নিয়ে গেল।

ভগীরথকে ওরা বাড়ীতে পাঠালো না। খবর পেয়ে মেজগিন্নী এলো। সর্বাঙ্গে ছেঁড়া কাপড় জড়িয়ে সে তার স্বামীকে ভাল করে তেল মাখালো, গরম জল করে স্নান করালে, মাদারীর দেওয়া ভাত সবাইকে পরিবেশন করলে এবং আগুনের মালসায় পোঁটলা গরম করে ভগীরথের আহত অঙ্গে সেঁক দিলে। এত যে কাজ করলো, ঘুরলো, সেবা করলো, তার ভেতর মাদারীর সঙ্গে ফিস্-ফিস্ করে ছাড়া মেজগিন্নী কথাটী পর্যন্ত বললে না কারো সঙ্গে। নব দু'একবার ঠাট্টা করবার চেষ্টা করলে, সে এমনভাবে সোজা দাঁড়িয়ে স্তব্ধ হয়ে রইলো যে, আর একটিবার নব সাহস পেলে না ও কিছু বলবার।

সন্ধ্যার পর উঠোনে আগুন করে তামাক খেতে খেতে আগুন পোয়াতে লাগলো নব, নবীন আর ভগীরথ। খোলা রান্নার যায়গাটায় উনুনের দু'পাশে আগুন পোয়াতে বসলো মাদারী আর মেজগিন্নী। মাদারীর মাই খাচ্ছে ছোট মেয়েটী, তার বড়টা মেজগিন্নীর গা ঘেঁসে বসেছে। টোনা আর মোনা ঘুমোতে গেল ঘরের ভেতরে।

ভগীরথ বলতে লাগলো তার জীবনের কাহিনী। ঠাকুরদার দেনা শোধ করবার জন্যে তার বাবা তাকে বারো বছর বয়সে একটাকা মাস মাইনে আর বছরে তিনখানা কাচা আর দুখানা গামছা পাবার সর্তে রেখে দিয়েছিলো প্রতাপনগরের বাবুদের বাড়ীতে। সেই মাইনে বাড়তে বাড়তে হয়েছিলো মাসে তিনটাকা করে। বাবুর বাড়ীর কাজ বড় কঠিন। ছেলেবয়সে কাজ করতে পারতোনা ঠিক মত। মারধোর খাওয়াটা তার পাওনায় দাঁড়িয়ে গেল। বাবুদের মেয়েরাও

মা তো ওকে। ছোটগিন্নি ছিলেন বড় বদরাগী। সময় মত কাঠ এগিয়ে না দেওয়ায় খুন্তি পুড়িয়ে ঠেসে ধরেছিলেন ওর মুখে। সে দাগ জীবনে মিলোবে না কোন দিন। বড় হলেও কিন্তু মুক্তি পেল না সে। বাবুদের বাড়ীর দেনা শোধ হয় নি। তার যৌবন এল, কেউ সে জীবন-বসন্তের খোঁজ রাখলো না। বাবা একদিন গিয়ে ডেকে নিয়ে এলো। নরেন্দ্রপুরের একটা ছোট মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়েই আবার পাঠিয়ে দিলে বাবুর বাড়ী। সে-বউকে জীবনে আর বার-পাঁচেক দেখেছিল ও। সারা যৌবনকাল বউটি কেঁদে কেঁদে কাটিয়ে শেষে পিলে-জ্বরে ভুগে ভুগে মরে গেল। তাকে আজও ভগীরথের মনে পড়ে, তার ছিপ্-ছিপে গড়ন আর ছাগলের মত দু'টো চোখ আজও ওর বুকে আঁকা আছে ছবির মত। বউ–এর মরণের মতো, তার বাপের মরণটাও সে স্ব-চক্ষে দেখতে পেলে না, এমন পাপই আর-জন্মে সে করে এসেছিলো। যৌবনও যে কবে এলো আর কবে গেলো সে-কথা সে নিজেও জানতে পারে নি কোন দিন। না হলো তার ঘরের সম্পর্ক, আর না হলো তার পরের সম্পর্ক। এই নিদারুণ কষ্টের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে সে মা–কালীকে ডাকতো সারা জীবন। শেষে মা-কালী যখন মুখ তুলে চাইলেন আর দেনা শোধ হয়ে গেল, তখন যৌবনের ফুল শুকিয়ে ঝরে গেছে, জীবন থেকে সব কামনা আর সব আনন্দ ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আবার যে বিয়ে করলো ওই মেঝ-গিন্নিকে, তাতে লাভ হলো একটা মেয়ের সর্বনাশটাই। আজ আর কিছু ভাল লাগে না ওর, এই ঘর-বাড়ী এই যুবতী বউ, এই জীবনের ধান্দা, কিছুই ভাল লাগে না। মা কালীই তো সবের কারণ, তাই–তো......

ভগীরথ তার জীবনের করুণতম কাহিনী বলতে বলতে অভিভূত হয়ে পড়ে। শেষদিকে তার গলা ধরে আসে, চোখ ঝাপসা হয়ে আসে, বুক দুমড়ে আসে কান্নার আবেগে।

এ-কাহিনী ওরা সবাই জানে অল্প-বিস্তর। কিন্তু লাঞ্ছনার উজ্জ্বল পটভূমিকায় জ্যোৎস্নায় ভরা রাত্রির ভেতর আগুনের পাশে বসে আজ যেমন করে এ-কাহিনী আবার ওরা শুনলো তাতে সবই ওদের নতুন মনে হলো। অতিশয় গভীর এক বেদনার স্পর্শে ওদের মন আতুর হয়ে উঠলো। মনে হলো যেন অনেক মাতৃহারা শিশু কেঁদে-কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে ওদের বুকের ভেতর। নীরবে ওরা চেয়ে রইলো ভগীরথের মুখের দিকে। অস্পষ্ট আগুনের আভায় সে-মুখ আর এক মাতৃ-হারা শিশুর অসহায় দুঃখে একান্ত করুণ হয়ে আছে।

ভগীরথ একসময় উঠে গিয়ে বারান্দার বেড়ার গায়ে ঝোলানো একতারাটা নিয়ে এলো। সেটার কান ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সুর বাঁধলো টুং-টুং করে করে। তার পর গান গাইতে আরম্ভ করলো রামপ্রসাদী সুরে।

……মা, মাগো! সংসারের বিড়ম্বনা আর সহ্য হয় না, মুক্তি দাও মা। কু-সন্তান যদিও হয়, কু-মাতা কখনও হয় না মা। কত সামান্য লোকেও তোমাকে মা বলে ডেকে পার পেয়ে গেছে, আর এত দিন ধরে ডাকছি তোমায়, এক বিন্দু দয়া কি হবে না তোমার মা! করুণা কর পাষাণী মা, সন্তানকে বুকে তুলে নাও……

ভাঙ্গা-ভাঙ্গা অশুদ্ধ উচ্চারণে মিশ্র সুরে করুণ মিনতি জানাচ্ছে ভগীরথ। সুর একবার উঠছে, একবার পড়ছে, এক একবার চড়া পর্দায় উঠেই থেমে যাচ্ছে, আবার নেমে নেমে শেষ পর্দায় গিয়ে থেমে যাচ্ছে। একতারা বাজছে টুং-টাং টুং-টাং শব্দে, ধীর লয়ে মৃদু গমক তুলে তুলে। গানের সুর মিলিয়ে যাচ্ছে চাঁদের দিকে, নেমে নেমে ছড়িয়ে পড়ছে সারা উঠোনে, সারা ঘরে বাইরে, মিলিয়ে যাচ্ছে বাতাসে বাতাসে গাঁয়ের পথে মাঠের দিকে, সারা পৃথিবীতে।

চাঁদের আলো পড়েছে ওদের পিঠে আর মাথায়। নিভু নিভু

আগুনের মৃদু আভায় অস্পষ্টভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে নবীন আর নবর মুখ। ঊর্ধ্বমুখী ভগীরথের গলায় বুকে আর চিবুকে আভা লেগেছে সেই আগুনের। আরও ঊর্ধ্বে প্রসারিত ডান হাতে ধরা একতারাটার ওপর জোছনা পড়েছে। তার মুখ দিয়ে করুণ সুরে ঝরে পড়ছে—

পাষাণী মা, সন্তানকে বুকে তুলে নাও, মুক্তি দাও......

খোলা রান্নার জায়গায় দু'টি নারী নীরবে মুখোমুখী বসে। উনোনের ওপর হাঁটুতে সামনা-সামনি করে একজনের হাতের পরে আর একজনের হাত আড়াআড়ি প্রসারিত। জোছনায় তাদের সাদা কাপড়ে ঢাকা অচঞ্চল দেহের এক পাশ আলোকিত। কোলের শিশুরা ঘুমিয়ে পড়েছে। আর একটি শিশু পাশে শুয়ে আছে নিশ্চল হয়ে। তারও গায়ে পড়েছে চাঁদের আলো।

ভগীরথের সুর করুণ হতে হতে নেমে আসছে ধীর লয়ে। মাগো, আর কতকাল, মুক্তি দাও......

তার দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। আগুনের আভা আর জোছনার মিলিত আলোয় রূপোর খাদ দেওয়া সোনার রঙের মতো তার গণ্ডস্থলে চক-চক করছে অশ্রুধারা।

পাঁচ

সামান্য দুমুঠো ধান মাড়াই করে ঝেড়ে-ঝুড়ে ঘরে তুলতে কটা দিনই বা লাগে আর। তারপর আর চাষীদের হাতে কাজ থাকলো না। চাষীর দেহ বিনা কাজে চঞ্চল হয়ে ওঠে, নিস্‌পিস্ করে। তাছাড়া ধানক'টা ফুরোলেই বা চলবে কি খেয়ে, পয়সাই বা কোথায়।

নবীনকে সর্দার করে ওরা একটা মেটে দেওয়াল গাঁথবার গাঁতার

দল বাঁধলো। নবীন দেওয়াল গাঁথতে ওস্তাদ। কেষ্ট ঢালীও মন্দ নয়। দু'জনকে ডাইনে বাঁয়ে লাগিয়ে ওরা কাজ চালিয়ে দিতে পারবে।

কিন্তু ঘর কোথায়? চাষী পাড়ায় তো এবার ঘর নেই। প্রতাপনগর ঢাকুরে, নরেন্দ্রপুর, এইসব ভদ্র গ্রামে খোঁজ নিয়ে ওরা পাঁচখানা ঘরের সন্ধান পেলো। প্রতাপনগরে তিনখানা আর ঢাকুরেয় দু'খানা। যে সব বাবু বড়লোক নন, চাষীদের ধান-পান কেটে-কুটে এবার তাঁদের হাতে দু'পয়সা হয়েছে। তাঁরাই টিন দিয়ে ছাওয়া মাটীর ঘরে বাস করতে চান এবার। প্রতাপনগরে জয়রাম মিত্তির, ননীগোপাল দত্ত আর নগেন চক্কোত্তি বড় বড় আটচালা ঘর বাঁধবেন ঠিক করেছেন। তাঁদের কাছে গিয়ে নবীন আর কেষ্ট ধরে পড়লো।

বন্দোবস্ত হলো ঘরের দৈর্ঘ্য প্রস্থের দেওয়াল মোট যত হাত লম্বা হবে তার এক হাতের এক এক বন্দের জন্যে তলা থেকে মাথা পর্যন্ত পাবে দশ আনা করে। সেই সঙ্গে একখানা করে বারান্দা গেঁথে দিতে হবে ফাউ হিসেবে। মাটী তুলে দিতে হবে ঘরে আর বারান্দায়, পিটিয়ে বাসযোগ্যও করে দিতে হবে।

অন্য উপায় না দেখে ওরা তাতেই রাজী হয়ে গেল। তবে ধরা-পাকড়া করায় বিনা পয়সায় দুবেলার খাওয়াটা বাবুরা দিতে চাইলেন ওদের।

দেওয়াল গাঁথতে গিয়ে প্রথম দিন বারান্দায় উঠে খাবার জল চাইলে চক্কোত্তি গিন্নি 'দুর-দুর' করে নবীনকে যখন নিচে তাড়িয়ে দিলেন এবং ঘরের পেছন থেকে বহু যুগের বাতিল একটা কানাভাঙ্গা মাটির ভাঁড় ধুয়ে এনে উঠোনে দাঁড়াতে বললেন তখন সবাই ওরা বিস্ময় ও অপমান বোধ করলো। সেই ধোয়া ভাঁড়ে যখন চক্কোত্তির বারো-তেরো বছরের কুমারী মেয়ে গামছা পরে হাত-পা ধোয়ার জল-রাখা বাইরের কলসী থেকে বড় একটা ময়লা পিতলের ঘটি ভরে-ভরে জল ঢেলে দিলে তখন সেই দুর্বোধ্য কাজের যেমন অর্থ বুঝতে পারলো না, তেমনি সেই

হাত-পা ধোয়ার জল খেতে হবে ভেবে শিউরে উঠলো ঘৃণায়। তার পর যখন সেই জল ফেলে দিয়ে নবীন নিজে গিয়ে ঘোষবাবুদের পুকুর থেকে ভাল জল নিয়ে এলো খাবার জন্তে, তখন ক্রুদ্ধ চক্কোত্তি-গিন্নির 'ছোটলোক', 'অনজাতের তেজ দ্যাখো না', 'কুকুর শিয়ালের অধম যারা তাদের অ্যাতো ক্যানো' প্রভৃতি সুমধুর আপ্যায়নে তাদের মনে হলো মা ধরণী দ্বিধা হচ্ছেন বুঝি।

প্রায় দুপুরবেলা হলো সকালের খাবার ব্যবস্থা। ওদের বলা হলো কলাপাতা কেটে আনতে। উঠোনে সার বেঁধে পাতা ধুয়ে বসে রইলো ওরা। অনেকক্ষণ পরে চক্কোত্তির সেই মেয়েটা তেমনি গামছা পরে ফ্যানাভাত নিয়ে এলো একখানা আ-মাজা গামলায় করে। গামলাটা নামিয়ে লোহার হাতায় করে কেটে কেটে ওদের পাতে পরিবেশন করলো সেই ভাত। পাতে দিতেই একপাশ থেকে আর একপাশে সেটা গড়িয়ে পড়লো। ঠেকাতে গিয়ে তাদের পাতা ছিঁড়ে গেল এবং প্রায় সব ভাতই পড়লো গিয়ে মাটিতে।

নবীন হাত দিয়ে দেখলো, সেটা ফ্যানাভাত নয়, ফ্যানের ভেতর দু'চারটে ভাত মেশান এক প্রকার তরল বস্তু। ঠাণ্ডা জল হয়ে গেছে সেটা। তার উপকরণ হিসেবে পাতায় পাতায় খানিকটা করে নুন আর পুরোনো তেঁতুল দেওয়া হলো।

আরও কিছু উপকরণ পাওয়ার আশায় নবীন আর ভীমকে রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে ভগীরথ বললে—আর নড়ে বঙ্গারাম, হাত লাগাও এখনও, ন'লি যা আছে মা ধরণী তাও গিরাস করবেন।

ভগীরথ একান্ত শ্রম-সহকারে লবণ ও তিন্তিড়ি সহযোগে আহারে মন দিলে দেখে হরিবোল আর কেষ্ট তার পন্থা অনুসরণ করলে। কিন্তু নবীন আর ভীম গ্রাস মুখের কাছে তুলেই কেমন একটা বিকট দুর্গন্ধে চুপ করে থাকতে লাগলো, তাদের হাতের ফাঁক দিয়ে ফ্যান গড়িয়ে

প্রথমে পাতার ওপর, তার পর মাটিতে পড়ে পড়ে শুকিয়ে যেতে লাগলো। হাতের মুঠো খুলে দেখলো সেখানে গোটা তিন–চার করে ভাত লেগে আছে মাত্র। ওরা দু'জন হাসবে না কাঁদবে, ভেবে না পেয়ে চুপ করে রইলো।

ওদের ভাব দেখে চক্কেত্তি-গিন্নি রান্নাঘরের বারান্দা থেকে হেঁকে উঠলেন—নবাবদের বুঝি পোলাও না হলে মুখে রোচে না। সারা সকাল খেটে-পিটে অমন সুন্দর করে রাঁধলাম, তা যখন মুখেই তোলা গেল না, তখন আর এ-ঝঞ্ঝাটে কাজ কি। সকালের খাবার আর পাবে না তোমরা। যেমন কুকুর, এই হলো তার তেমনি মুগুর। বলেই তিনি দুম্-দুম্ করে পা ফেলে রান্নাঘরের ভেতর ঢুকে গেলেন।

ভীম ঠোঁট উল্টে বললে শুনিয়ে শুনিয়ে—বিয়ান বেলার ভাত, পালাম তো দুপোরবেলায়। ভাবলাম খাব দুডো প্যাট ভরে, যাতে খাটতি পারি সারাক্ষোণ। তা, এ-তো ভাত না, গরুতি খাবার ফ্যান-জল। তাও যদি এট্টু গুড়্-টুড়্ হয় তো......

অকস্মাৎ চক্কোত্তি-গিন্নি চিৎকার করে রান্নাঘর থেকে বাইরে লাফিয়ে পড়লেন এবং এমন একটি বস্তু ওদের গুড়ের বদলে দেবেন বললেন যে, শুনেই ঘৃণায় ওদের পৈতৃক নাড়ী-ভুঁড়ি বেরিয়ে আসতে গেল গুঁতো-গুঁতি করে। ভীম হঠাৎ নাক মুখ চেপে ধরেই খানিকটা দূরে ছুটে গেল এবং ওয়াক্ ওয়াক্ করে অপকর্মটা উঠোনের ওপরই সেরে ফেললো। চক্কোত্তি মশাই কি একটা লেখাপড়া করছিলেন। ছুটে এসে ওদের সান্ত্বনা দিলেন। ভীমকে ডেকে এনে আবার তাকে সেই দ্রব্য খেতে অনুরোধ করলেন এবং ফ্যান যে মা-লক্ষীর দুধ, ও ভাতের চেয়ে ফ্যানের ভেতর যে অনেক বেশী সার বস্তু আছে নানা শাস্ত্র বাক্য দিয়ে তা বুঝিয়ে দিলেন।

খাবার পর তামাক চাই, চক্কোত্তি মশাই উঠোনের পাশে একটা মাচা দেখিয়ে দিলেন। তার ওপর চক্কোত্তি মশাইয়ের জমির তামাকের

ভাঙ্গা ডগা শুকোচ্ছে অনেকগুলো। সেইগুলোই জন-মজুরদের জন্যে মজুদ করে রাখা হয়েছে অনেক আগে থেকে।

ডগাগুলো কাটা হয়ে গেলে হরিবোল গুড় চাইলে। চক্কোত্তি আঙ্গুল দিয়ে বারান্দার কোনটা দেখিয়ে দিলেন, সেখানে একটা ভাঁড় ঝুলছে। বললেন, ওতেই গুড় রয়েছে অনেকখানি।

ভাঁড় থেকে গুড় ঢালতে গেলে প্রথমে গুড়মাখা দলা-দলা পিঁপড়ে পড়লো, তারপর পড়লো আরশুলা, শেষে পড়লো আরশুলা আর ইঁদুরের নাদি।

হরিবোল বললে—এতে গুড় নেই, শুধোই পিঁপড়ে আরশুলা আর ইঁদুরির নাদি। অন্য গুড় দ্যান কত্তা।

চক্কোত্তি মশাই বললেন—ওটা ন্যাকড়ায় ছেঁকে নিলেই চলবে। পিঁপড়ের রসে কতটা সাঁতার দেবার শক্তি আছে, আরশুলার রসে কত অদ্ভুতভাবে সর্দিকাশি নিরাময় হয় এবং ইঁদুরের নাদিতে কি পরিমাণ এসেন্স তৈরী হতে পারে সে কথাও তিনি বুঝিয়ে বলতে ছাড়লেন না।

গুড় মিশ্রিত এবম্বিধ সর্বগুণযুক্ত সুগন্ধি সর্বজীবরস সহযোগে-মাথা তামাক যখন ওরা খেতে গেল তখন একটা টান দিয়েই কল্পনাতীত এক অপূর্ব আস্বাদে ওদের মুখগুলো বেঁকে গেল পাঁচের মত হয়ে।

নাম তার ললিতা, জাত-বৈষ্ণবী। লোকে বলে চক্রবর্তী মশাইয়ের জলপাত্র। থাকতো সে গ্রামের প্রান্তে। লোকালয়ের পর বাগিচা, তারপর জঙ্গল, তারপর এক বড় বটগাছ। তারই তলায় ছিল তার কুঁড়ে আর তুলসীবেদীর থান। চক্কোত্তির সঙ্গে ভাব তার ভরা যৌবনে, স্বামী কেষ্টদাস বৈষ্ণব বেঁচে থাকবার সময়। চক্কোত্তি মশাই তখন

ললিতার ভাবে এতই বিভোর হয়ে পড়েছিলেন যে, কেষ্টদাসের মরার পর থেকে বছরে দুচারবার তাকে আপন ঘরে ঠাঁই দিবার প্রবল চেষ্টা করে আসছিলেন। কিন্তু চক্কোত্তিগিন্নিও জাঁদরেল মেয়ে, মুড়ো ঝাঁটা, পোড়ানো খুন্তি এবং বঁটি দিয়ে তাকে এমন অভ্যর্থনা জানালেন যে, ললিতা আর চক্কোত্তি বাড়ীর ত্রিসীমানায়ও ঘেঁষতে সাহস পেল না।

ইদানীং চক্কোত্তি প্রৌঢ় হয়েছেন। নানাবিধ জ্বালা যন্ত্রণায় ললিতারও দাঁত পড়ে চুলে পাক ধরেছে। জটিল স্ত্রীরোগে ভুগে ভুগে মাংস ক্ষয়ে গিয়ে দেহটা তার এমন চামড়া-ঢাকা কঙ্কালে পরিণত হয়েছে যে, অন্ধকার রাত্রের আলোছায়ায় বটতলায় তাকে দেখলে ভয় না পেয়ে উপায় থাকেনা। আর ছেলেমেয়ে নিয়ে যৌবনের সেই গরীব চক্কোত্তির এখন জমজমাট সংসার, নামকামও একটু আধটু হয়েছে। এমন অবস্থায় সরাসরি ললিতার সঙ্গে সম্পর্ক রাখাটা যে নিতান্তই মানহানিকর, অতি সম্প্রতি সেটা তাঁর মনে হতে আরম্ভ করেছে। পারত পক্ষে তিনি বৈষ্ণবীকে এড়িয়ে চলেন। কিন্তু ললিতা এখন 'তুমি যদি ছাড়ো প্রভু, আমি না ছাড়িব'র মত এমন পেত্নীলাগা লেগেছে যে যাতায়াতের পথে তাকে মাঝে মাঝে দেখা না দিয়ে, জীবন ধারণের কিছু কিছু উপকরণ খয়রাতি না করে, চক্কোত্তি মশাই হাজার চেষ্টাতেও পেরে ওঠেন না।

চক্কোত্তি মশাইয়ের সংসারে ছেলে-মেয়ে ছাড়া ফাই-ফরমাস খাটবার কেউ না থাকায় ললিতার সঙ্গে যোগাযোগেরও নিজে ছাড়া আর কোন সূত্র ছিল না। সেই জন্যে প্রায়ই তিনি অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেন এবং পর-জন্মে যাতে জমিদার কি মহাজন, নিদেন পক্ষে একটা নায়েবও যাতে হতে পারেন তার জন্যে কালীতলায় মাথা কুটতেন। দেওয়াল গাঁথতে লোক লাগিয়ে ইদানীং সুবিধে হয়েছে তাঁর। নবীনদের দিয়ে গোপনে তিনি এটা-সেটা পাঠাতে শুরু করেছেন। ভদ্রপাড়ার

কাইফরমাসের ব্যাপারে নবীনরা ভগীরথের যোগ্যতা সম্পূর্ণ স্বীকার করে নিয়েছিল, তাই, চক্কোত্তি মাঝে মাঝে যে সব জিনিষপত্র দিতেন ভগীরথই সেগুলো বয়ে ললিতার কাছে নিয়ে যেতো। ভগীরথ ভদ্রভাবে মিষ্টি কথা বলতে পারতো, আর সব-কথা গোপন রাখতে পারতো বলে ললিতারও বেশ ভাল লাগতো ভগীরথকে। ফাঁক পেলেই সে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে ভগীরথকে দিয়ে কাঠ চেলা করিয়ে, ঝাড় থেকে বাঁশ কাটিয়ে, চালে খড় গুঁজিয়ে নিতো। ভগীরথেরও এই অসহায় বৈষ্ণবীর জন্যে এসব কাজ করে দিতে ভালই লাগতো।

বাড়ী ফেরার পথে এক একদিন নবীনরা সবাই মিলে ললিতার বাড়ীতে হাজির হতো। ললিতা ওদের পান সেজে দিত। দেশলাই বের করে দিত, তাই দিয়ে ওরা নারকেলের ছোবড়ার আঁশ পাকিয়ে নুড়ি বানিয়ে আগুন করে তামাক খেতো। তারপর বসতো ওরা বারান্দায়। ঘরের পৈঠের ওপর কেরোসিনের ল্যাম্পো রেখে ললিতা বসতো বেড়া হেলান দিয়ে।

ললিতা গান করতো কেষ্টদাসের ফেলে-যাওয়া পুরোনো একতারাটা বাজিয়ে। যৌবনকালে-শেখা গানেরা ভীড় জমাতো তার কণ্ঠে। কিন্তু সেদিনের সেই কণ্ঠ, সে মধুর সুর, সে বিভঙ্গ কোথায় যেন আজ হারিয়ে ফেলেছে বৈষ্ণবী। গানের বুকে আর প্রাণসঞ্চার করতে পারতোনা হাজার চেষ্টায়ও। সুর যোজনা করে ভেতরের গানকে আজ আর জাগিয়ে দেওয়ারও কেউ নাই। কেষ্টদাসের কথা আজ যেমন করে মনে পড়ে বৈষ্ণবীর তেমন করে যেন আর কোন দিন পড়েনি। সে বেশ বুঝতে পারে, যাওয়ার বেলা কেষ্টদাস তার যৌবন আর গান দুইই সঙ্গে নিয়ে গেছে। বেদনায় দু'টী চোখ তার জলে ভরে আসতো।

নবীনদের কাছে ভালো লাগতো সেই ভাঙ্গা গলায় বেসুরা গান।

ভগীরথের মনে হতো, বৈষ্ণবীর করুণ সুর ওর নিজের লাঞ্ছিত হৃদয়ের কোথায় যেন নাড়া দিচ্ছে আলতো করে।

ব্যর্থ সাধিকার মত উদাস কণ্ঠে মুখ উঁচু করে বৈষ্ণবী গাইতো একতারার ওপর অবিশ্রান্ত আঘাত করে করে বাজনা তুলতো তার শীর্ণ আঙ্গুলগুলো, অবিরল ধারে জল গড়িয়ে পড়তো তার চোখ দিয়ে।

ওরা নির্বাকে চেয়ে থাকতো বৈষ্ণবীর মুখের ওপর দৃষ্টি ফেলে যেখানে ল্যাম্পোর আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তার চিবুকের হাড়।

দু'চার দিনের মধ্যেই সারা গ্রাম ভরে গেল ললিতা এবং ভগীরথ ও নবীনদের মধ্যে কুৎসিত সম্পর্কের গুজবে। হাটে-ঘাটে গ্রাম গ্রামান্তে ছড়িয়ে পড়লো অনেক আজগুবি কাহিনী। কেউ-কেউ এমন কথাও বললে যে, ছোট লোকদের চরিয়ে ললিতা এবার হারের সঙ্গেই পরবে তুলসীমালা। কেউ-কেউ আবার এতদূরও বললেন যে, তাঁরা স্বচক্ষেই ললিতা আর ভগীরথকে এমন অবস্থায় দেখেছেন যে, সেকথা......

কাণ্ডটা চক্কোত্তি মশাইয়ের।

ললিতার সঙ্গে সম্পর্কের যে সূক্ষ্ম আঁশগুলো এখনো ছেঁড়া যায়নি, সেগুলোর ওপর শেষবারের মতো সামাজিক নীতিবোধের ধারালো ছুরি চালাবার ফাঁক খুঁজছিলেন তিনি অনেকদিন ধরেই। ভদ্র-ভাষায় আখ্যায়িত এই ছোটলোকদের উপলক্ষ করে এবার তিনি সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করবার এবং তাঁর জীবন নাটিকার ললিতা-অঙ্কের ওপর শেষ যবনিকা পাত করবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেছিলেন বেশ বিচার বিবেচনা করেই।

অতঃপর যা হবার তাই হলো। ভদ্রলোকের গ্রামে ছোটলোকদের এমন কল্পনাতীত কাণ্ড দমন করবার জন্য ভদ্রবেশী মানবগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেলেন মহানন্দে। সবাই মিলে স্থির করলেন যে, যে গ্রামের জমিদার হলেন মহাপরাক্রান্ত [redacted], যে-গ্রামের সদর কাছারীতে

নিবারণ মুখুজ্জের মত বাঘা নায়েব এখনও বেঁচে আছেন, যে-গ্রামের ক্ষমতাশালী তালুকদার-মহাজন উদ্ধব ঘোষ বুদ্ধি হারাননি এবং সর্বোপরি যে-গ্রামের ওপর দিয়ে চন্দ্র-সূর্য এখনো উঠছে ও অস্ত যাচ্ছে, সে-গ্রামে ছোটলোকদের প্রশ্রয় দেওয়া হবে না কোনমতে, কারণ কুকুরদের লাই দিলে মাথায় তারা উঠবেই উঠবে।

গ্রাম্য ঝামেলার বিচার কাছারীতে হয় না, প্রধানত নায়েব মশাইয়ের বুদ্ধিদাতা প্রাণের বন্ধু উদ্ধব ঘোষের বাড়ীতেই হয়ে থাকে।

অনেক বেলায় খেয়ে দেয়ে নবীনরা একটু বিশ্রাম করছিল। সেই সময় জনাচারেক বলবান যুবক এসে ওদের ডেকে নিয়ে গেল।

কথাটা নবীনরা আগেই শুনেছিল। তবে বিচার-পর্বটা যে এতো নিকটে জানতো না শুধু সেই কথাটাই।

বলির পাঁঠা যেমন হাড়িকাঠের দিকে এগোয় ওরা ঘরের ভেতর ঢুকলো তেমনি করে। অকস্মাৎ ওদের জলতেষ্টা পেলো এবং বাবা আর মায়ের কথা মনে পড়লো।

ভদ্রলোকরা দুচারজন করে আসতে লাগলেন আর নিরীক্ষণ করে করে দেখতে লাগলেন ওদের, যেন কালীপুজোর বলির পাঁঠায় কোন খুঁত আছে কিনা সেইটে পরীক্ষা করে দেখতে চান তাঁরা। ক্রমে ক্রমে ঘর ভরে গেল লোকে। খুনে আসামীর বিচার দেখতে আদালতে যেমন ভীড় হয়, ভীড় জমলো তেমনি।

একটা ডেঁপো যুবক সুর করে বলে উঠলো—কেষ্টচাঁদ বিশ্বেস, ফ্যালো শেষ নিঃশেষ।

তার পাদ পূরণ করলে আর একটা যুবক—ভগীরথ মোড়ল, ভেঙ্গে যাবে ফোঁপল।

হারান বাঁড়ুজ্জে ছেলেদের তাড়া দিয়ে বলেন—অ্যাই ওপ, চুপ সব। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ-পাণ্ডব এয়েচেন, তাঁদের সঙ্গে বাঁদরামো কন্নো না।

ইতিহাস-পড়া তরুণ যুবক নন্দলাল বললে—না বাঁড়ুজ্জে জ্যাঠা, দস্যুগণ ধৃত হইয়া রাজদরবারে নীত হইয়াছে।

ঘরের ভেতর 'হা-হা' 'হো-হো'র সম্মিলনে যে ভয়ঙ্কর হুল্লোড় উঠলো খুশীর দেবতা স্বয়ং প্রজাপতিও বোধহয় তার কল্পনা করতে পারেননি।

উদ্ধব ঘোষ হাঁকলেন—নগেন!

নগেন ওরফে চক্কোত্তি মশাই সরেজমিনে হাজির ছিলেন। খাটের ওপর বসে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন—ওই-যে উদ্ধবদা, ওই। বাবু ভগীরথ মণ্ডল শ্রীরাধার কুঞ্জে নিত্য নিত্য নাট্যনৃত্য করে……

বাকীটা বলবার আগেই হৃদয় মিত্তির কীর্তনের সুরে বলে উঠলেন—কালিয়া আমার রসের নাগর……

সঙ্গীত শেষ পদে পৌঁছবার আগেই 'যে-দস্যু ধৃত হইয়া রাজদরবারে নীত হইল' তাকে দেখেই সভাস্থ গুণীজন স্তব্ধ হয়ে গেলেন নিমেষে।

একখানি কঙ্কাল মূর্তির মত ললিতা দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে গেল সভার ভেতর দিয়ে। সবাই নিঃশব্দে পথ করে দিয়ে চেয়ে রইলো তার দিকে।

ললিতা নবীনদের পাশে দাঁড়িয়ে, উদ্ধব ঘোষ আর নগেন চক্কোত্তিসহ অনেক বিশিষ্ট লোক-ভর্তি ফরাস-করা খাটের দিকে মুখ করে বললে—উদ্ধব, তুমি নাকি ডেকে পাঠিয়েচো।

উদ্ধব ঘোষ উদ্ধত কণ্ঠে বললেন—হ্যাঁ পাঠিয়েছি। তোমার বিরুদ্ধে হাজার জনের হাজার অভিযোগ।

—সেই হাজার জনের ভেতর স্বয়ং তুমিও কি একজন?

উদ্ধব ঘোষ খানিকটা চুপ্‌সে গিয়ে বললেন—না, হ্যাঁ, মানে এই নগেন তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে।

—তোমার বন্ধু নগেন চক্কোত্তি? বলে ললিতা আঙ্গুল তুলে এমন শ্লেষে প্রশ্ন করলো যে সভাস্থ সবার মন থেকেই নগেন চক্কোত্তির অভিযোগের উত্তাপটা প্রায় উবে গেল।

কেউ উত্তর দিল না দেখে বৈষ্ণবী তীব্র শ্লেষের সঙ্গে বললে— তোমরা তো জানই এই উদ্ধব, ওই চক্কোত্তি, দুজনেই আমার পুরোনো নাগর। এখন একটু অভিমান হয়েছে, তাই বোধহয়—কি বলো চক্কোত্তি? তা আমার কোন আপত্তি নেই, পুরোনো নাগরকে আবার আমি বুকে করে নিচ্ছি।

এই বলে সেই কঙ্কাল-মূর্তি হাত বাড়িয়ে খাটের দিকে এগিয়ে গেল দু'পা। নগেন চক্কোত্তি এমনভাবে 'না'-'না' করে পাছা ঘসড়ে পেছনে সরে গেল যে সভাজনদের মুখে বাঁকা হাসি ফুটে উঠলো।

বৈষ্ণবী যেন ক্ষেপে গিয়ে বলতে লাগলো—না-করোনা ভাই, যেদিন আমার মাটীর তলায়-পোঁতা টাকা দিয়ে গাঁতি কিনে দিয়েছিলাম তোমায়, যেদিন আমার সোনার কণ্ঠী বিক্রী করে তোমায় যমের দুয়োর থেকে ফিরিয়ে এনেছিলাম, যেদিন কেষ্টদাসকে ফাঁকী দিয়ে আমার নামে বেনামা-করা তার ন-বিঘে ধানী জমি তোমার নামে লিখে দিয়েছিলাম, যেদিন আমার শেষ সম্বল ছ'শো টাকা, হার আর বালা দিয়ে তোমার বিয়ে দিয়ে আনিয়েছিলাম, সেদিন তোমায় যেমন ভালবাসতাম সোনার নাগর, আজও যে তোমায় তেমনি ভালবাসি। এসো, এসো······

বৈষ্ণবীর গভীর অন্তরের অক্ষয় তূণীর থেকে তীব্র আক্ষেপে নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে নগেন চক্কোত্তি কুকুরের মত লেজ গুটিয়ে অন্য লোকদের মধ্যে ঢুকে মাথা হেঁট করে বসে রইলো এবং সেখান থেকে—'ওরে আমার রে, আ—হা—হা—' শব্দ করে করে অন্য লোকদের মনে তার নিজের প্রতিই ঘৃণার উদ্রেক করাতে লাগলো। মূল ফরিয়াদীর দুর্দশা দেখে উদ্ধব ঘোষ অসহায় বোধ করলেন।

তারপর উদ্ধব ঘোষের দিকে মুখ করে বৈষ্ণবী বলতে লাগলো— তুমি আজ উদ্ধব ঘোষ, আজ তুমি ডাকসাইটে একজনা, আজ তোমার প্যাথম দেখে কে! কিন্তু তোমার কি একবার লজ্জা হলোনা আমাকে

এত লোকের সামনে ধরিয়ে আনতে? শুনেছি বুদ্ধিতে তুমি নাকি আজ শ্রীকেষ্ট, সাধ্যিতে তুমি রামচন্দ্র আর অহঙ্কারে নাকি দুর্যোধন হয়েছ। একবার কি তোমার মনে হলো না বিশ বছর আগের সেই যুবতী নলিতে বেষ্টুমিকে, সেদিন যার মুখের কথায় মধু ঝরতো, সোনার অঙ্গ দিয়ে যার ফুলের সৌরভ ছুটতো, তার কথা? সারা অঙ্গ দিয়ে আজো যে তোমার নলিতে বোষ্টুমীর গন্ধ বেরুচ্ছে ঘোষ মশাই! আজ বুঝি এ অঙ্গে আর লাবনী বয়ে যায় না, এ গলায় আর সুধাও ঝরে না? তাই না উদ্ধববাবু! কিন্তু চেয়ে দ্যখো তো, যার জন্যে একদিন তুমি মুক্তিশ্বরী-যমুনায় ডুবতে চেয়েছিলে, তোমার সেই প্রাণের নলিতেকে আজ আর চিনতে পারো কিনা! কই, চোখ ম্যালো।

সেই কঙ্কাল-মূর্তি দুই হাত প্রসারিত করে উদ্ধব ঘোষের সামনে দাঁড়ালো সোজা হয়ে। কোটরগত চোখ দিয়ে তার আগুন ঠিকরে বেরুতে লাগলো, উত্তেজিত শ্বাস-প্রশ্বাসে বসে-যাওয়া নাকের ডগা উঠলো ফুলে ফুলে। সজোরে মাড়ি চেপে ধরাতে দাঁত-পড়া মুখের চোয়ালের হাড় অনেক উঁচু হয়ে উঠলো। আধপাকা রুক্ষ চুল ঝুলে পড়লো কাঁধ বেয়ে মাথার সামনে—পেছনে। আঁচলের কাপড় পড়লো মাটীতে। বুকের হাড়গুলো নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে বেরিয়ে আসতে লাগলো এঁকে-বেঁকে।

জীবনে বোধহয় এমন বিপর্যয়ে আর কখনও পড়েননি উদ্ধব ঘোষ। ক্রুদ্ধ অপমানে সর্বাঙ্গ তাঁর হাজার বিছেতে ছেঁকে ধরলো। বিকেল বেলা কলকাতার কোন পার্কে নিয়ে গিয়ে কারা যেন উলঙ্গ করে তাঁকে চাবুক মেরেছে এই মাত্র।

—নিজেদের বিচার না করে, তোমরা এসেছ আমার বিচার করতে, নিরপরাধ ওই চাষাদের বিচার করতে, ধিক তোমাদের, ধিক! ঘেন্নায় আপনই গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করছে। থুঃ, থুঃ, থুঃ!!

মেঝেয় একরাশ থুথু ফেলে বৈষ্ণবী বেরিয়ে গেল ঝড়ের মতো। সারা ঘরের একটি লোকও মাথা উঁচু করে চাইতে পারলে না তার যাওয়ার দিকে। বজ্রাঘাতের পর যেমন অবস্থা হয়, সারা ঘরে তেমনি এক দুর্বহ অবস্থা থমথম করতে লাগলো।

কিন্তু সকল অপমানের শোধ নিলেন উদ্ধব ঘোষ নবীনদের শাস্তি দিয়ে। তিনি হুকুম দিলেন—ভগীরথের গলায় একটা ক্যানেস্তারা বেঁধে দ্যাও, মুখে চূণকালি লেপে দ্যাও আর মাথায় গাধার টুপি পরিয়ে দ্যাও। একটা কাগজে বড় বড় করে লেখ—'নলিতে বোষ্টুমীর নাগর হবার সাজা', সেটা এঁটে দাও ওর পিঠে। ভগীরথ সারা প্রতাপনগর, ঢাকুরে আর নরেন্দ্রপুরের রাস্তা দিয়ে যাবে, ক্যানেস্তারা বাজাবে আর বলবে—'আমি নলিতে বোষ্টমির সঙ্গে থেকে অপরাধ করেছি, আপনারা ক্ষমা করুন'।

এহেন চমকপ্রদ শাস্তির হুকুম শুনে ঘরের জনতা অকস্মাৎ 'প্রাণ পেয়ে জেগে' উঠলো এবং অকস্মাৎ লাফিয়ে উঠে ক্ষুধার্ত হায়নার পালের মত ভগীরথের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। ভগীরথের ভীত বিহ্বল দেহটা তারা টানতে টানতে চক্ষের নিমেষে বাইরে নিয়ে গেল শবলোভী শ্বাপদ কূলের মত অদ্ভুত কলরব করতে করতে।

হুকুম দিয়ে তিনি তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে চেয়ে রইলেন দেওয়ালের দিকে। চোখ দু'টো তাঁর জবা ফুলের মত লাল হয়ে আছে। মুখখানা রক্তের চাপে ফুলে আছে তখনও। ভগীরথের শাস্তির আছলায় নলিতে বোষ্টমীর নামে কলঙ্ক রটনার ব্যবস্থা করে মনের মধ্যে হঠাৎ তিনি যে শান্তি অনুভব করলেন জীবনে তেমন অনুভূতির স্বাদ আর কোন দিনই বোধ করি পান নি তিনি। এইভাবে চেয়ে থাকতে থাকতে এক সময় চোখ বুঁজে হুকুম দিলেন—এই গণশা, তামাক।

ভগীরথের অপকর্মে সহায়তার অভিযোগে নাকে খত দেওয়ার পর

নবীনরা চারজন যখন বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো তখন বেলা আর বড় বেশী নেই। ক্ষোভে ও দুঃখে ওদের সর্বদেহমন অব্যক্ত যন্ত্রণায় ভেঙ্গে পড়তে চাইলো। ভগীরথের শাস্তি যেন ওদেরই স্কন্ধে দেওয়া হয়েছে। ওদের কেবলই মনে হতে লাগলো, যে-শাস্তিটা তাকে দেওয়া হয়েছে সেটার পরিকল্পনা করতে শয়তানও বোধকরি লজ্জা বোধ করতো। সারা দুনিয়ার জেলখানায় যত দুষ্ট অপরাধী আছে তাদের সবার অপরাধের বোঝা আজ যেন একসঙ্গে শুধু তাদেরই মাথায় সবলে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, এমনিভাবে অতি কষ্টে ভারী দেহ টানতে টানতে তারা বেরিয়ে পড়লো।

মাঠের ধারে গিয়ে দাঁড়াতেই ওরা দেখলো বটতলার বেদীতে ললিতা বৈষ্ণবী স্তব্ধ হয়ে বসে আছে মাঠের দিকে তাকিয়ে। আস্তে আস্তে গিয়ে ওরা বটতলায় দাঁড়ালো। ওদের চোখেমুখে সমব্যথীর বেদনা ফুটে উঠলো।

ভগীরথের শাস্তির কথা শুনে ললিতার দু'চোখ দিয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়লো।

মাঠের ভেতর পা দিতেই ওদের কানে টিন পিটাবার শব্দ ভেসে এলো। দুঃখের ভারে নুয়ে পড়তে পড়তে ওরা বুঝতে পারলো প্রতাপনগরের নগেন চক্কোত্তি আর উদ্ধব ঘোষের জীবনভোর কলঙ্কের জন্য আজ কঠিনতম প্রায়শ্চিত্ত পালন করছে সাতভিটের ভগীরথ মণ্ডল।

টিন বাজাবার শব্দ কোন্ দিক দিয়ে আসছে ঠিক করবার জন্যে সবাই ওরা পিছন ফিরে তাকালো। সবাই ওরা দেখলো শীতকালের পড়ন্ত বেলার ঘনায়মান আঁধারে বটতলার বেদীর ওপর ললিতা বৈষ্ণবী তেমনি বসে আছে পাষাণ মূর্তির মত।

ছয়

জীবনে বোধ হয় আর কোন দিনই ওদের ভাগ্যে আনন্দ মিলবে না, এই আশঙ্কায় জলে-ডোবা মানুষের শেষ তৃণ অবলম্বনের মতো চাষী মেয়েরা এবার যে কোন মূল্যে পৌষপার্বনের উৎসবটা পালন করার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠলো। কেমন করে যে তারা নরম চাল-ওয়ালা মাটচাল ধান যোগাড় করলে আর কেমন করে যে তা'থেকে আতপ চাল তৈরী করলে পুরুষরা তা টেরই পেল না। সেই চাল ভিজিয়ে যেদিন ভোর থেকে সন্ধ্যা অবধি তারা ঢেঁকিতে গুঁড়ো করলো সেই দিনই প্রথম চাষী পুরুষরা টের পেল যে, পৌষপার্বন আসছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের জিহ্বা পিঠের জন্যে সজল হয়ে উঠলো।

মেয়েদের কল্পনায় পৌষসংক্রান্তির উৎসবটা জেগে থাকে ছবির মতো। পুরোহিত আসবেন, পুজো করবেন, পুজোর যায়গার মাথায় ঝুলবে শোলার ফুল, উঠোন ঘর বারান্দা দেওয়াল বেড়া সব ভরে যাবে আল্‌পনার রেখায় রেখায়। সারাদিন চলবে খেজুর রসে জ্বাল দেওয়া পিঠে। গোবর দিয়ে নিকোনো উঠোনে সন্ধ্যার পর কাপড় টাঙ্গিয়ে লণ্ঠন জ্বালিয়ে রামায়ণ গান হবে। তারা কেউ বসবে বারান্দায়, কেউ-বা পৈঠার ধারিতে, বসে বসে কাঁচা সুপুরি দিয়ে পান চিবোবে, না হয় তামাকপোড়া মুখে দিয়ে পিক্ ফেলবে মাঝে মাঝে। নুপুর পায়ে নেচে নেচে চামর দুলিয়ে ঠাকুরমশাই গাইবেন—রাম চলেন সীতা চলেন চলেন লক্ষ্ম-অঁ-অঁ-ণ......। বনবাসের করুণ কাহিনী শুনতে শুনতে কেউ দুঃখ পাবে, চোখ দিয়ে জল ফেলবে, কেউ ছেলেকে মাই দিতে দিতে ঘুমিয়ে পড়বে আপনার অজান্তেই।

কিন্তু চাষীর আনন্দ দেবতা সইবেন কেন!

আফরার ঘাটে যেখানে ভৈরব নদের সঙ্গে চিত্রা ও নবগঙ্গার আর দুটো জলধারা মিশেছে, সেই ত্রিমোহিনীতে এবার পৌষসংক্রান্তির দিনেই গঙ্গাদেবী যে মকর-বাহিনী হয়ে সশরীরে নিশ্চিত হাজির হবেন, চন্দ্রপুরের জমিদার বাড়ীর ছোট তরফের সেজকর্তা তা স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে স্পষ্টই জানতে পেরেছেন। সেই সঙ্গে মকর-বাহিনী গঙ্গার ছবি আঁকা বড় বড় দেওয়ালপত্র এঁটে দেওয়া হয়েছে হাটে হাটে, মাঠে বাটে, পথে ঘাটে, স্কুলে পাঠশালায়, পোষ্টঅফিসে, যেখানে মানুষের দু'চোখ যায় তার সব যায়গায়। চাষীরা পড়তে পারে না, কিন্তু মকর-বাহিনী দেবীর ছবি দেখে সারা দেহমন তাদের ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে ওঠে এবং গদগদ ভাবে সেই ছবির তলায় প্রণাম করে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে, সব্বো-পাপতাপ-হারিণী মা, একবার যখন বাড়ীর কাছে আয়েচো মা, তখন, যায়ে যদি তুমার পূজো না দিই তো মানব জম্মো······

সত্যিই চাষীরা বিল অঞ্চলের গ্রাম থেকে, দূর-দূরান্তরের মাঠ পার হয়ে রাত্রি জেগে ক্লান্ত হয়ে পিঁপড়ের সারির মত দল বেঁধে বেঁধে কাতারে কাতারে গিয়ে আফরার ঘাট ছেয়ে ফেললে পৌষসংক্রান্তির দিনে এবং সওয়া পাঁচ আনা নগদ পয়সা আর অন্যান্য সস্তা ভোগ এতদুদ্দেশ্যে শক্ত-করে-ঘেরা ঘাটের পাড়ে জমিদার বাড়ী থেকে রাতারাতি তৈরি গঙ্গা দেবীর মূর্তির পাদদেশে উপহার দিয়ে কোন মতে কাদাতোলা জলে স্নান করে বাড়ী ফিরলে। এইভাবে মা গঙ্গা সমুদ্র যাত্রার পথে চন্দ্রপুরের জমিদার বাবুদের হাজার দশ বারো টাকা আয় বাড়িয়ে দিলেন। চাষীদের ওপর কৃপাটা এতই বেশী করে বসলেন যে, তার পরদিন শেষ রাত্রেই বিল অঞ্চলের সাত-আটখানা গ্রামে একসঙ্গে মা ওলাই চণ্ডীর আবির্ভাব ঘটলো।

রাজাপুরে নবদের পাশের বাড়ীর যদু বিশ্বেস সপরিবারে মকর বাহিনীর ভোগ দিয়েছিল এবং সপরিবারেই তারা মা ওলাই চণ্ডীর কৃপায়

সারারাত্রি আর সকাল ওলানামা করলে। দুপুর নাগাদ মহিষের পিঠে চড়ে যমদূতরা এসে একটি মাত্র চার বছরের মেয়েকে রেখে তাদের সপরিবারেই বৈতরণী পারে নিয়ে গেল। এদিকে, সাতভিটেতে মা ওলাই চণ্ডী বসে বসে মানব দেহগুলো থেকে ক্রমাগত জল বার করে দিলেন। খানিকক্ষণ ধরে হাত-পা কষাকষির পর তেষ্টায় যখন তাদের বুক ফাটতে লাগলো তখন একে একে কৃপা করে মা তাদের জনাত্রিশেককে ভবপারে পাঠিয়ে দিলেন। নাউলীর নির্জলা খালধারেও মা ওলাই চণ্ডী ভক্তদের বঞ্চিত করলেন না, এবং জনাচারেককে দক্ষিণ দুয়ারে পৌঁছে দিলেন। এমনি করে বিলঅঞ্চলের সাত আটখানা গ্রামে মা ওলাই চণ্ডী লীলা করতে লাগলেন।

মা ওলাই চণ্ডীর ভৈরবী আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্যে চাষীদের সামনে একটি দরজাই খোলা ছিল—মা রক্ষেকালীকে আর তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের প্রাণপণে ডাকা। দেহ-মন-প্রাণ ঢেলে এ-কাজটা সম্পাদনের কোন ত্রুটিই জ্ঞানমতে তারা রাখলে না, বোধ করি স্বয়ং প্রহ্লাদও এমন ডাক ডাকতে পারতেন না। গ্রামে যত খোল কর্তাল ঝাঁঝর ঘণ্টা আর শঙ্খ ছিল এই দুর্দিনে সেগুলো সবাই বার করে ফেললে এবং ভোর থেকে দিন-দুপুর আর বিকেল থেকে রাত-দুপুর পর্যন্ত বাজিয়ে বাজিয়ে নানা সুস্বরে ও কুস্বরে নগরকীর্তন করে নারায়ণ শিবদুর্গা থেকে মা রক্ষেকালী পর্যন্ত তেত্রিশ কোটী দেবতাকে ডেকে ডেকে নেচে গেয়ে চেঁচিয়ে গ্রামের আকাশ বাতাস তারা যেন ভেঙ্গে চুরে ছিঁড়ে ফেলতে লাগলো।

নগরকীর্তনে যখন ফল হলো না তখন বাইরে থেকে রণরঙ্গিণী ওলাই চণ্ডীর ওপর অনস্বীকার্য প্রভাব বিস্তারের আশায় ঢাকুরের বাবুদের প্রতিষ্ঠিত মা-শ্মশান কালীর দ্বারস্থ হলো ওরা এবং চাল কলা পাটালি পাঁঠা আর নগদ পয়সা—সর্ব রকমে চেষ্টা করলো তাঁর করুণা

জাগ্রত করবার জন্যে। আর একদল প্রতাপনগরের বাবুদের কালী আর শিব মন্দিরে গিয়ে নানা গীত-বাদ্য-ভোজ্যদ্বারা সেই জাগ্রত দেব-দম্পতীর প্রসাদ লাভের চেষ্টা করতে লাগলো। এতেও যখন ফল হলো না কিছু, তখন আর একদল গিয়ে অসাম্প্রদায়িক দেবতা শা-মাদারের শরণাপন্ন হলো। তারা হাঁস দিলে মুরগী দিলে এবং জ্যান্ত-জ্যান্ত পাঁঠা দিয়ে পূজো সেরে সেগুলোকে ছেড়ে দিলে কপালে ফকীরের লেখা কাগজ এঁটে। মুরগীগুলো শা-মাদারের মগডালে উঠে ক—ক্ক—ক্ক করে ডেকে উঠলো, পাঁঠাগুলো ভ্যা-ভ্যা করে ডাকতে ডাকতে প্রাণভয়ে ছুটে পালালো চাষীদেরই গ্রামের দিকে। দেখে চরম অমঙ্গলের আশঙ্কায় বুক চাপড়ে হাহাকার করে উঠলো সবাই।

ভীমের ছেলের যখন যায়-যায় অবস্থা তখন নবীনের পরামর্শে উদ্ধব ঘোষের মামাতো ভাগ্নে ডাঃ সি. কে. ভোস্, ডি. এম. টি. (হাতুড়ে)কে ডাকা হলো। তিনি ডাকসাইটে ডাক্তার, অ্যালোপ্যাথিক, হোমিও প্যাথিক, ও আয়ুর্বেদীয়, এই ত্রিবিধ মতে চিকিৎসা করেন। তাঁর ভক্তরা গোপনে গোপনে এ কথাটাও প্রচার করেন যে তিনি হেকিমী ও ফকিরী চিকিৎসাতেও স্বয়ং ধন্বন্তরী। এহেন ডাঃ ভোস্ যখন ঘোড়ায় চড়ে হাজির হলেন তখন ভীমের ছেলে উঠোনে নেমেছে।

ডাক্তার বাবু উঠোনের পাশে এসেই এই দৃশ্য দেখে ঘোড়ার লাগাম কষলেন এবং ঘোড়ার পিঠে বসেই হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—ইউ ব্লাডি নান্‌সেন, শুয়ারকা বাচ্চা, চাষা কোথাকার! কাটিং জোক্‌স্? তামাসা পাতা হ্যায়—শালা খচ্চরের দল। আমার পেসেণ্ট কেন মেরেছিস তোরা? তোদের নামে আজই আমি কেস্ করবো।

পুত্রশোকের মধ্যে ভীম এসব বড় বড় কথার কোনই অর্থ বুঝতে পারলে না, কিন্তু এই সিংহ গর্জনের প্রবল শব্দটার অর্থ বুঝে

বড়ই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। অন্যান্য পরিজনের অশ্রুসিক্ত মুখও বিস্ময়ে ও ভয়ে হাঁ হয়ে গেল।

তারা এখনও কোন সাড়া দিচ্ছে না দেখে ডাঃ ভোস্—ইউ ব্লাডি, কুত্তির বাচ্চা—বলেই ঘোড়া থেকে ভূতলে লাফিয়ে পড়লেন এবং কদমে কদমে এগিয়ে গিয়ে মৃত দেহটার হাত আষ্টেক দূরে দাঁড়ালেন। মৃতের পরিজনদের মুখ ভয়ে শুকিয়ে গেল এবং কান্নার শেষ সুরটুকুও বন্ধ হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে।

ডাঃ ভোস্ হাঁকলেন—ইউ ব্লাডি নান্‌সেন্, পেসেণ্টের ফাদার, মানে বাবা কই ?

ভীম এগিয়ে এলো, ভয়ে তার মুখ শুক্‌নো, চোখের পাতায় পুত্র শোকের অবরুদ্ধ অশ্রু চক্‌চক্ করছে।

—ইওর সন্ ? জিজ্ঞাসা করলেন ডাঃ ভোস্।

ভীম উত্তর দিচ্ছে না দেখে নবীন সাহসে ভর করে এগিয়ে গিয়ে বললো—শেষ রাত্তিরি মরেছে ডাক্তার বাবু।

—শুয়ার কি বাচ্চা! আমি তাই বাতিয়েছি। রোগীর বাবা কে?

ভীম এবারে ঘাড় নেড়ে জানালে যে সেই-ই হতভাগ্য বাবা।

—উস্‌কা পর্দা নিকালো। হাঁকলেন ডাঃ ভোস্।

ভীম নবীনের দিকে তাকালো। নবীন ডাক্তারের দিকে তাকালো।

ডাক্তার বাবু রেগে বললেন—হারামীকা বাচ্চা, ওর মুখের ক্লথ ওপেন মানে কাপড় খুলে দাও।

ভীমের আগেই নবীন তার মুখের কাপড় তুলে ধরলো।

সেই হাত আষ্টেক দূরে দাঁড়িয়ে তিনি মৃত রোগীর মুখ দেখলেন। তারপর বললেন—আইলিড্, মানে চোখের পাতা টেনে ধর্।

নবীন মৃত রোগীর চোখের পাতা টেনে ধরলো। নিথর দুটো চোখের তারা স্থির হয়ে আছে সেখানে।

ডাক্তার বাবু বললেন—অড়ড্যাই, চেষ্টে মানে বুকে হাত রাখ্।

নবীন শবের বুকে হাত রাখলো।

ডাক্তার বাবু দেখলেন হাত ওঠা-নামা করছে না। জিজ্ঞাসা করলেন—কুল, মানে ঠাণ্ডা?

নবীন ঘাড় নেড়ে সায় দিলে।

—নাড়া দে, ধ্যাৎ, জার্কিং দে, খুব জোরে জোরে।

নবীন জোরে জোরে নাড়া দিলে। শবের মাথা থেকে পা পর্যন্ত একসঙ্গে নড়তে লাগলো।

ডাক্তার ভোস্ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—অড়ড্যাই, রাইগার কমপ্লিট! অড়ড্যাই, লীভ ইট।

নবীন উঠে দাঁড়াতেই ডাঃ ভোস্ নবীন ও ভীমের মাঝামাঝি হাত পেতে বললেন—মাই ভিজিট।

ওরা দুজনেই একসঙ্গে ডাক্তার বাবুর দিকে তাকালে।

—অড়ড্যাই, দাও, ষোল টাকাই দাও।

আবার ওরা দুজনেই তাকালে তাঁর দিকে। ওদের দৃষ্টি দুর্বোধ্য জিজ্ঞাসায় অতি করুণ ও স্থির।

ডাক্তার বাবু বললেন—আমার ভিজিট এইট্ রুপিস্ মানে আট টাকা, মেডিসিন মানে ওষুধের দাম চার টাকা, আর কন্ভেয়ান্স্ মানে পাল্কী ভাড়া চারটাকা। ক'টাকা হয়, ষোল টাকা নয়?

হিসেবে যে ডাক্তার বাবুর কোনই ভুল হয়নি সেটা ওরা ঘাড় নেড়ে জানালো। তবে, রোগীর চিকিৎসা না করে, শুধুমাত্র পদার্পণের জন্যে কেন যে ষোলটা টাকা দক্ষিণা দিতে হবে এই কথাটাই ওদের কাছে একান্ত দুর্বোধ্য হয়ে রইলো।

সাহস করে নবীন বললে—ডাক্তারবাবু, ছাওলডা মরে গ্যালো ভীমির। রুগী তো দেখতিও হলো না আপনার। এই টাকাডা থ্যামা দেন গে যায়ে।

আর যায় কোথায়! ডাক্তার ভোসের গলা দিয়ে একসঙ্গে বোধহয় হাজারটা ডালকুত্তা ক্রোধে গর্জন করে উঠলো। হাত মুঠো করে, চোখ পাকিয়ে, মুখ ভেংচে, কুঁকড়ে, মেরুদণ্ড সোজা করে তিনি এমন তাণ্ডব জুড়ে দিলেন যে তখন যদি মৃত দেহটারও মুখের কাপড়খানা কেউ খুলে ধরতো তো দেখা যেতো ঘৃণায় আর লজ্জায় সে-মুখখানাও বেঁকে গেছে।

ডাঃ ভোসের দয়ার শরীর, ষোল টাকা থেকে দু'টাকা তিনি ছেড়ে দিলেন।

জমিদার পাড়ার এই শ্রেণীর অসংখ্য ধন্বন্তরী এমনি করে দয়া দেখাতে লাগলেন মহামারীপীড়িত চাষীদের পল্লীতে পল্লীতে।

এই কাণ্ডের মাঝে নবীন খবর পেলো যে, নবদের বাড়ীতে কলেরা লেগেছে। ঘণ্টা কয়েক পরে নবীন যখন গিয়ে হাজির হলো তখন নবর বৌকে উঠোনে নামানো হয়ে গেছে। বৌটির মুখ যন্ত্রণায় এমন বিকৃত হয়ে আছে যে, নবীনের মনে হলো তার নিজের দেহটাও যেন কুঁকড়ে বিকৃত হয়ে যাচ্ছে।

নব বারান্দায় চুপ করে বসে আছে গালে হাত দিয়ে। প্রতিবেশীরা কেউ আসেনি, কলেরা মড়কে কেউ আসেও না সাহায্য করতে। নব ওকে বললে—শেষ সুমায় এক ফুটা জল দিতি পারলাম নারে মিতে!

ঘরের ভিতর নবর মা কাতরাচ্ছিল। নবীন ঢুকতেই বুড়ী জড়িত কণ্ঠে জল চাইলে। জলের তেষ্টায় বুড়ীর মুখ দিয়ে গাঁজলা বেরুচ্ছে, চোখ দুটো লাল জবাফুলের মত হয়ে উঠেছে। নবীন চারিদিকে খোঁজ করে দেখলো কোথাও জল নেই। অসহায়ভাবে সে বুড়ীর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। বুড়ীর দেহটা দুঃসহ যন্ত্রণায় মাঝে মাঝে দুমড়ে মুচড়ে বীভৎস হয়ে উঠছে। সহ্য না করতে পেরে নবীন এক

সময় ঘর থেকে বেরিয়ে নারকেল তলায় ছুটে গেল। কিন্তু গাছেও ডাব নেই। নবর বাড়ীর সাত-আটটা গাছের একটাতেও ডাব, কি ঝুনো, কোন নারকেল নেই, এমন কি দূরে নিকটে যতদূর চোখ যায়, অন্য কারো গাছেও নারকেল নেই। ওর বুঝতে বাকী রইলো না যে, অনাবৃষ্টির দরুণ নারকেল ফলেনি, আর যা দু'টো একটা ফলেছিল, বেশী দাম পাবার আশায় সবাই তা হাটে নিয়ে বিক্রী করে দিয়েছে, ফুলকসিগুলো পেড়ে কলেরার প্রথম দমকেই জল তেষ্টা নিবারণ করা হয়েছে, এখন আর কোন উপায়ই নেই।

নবীন তাড়াতাড়ি একটা কলসী নিয়ে বেরিয়ে পড়লো ঘর থেকে। উঠোনে নামতেই নব জিজ্ঞাসা করলে—কনে যাও ?

ব্যস্ত হয়ে জবাব দিলে নবীন—পিরতাপনগর, জল আনতি।

—না, যায়ে না।

নবীন থমকে দাঁড়িয়ে বললে—ক্যানো ?

ধীরে ধীরে থিতিয়ে থিতিয়ে নব বললে- কাল আমিউ যাচ্ছিলাম জল আনতি। পথে শুনলাম, অক্ষয়ের কলেরা হয়েছে বুলে তার বাবা জল আনতি গিইলো, মুকুজ্জে বাবুরা মারে বুড়োরে শয্যেগত করে ফেলেছে। বোলে বুড়ো নাকি তারগের পুকুরি কলেরা ছাড়তিলো। তাই শুনে আর গ্যালাম না আমি। তারপর তো এই কাণ্ড। এই বলে নব উঠোনে নামানো বৌয়ের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে।

নবীন ফিরে এসে কলসীটা বারান্দায় ঠেসান দিয়ে রেখে নবর দিকে অতি অসহায়ভাবে তাকিয়ে বললে—তা'লি উপায় !

বুড়ীর কাতরানি শুনে নবীনের মনে হল উদ্ধব ঘোষের দরবারে বসে রাম বাছাড় যেন অনুনয়ের সুরে প্রার্থনা জানাচ্ছে—জল খাবার এট্টু গত্তো খুড়বার হুকুম দ্যানগে ঘোষকত্তা।

—উপায় ! বলে নব নবীনের মুখের দিকে এমনভাবে তাকালো যে

অসহায় ঘৃণায় নবীনের সারা অন্তর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে কেউ কথা বললো না ওরা, সে চাউনীর অর্থ ওরা বুঝলো। মানুষের চরম বিপদে ভদ্রলোকদের মনুষ্যত্বের যে রূপ জীবনভোর ওরা প্রত্যক্ষ করেছে এই মৃত্যুপুরীর মাঝখানে আজকার এই অসহায় মুহূর্তে তারই বীভৎস অমানুষিকতা অতি কুৎসিৎ হয়ে ধরা পড়লো ওদের এই দৃষ্টিতে।

বউটীর সংকারের পর গভীর রাত্রিতে প্রতাপনগরের মিত্তিরবাবুদের পুকুরের অজস্র জল থেকে এক কলসী জল আনলো নবীন। সেই জল খেয়ে মৃত্যুপথযাত্রী বুড়ীর চোখে অন্তর-নিঃসৃত কৃতজ্ঞতার যে-দৃষ্টি ফুটে উঠলো, সে-দৃষ্টি জীবনে কোনোদিন ভুলবে না নবীন। নিজের মায়ের মরণের কথা মনে নেই নবীনের, কিন্তু বুড়ী মরে গেলে সে ভোরের শুকতারার দিকে চেয়ে চেয়ে নিঃশব্দে বসে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদলো।

মহামারী থামলে নবীনরা আবার দেওয়াল গাঁথতে বেরুলো।

ওদের দেখেই চক্কোত্তিগিন্নি চক্কোত্তি মশাইয়ের উদ্দেশে সুর করে বলে উঠলেন—এই যে ছাখো গো, তোমার পুষ্যিপুত্তুররা এয়েচেন গো—।

চক্কোত্তি মশাই বারান্দায় এসে জিজ্ঞাসা করলেন—কি খবর? কি মনে করে সব?

উঠোনে দাঁড়িয়ে ওরা পরস্পরের মুখের দিকে বোকার মতো চাইতে লাগলো। শুধু নবীনই সাহসে ভর করে দু'পা এগিয়ে গিয়ে বললো—এট্টু তামাক ছান ঠাকুর কত্তা, দেয়ালডা আজ শেষ করে ফেলি।

চক্কোত্তি মশাই হাউইকাটা হয়ে বললেন—তোরা হারামজাদা, শয়তানের বাসা, ইচ্ছে করে আমার দেয়াল ফাটিয়ে দিয়েছিস। আবার ভেঙ্গে না গাঁথলে ওঘরে কুকুরেও বাস করবে না। তোদের মতো নেমকহারামকে দিয়ে আর যদি আমি দেয়াল গাঁথাইতো মরা বাপের হাড় খাই।

নবীন কাতরে বললো—রাগ করেন ক্যানো ঠাকুর কত্তা। অ্যাতোবড়ো মড়ক গ্যালো, তা পরাণে বাঁচে যেন্ ফিরে আইচি সেই হোলো গেন্ পিত্তির পুরুষির ভাগ্‌গি। আপনার দেয়ালে যা ফাট ধরেচে তা জল দিয়ে নরম করে পিটোয়ে দিবানে আমরা। থ্যামা ছ্যানগে আপনি।

চক্কোত্তি মশাইয়ের ধম্মো-কম্মো আছে, মরা বাপের হাড় তো খেতে পারেন না, তাই ইচ্ছে থাকলেও ক্ষমা আর দিতে পারলেন না। ওদের শুধু তাড়িয়ে দিলেন এবং আর একদিন গিয়ে পাওনা শোধ করে আনতে বললেন।

ফেরার পথে মাঠের ধারে পোঁছে নবীনরা বিস্ময় ও বেদনার সঙ্গে দেখলো ললিতা বৈষ্ণবীর কুঁড়েখানার জায়গায় অনেক ঘরপোড়া ছাই পড়ে আছে। ক'খানা পোড়া খুঁটির গোড়া মাটীর ওপর উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে তার অতীত বাসস্থানের সাক্ষ্য দিচ্ছে। পাশের বেদীটা কারা যেন শাবল দিয়ে খুঁড়ে খুঁড়ে নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছে। পোঁতা টাকার সন্ধানে ভদ্রলোকদের এই মরার ওপর খাঁড়ার ঘা দেওয়ার হীন প্রবৃত্তি দেখে ঘৃণায় তাদের সারা মন ভরে উঠলো। ললিতার কোন সন্ধান না পেলেও কলেরার মড়কের সুযোগে সে যে নগেন চক্কোত্তি আর উদ্ধব ঘোষকে লজ্জার হাত থেকে মুক্তি দিয়ে গেছে সেকথাটাও অতি বেদনার সঙ্গে তারা বুঝতে পারলো। শেষ সাক্ষাতের মুহূর্তটা তাদের মনে পড়লো। ওদের মনে হলো দু'চোখে জলের ধারা নিয়ে বৈষ্ণবী আজও যেন বটতলার বেদীতে বসে আছে মাঠের দিকে তাকিয়ে।

ক'দিন পরে টাকা চাইতে গেলে চক্কোত্তি মশাই ওদের পাওনা তো দিলেনই না, অধিকন্তু দেওয়াল ফাটার অজুহাতে ক্ষতিপূরণ চাইলেন এবং জানিয়ে দিলেন যে, ক্ষতিপূরণের টাকা যদি জুতিয়ে আদায় না করতে পারেন তো তিনি পঞ্চানন চক্কোত্তির বেজন্মা।

সাত

উদ্ধব ঘোষ ধীরে ধীরে গ্রামের একান্ত নির্ভরস্থল হয়ে উঠেছেন। টাকাকড়ির জন্যে লোকজন তো তাঁর কাছে আসেই, তাছাড়া বৈষয়িক বুদ্ধি নেওয়া থেকে বিয়ের ফর্দ পর্যন্তও করিয়ে নিতে চায়। উদ্ধববাবু নিজে করুন বা না করুন লোকের কাজগুলো করিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। ভদ্রলোকেরা উদ্ধববাবুকে তাই নেতা বলে মান্য করে।

সকাল বেলায় যখন গাবোখালীর হিসেব নিয়ে তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন সেই সময় নগেন চক্কোত্তি এসে হাজির। এসে এমন জাঁকিয়েই বসলেন যেন অনেক কাজ নিয়ে এসেছেন।

উদ্ধব ঘোষের ভাল লাগে না নগেনকে। কিন্তু ওঁর মত দুষ্কর্মের দোসর আর হয় না। ওঁকে দিয়ে অপকর্মগুলো করিয়ে নেওয়া যায় সামান্য অর্থের বিনিময়ে অনায়াসে। সেইজন্যে ওঁর সঙ্গে খাতির রাখাটা ঘোষমশাই প্রয়োজন বলে মনে করেন এবং ঠিক সেই কারণেই হিসেবী ঘোষমশাই ওঁর সঙ্গে অভদ্রতা করতে পারছেন না।

তামাক টানতে টানতে উদ্ধবকে বাদ দিয়ে নগেন রামলোচনকে উদ্দেশ করেই বলেন—শুনেছ ও রামলোচন, তোমার কাকার কাণ্ড শুনেছ ?

রামলোচন অন্যমনস্কভাবে বলেন—কে, কাকা কে ?

—এহ্ য্যানো কিচ্ছু জানো না, ক্যানো তোমার আপন কাকা চন্দোরনাথ গো।

চন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী গ্রামের একজন নমস্য সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ এবং গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কুলপুরোহিত। রামলোচন চক্কোত্তির কথায় কোন গুরুত্ব না দিয়ে নিজের কাজ করে যেতে লাগলেন।

—এহ্, য্যানো কানেই ওঠে না কোন কথা। তা উঠবে ক্যানো,

হাজার হোক তোমার নিজের কাকা তো। থুথুটা যত ওপরেই ফ্যালো, গায়ে তো পড়বে নিজেরই, কি বল রামলোচন।

রামলোচন ও উদ্ধব ঘোষ দুজনেই এবার আগ্রহান্বিত হয়ে উঠলেন। একটা শোনার মতো কাহিনী আসছে তাহলে! নগেন চক্কোত্তি সাধারণত মিছে বলেন না। তবে যা বলেন, তা কদাচিত ভাল. কথা। রামলোচন বললেন—থামলে কেন নগেন। তোমার সাপের জিভ থামলেই ভয় হয়, ছোবল দেবে বুঝি।

নগেন চটে গিয়ে বললেন—আমার কথা ভাল লাগবে না, সে-যে সত্যি কথা। শাস্তরেই বলে সত্যি কথায় বন্ধু ব্যাজার হয়। তোমার কাকা শ্রীল শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী যে মহা আনন্দে নবশাখদের বাড়ীতে যজন-যাজন করে মধু লুঠে বেড়াচ্ছেন সে কথা শুনলে যদি মনে কষ্ট লাগে তো না-ই বললাম। এই আমি মুখে চাবি লাগালাম।

রামলোচন হেসে বললেন—চাবিটা যদি লাগালেই তবে ছোবলটা না মেরে লাগালেই তো উপকার হতো। বিষধর সাপের এই একটি মাত্র দোষ যে তারা বিষদাঁতগুলো পরীক্ষে না করে থাকতে পারে না কোনমতেই।

নগেন রুখে ওঠেন—ত্যাখো রাগিও না আমাকে, হাটে তা হলে সব হাঁড়িই ভেঙ্গে দেব বলছি।

রামলোচন বলেন—না, না, আমি সাপুড়ে নই যে কেউটের মাথায় পা দেব।

উদ্ধব ঘোষ আপন মনে খাতা দেখতে লাগলেন। রামলোচনও আবার হিসেবে মন দিলেন।

কিন্তু বেশীক্ষণ নীরবে তামাক টানার লোক নগেন চক্কোত্তি নন। উদ্ধব ঘোষের হুঁকোর মাথায় কলকে বসিয়ে দিয়ে বললেন—একটা কাজ ছিল বলেই তোমার কাছে এইছি উদ্ধব।

উদ্ধব ঘোষ মুখ না তুলেই বললেন—সে কাজ তো করেই ফেলেচো। আর কি ?

বেকুপ হবার লোক নগেন চক্কোত্তি নন। হ্যা-হ্যা করে হেসে বললেন—ব্রাহ্মণ মানুষ, পরের উবগার করাটা পৈত্রিক পেশা। পিতৃরক্তের কামড়ে মাঝে মাঝে সত্যিকথা বলে ফেলা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। তাতে তোমরাও যদি কিছু মনে কর তো দাঁড়াই কোথায় বলতো।

—কি-যেন বলতে যাচ্ছিলে। ঘোষ মশাই মুখ উঁচু না করেই জিজ্ঞাসা করেন।

নগেন বললেন—এই, মানে আমার নিজের কথা। মেয়েটার বিয়ে ঠিক হয়েছিল জানতো সেই গোপালপুরের ভট্‌চাজ্জিদের বাড়ীতে। কাল এসে তারা জানিয়ে গেছে, তাদের ছেলের বিয়ে এমাসে তো নয়ই, কবে যে দিতে পারবে সে কথা তারা বলতে পারে না। বেশী পীড়াপীড়ি করাতে বুড়োটা জানিয়ে গেছে বিয়েটা ভেঙ্গে গেছে জেনেই যেন আমি কাজ করি। জান তো, ঘরটা উঠতি বংশ, তাই মাত্তর সাতশো টাকা নিয়েই আমি মেয়ে ছাড়তে রাজী হয়েছিলাম ওদের ঘরে। ভেবেছিলাম আমার যা হবার হোক, মেয়েটা অন্তত বলতে পারবে না—বাবা, এ তুমি আমায় কোন্ হা-ভাতের ঘরে বেচে দিয়েছ। এদিকে আমার সব ঠিক ঠাক, এমন সময় এই জবাব। বল দেখি, একটা ক্ষতিপুরণের মামলা রুজু করে দেবো নাকি বুড়োটার নামে ?

মনোযোগ দিয়ে ওঁর কথা শুনে উদ্ধব ঘোষ জিজ্ঞাসা করলেন—বিয়েটা ওরা ভাঙ্গলো ক্যানো ?

—বললে, ধানপানই তাদের বড় সম্বল, সেটা এবার হয়নি, যাজন ক্রিয়াকর্মও তেমন হয় না আজকাল। পুরোনো টাকা যা ছিল সবই তো বাইরে ছড়ানো, এই দুবছোরে তা আর ঘরে উঠবে না। শুধু আমার মেয়ে নিলেই তো হবে না তাদের। নতুন উঠতি

গেরস্থ, দেশশুদ্ধ লোককে তো ডাকতে হবে, হাজার চারেক টাকার কম খরচা হলে তো তাদের মান থাকবে না। এবার আর টাকা খরচা করার হাত তাদের নেই। আমি যদি অপেক্ষা করতে পারি ভালই, নয়ত আমার অন্য চেষ্টায় তারা বাধা দিতে চায় না।

উদ্ধব ঘোষ আর রামলোচন চক্রবর্ত্তী মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। নগেন এমন ভাবে খুলে বললে যে কারো কিছু বুঝতে বাকি রইলো না। গোপালপুরের ভট্চাজ্জিরা যে কত বড় অবস্থাপন্ন লোক সে কথা ছুজনের কারো অজানা নেই। ছুজনেরই মনে হলো সেই ভট্চাজ্জিরাই যখন বিয়ে দিতে পিছিয়ে গেল টাকার অজুহাত দেখিয়ে, তখন দুর্বৎসর সত্যিই পড়েছে।

উদ্ধব ঘোষের মনটা স্পর্শাতুর হয়ে ওঠে। আপন বুকে দীর্ঘশ্বাস চাপেন তিনি। রামলোচন হিজিবিজি কাটেন খসড়া কাগজে।

—একটা মামলাই করে দিই কি বলো ?

বিরক্ত হলেন উদ্ধব ঘোষ। বললেন—বাতাস নিংড়েও যদি রস মেলে এক ফোঁটা, কি বল চামার চক্কোত্তি ?

কিন্তু নগেন চক্কোত্তিরও লজ্জা আছে। পুরোনো ঘনিষ্ঠ সম্বোধনে খানিকক্ষণ অধোবদন হয়ে এক সময় উঠে গেলেন তিনি।

দরজা পর্যন্ত যেতেই তাঁকে ডাকলেন উদ্ধব ঘোষ। কাছে এলে জিজ্ঞাসা করলেন—কি যেন বলছিলে পুরোত ঠাকুর মশাই সম্বন্ধে।

চামার চক্কোত্তির মনেও অনুশোচনা দেখা দেয়। বললেন—কথাটা তোমার কানে তোলাটা ঠিক হয়নি উদ্ধব। এই দুর্বচ্ছোরে বামুন, কায়েত, বদ্যি, এ-তিন জাতের বাড়ী ক্রিয়াকর্ম তো প্রায় বন্ধ। বিয়ে-থা ভাঙ্গছে, শ্রাদ্ধশান্তি মাথা মুড়িয়েই নম-নম, পুজো আচ্চা—পারলে হয় নিজেরাই সেরে নেয়, না হয় চেপে যায় বেমালুম। এমন অবস্থায় অপকর্ম না করে চন্দোর খুড়ো যদি......

নগেন চক্কোত্তির দিব্যজ্ঞানে উদ্ধব ঘোষও বিস্ময় বোধ করেন। নগেনের চলে যাওয়ার পথের দিকে বিনা কারণেই তাকিয়ে থাকেন তিনি অনেকক্ষণ।

দুপুর বেলায় খাওয়া-দাওয়া সেরে দোতালায় তাঁর নিজের ঘরে শুতে গেলেন উদ্ধব ঘোষ। অসুস্থ স্ত্রী শুয়ে আছেন পাশের খাটে। পান চিবোতে চিবোতে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকেন তিনি। রক্তস্রাব হয়ে স্ত্রীর ফরসা রং প্রায় সাদা হয়ে গেছে। নীল শিরাগুলো ফুটে উঠেছে কপালে মুখে, হাতের পাতায় পায়ের পাতায়, তার ভেতর দিয়ে রক্ত চলাচল করছে আর পাতলা চামড়া উঁচু-নিচু হচ্ছে।

স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন—কি দেখচো।

জবাব না দিয়ে ফ্যাক্‌সা হাসেন উদ্ধব ঘোষ। স্ত্রী কাছে গিয়ে বসতে বলেন। কাছে বসে তিনি স্ত্রীর গায়ে হাত বুলিয়ে দেন। অনেক কথা হয়। স্ত্রী আস্তে আস্তে থিতিয়ে থিতিয়ে কথা বলেন। হাসিতে তাঁর দাঁত বেরিয়ে যায়, রক্তহীন বিবর্ণ ঠোঁটের ওপর দাঁতগুলো বড় করুণ দেখায়।

ঘর সংসারের কথাবার্তা বলতে বলতে উদ্ধব ঘোষ জিজ্ঞাসা করেন —দিদি এসেছিলেন, তিনি কোথায় গেলেন?

উত্তরে স্ত্রী জানালেন—বড় বউমার, সেই যে গো বড় খোকার বউ, মানে তোমার ভাগ্নের বউ, তার অবস্থাও যে আমারই মত। কাল রাত্রে সাতমাসে একটা মরা ছেলে হয়েছে তার। দিদি সেই যে গেছেন, আর আসতে পারেননি। এমন বিপদে আসবেনই বা কেমন করে।

আলোচনা ক্রমে ক্রমে দিদির সংসারে গিয়ে ঠেকলো। উদ্ধব ঘোষ শুয়ে পড়লেন। দিদির বাড়ীর যে-সব কথা জানা ছিল না স্ত্রী একে একে সেই সব জানালেন। বড় ভাগ্নে মানে মহা প্রতাপশালী ডাক্তার

সি. কে. ভোস. ডি, এম, টি (হাতুড়ে)-র আর উপার্জন প্রায় নেই বললেই চলে। চাষীপাড়ায় তার ছিল প্র্যাকটিস, চাষীদের অবস্থা পড়ে যাওয়ায়, তা প্রায় বন্ধ। মেজ ভাগ্নে বল্টু আই. এ. পরীক্ষা দেবে দেখিয়ে ভাল ঘরে বিয়ে ঠিক করেছিল ডাক্তার। কিন্তু, সে পরীক্ষা দিতে পারেনি। সারা বৎসর কলেজের মাইনে বাকী ছিল, তার ওপর পরীক্ষার ফি সময় মত দিতে না পারায় পরীক্ষাটা যেমন হাত ছাড়া হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে বিয়েটাও তেমনি ভেঙ্গে গেছে।

উদ্ধব ঘোষ অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করেন। তিনি এবার পরিষ্কার বুঝতে পারেন দুর্বৎসর এসেছে—এসেছে চাষী পাড়ায়, মধ্যবিত্ত পাড়ায়, জমিদারের ঘরে, মহাজনের সিন্দুকে, আর এসেছে তাঁর মনে, তাঁর জীবনীশক্তির গোপন কেন্দ্রে—যেমন ক'রে সবার অগোচরে ধীরে ধীরে আকাশে আকাশে মেঘ ছড়িয়ে বজ্র হেনে বর্ষা আসে হিমালয় থেকে বঙ্গোপ-সাগরের নীল জল পর্যন্ত, যেমন ক'রে অবিশ্রান্ত জলের প্রবল বন্যায় ভেঙ্গে-চূরে ভেসে যায় সারা দেশ নদ-নদী, পথ-ঘাট, গ্রাম-মাঠ, ঘর বাড়ী, তার চেয়ে অনেক বেশী পরিব্যাপ্ত, অনেক বেশী তীব্র ও গভীর হ'য়ে দুর্বৎসর এসেছে। এর হাত থেকে নিস্তার নেই কারো।

কলেজে পড়বার সময় সখ করে ছবি আঁকা শিখতেন উদ্ধব ঘোষ। সেই শিল্পী যেন ঘুম ভেঙ্গে জেগে ওঠে তাঁর ভেতর। দীর্ঘদিনের অনভ্যস্ত হাতে সে-শিল্পী যেন ছোট বড় তুলি দিয়ে বিচিত্র রঙ্গে হিজিবিজি কেটে যায় তাঁর মনের পর্দায়। ···শুকনো খড়ের রঙ্গের ওপর একটা প্রাকৃতিক দৃশ্য···পাতাঝরা গাছের জঙ্গল,···পাশে তার শুকনো নদী···ভাঙ্গা সেতুর একখানা পাড়ন ঝুলছে...দুটো জোড়া তালগাছ একটা ন্যাড়া, আর একটার পাতা প্রায় নেই...দুটো হরিণ—মাদীটার পা খোঁড়া, মদ্দাটার শিং ভাঙ্গা... বহু চেষ্টাতেও নদীর শুকনো খাদটা পার হতে পারছে না তারা...ক্ষুধাতুর দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে শুধু ওপারের পাতাঝরা জঙ্গলটার দিকে।

আট

ফাল্গুনমাস শেষ হয়ে গেল। অথচ আদায় যা হলো তাকে মরুভূমিতে জলবিন্দু ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। জমিদার পাড়ার বড় বড় রাঘব বোয়াল থেকে শুরু করে কুচো চিংড়িরা পর্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠলেন।

তাঁরা করচা সেহা আর রোকড় দেখলেন, জমাখরচের খাতা পরীক্ষা করলেন, জমি বন্ধকের নাম করে রেজেস্ট্রী করিয়ে নেওয়া কবলার তাড়ি খুললেন এবং রাশি রাশি খতের উল্টো পিঠের ওয়াশীল মিলিয়ে দেখলেন। হিসেব তাঁদের বেঠিক হবার নয়। পুরুষানুক্রমে পাওনার হিসেব বেড়ে বেড়ে আজ যেখানে এসে ঠেকেছে, গৌরীশঙ্কর শৃঙ্গের মাথাটাও বোধকরি তার নাগাল পাবে না। তার পাশে আদায়ের অঙ্কটা দেখাচ্ছে ছোট একটা নুড়ির মতোই।

অবস্থা দেখে উপবাসী শ্বাপদের ক্ষুধার্ত উত্তেজনা অনুভব করেন প্রতাপনগরের বিখ্যাত রায়বাবুদের সদর মহলের ঝানু নায়েব নিবারণ মুখুজ্জে, বেড়াপাক আগুন সর্বস্ব ছাই করে করে এগিয়ে আসছে বলে ভয় পেলেন বিচক্ষণ তালুকদার মহাজন উদ্ধব ঘোষ, আকস্মিকভাবে পিতৃহীন হওয়ার মতো দিশেহারা হয়ে দু'হাঁটুর ভেতর মাথা গুঁজলেন মিত্তির মশাই এবং ছোট বড় আরও সব তালুকদার গাঁতিদার আর মহাজন।

নায়েব মশাই কলকাতার সদর সেরেস্তায় শতখানেক লাঠিধারী বরকন্দাজ চেয়ে পাঠালেন এবং উদ্ধব ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে জেলার কালেক্টর, পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও থানার দারোগার সঙ্গে দেখা করে এলেন ষোল বেয়ারার পাল্কী চড়ে।

তারই সুফলে কয়েক দিন বাদে কালেক্টর তথা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট

পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে সঙ্গে নিয়ে প্রতাপনগর স্কুলে পুরস্কার বিতরণ করে গেলেন। বক্তৃতায় বলে গেলেন যে, জলাভাব দূর করবার জন্যে তিনি জেলা বোর্ডকে দিয়ে চাষীদের সুবিধাজনক যায়গায় প্রকাণ্ড দীঘি কাটিয়ে দেবেন। এইভাবে জেলার উন্নতির জন্যে তিনি যেমন ব্যাগ্র, [illegible] দমনের জন্যে আগ্রহী তার চেয়ে অনেক বেশী। পুলিশ সুপারও গলায় মালা পরে জানালেন যে, যে-শিক্ষাটা তিনি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে পেয়েছেন দুর্বৃত্ত দমন করে জেলার শান্তি রক্ষার জন্যে প্রয়োজন হলে তার যোগ্য পরীক্ষা দিতে ইতস্তত করবেন না তিনি।

এরপর দারোগা বাবু সপ্তাহে দু'তিনবার করে ছোট খাট চুরির তদন্তের নামে প্রতাপনগর আগমন করতে লাগলেন এবং সদলবলে চাষীপাড়ার ভেতর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে প্রত্যাবর্তন করতে লাগলেন।

ক'দিন পরে যখন জমিদারের সদর থেকে জনাকুড়িক লাঠিধারী পশ্চিমা বরকন্দাজ এসে হাজির হলো তখন প্রতাপনগরের ভদ্রলোকদের কয়েক মাসের অনিদ্রাপীড়িত চোখগুলো ভারী হয়ে উঠলো ঘুমে। সকাল সন্ধ্যার তৈল খরচার সংগ্রামক্লান্ত স্ত্রীদের থুৎনীতে হাত দিয়ে তাঁরা মধুর কণ্ঠে বলতে লাগলেন—এবার তোমার পেটি চুড়ি······

তারও দু'দিন পরে, কাছারীর জনাচারেক পুরোনো বরকন্দাজের সঙ্গে যখন নতুন আমদানী-করা লাঠিধারী বরকন্দাজেরা চাষী গাঁয়ের পাড়ায় পাড়ায় মিছিল করে বেড়ালো এবং ছোটবড় হাট বাজারের ভেতর দিয়ে ঘুরে এলো, তখন চাষীদের জরাজীর্ণ পাঁজরার হাড়গুলো পর্যন্ত কেঁপে উঠলো ঠক্-ঠক্ করে।

অস্পষ্ট কলরব স্পষ্ট হয়ে উঠতেই নবীন উৎকর্ণ হয়ে উঠলো।

—ওরে কি হলো রে—

—ও বাবা, বাবা গো, তুমারে কনে নিয়ে যাচ্ছে উরা—

—ছাড়েন, ছাড়েন ও'রে—

—ও সিপাই বাবু, ছাড়েন আমারে, নিজ্জিই যাচ্ছি—

স্থির থাকতে না পেরে নবীন বাড়ীর বাইরে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালো। পেছন পেছন তার স্ত্রী মাদারী আর ছেলেমেয়েরা।

প্রতাপনগরের জমিদার কাছারীর বরকন্দাজ আটজন ততক্ষণে হরিবোলকে এনে ফেলেছে ওদের দরজার সামনে রাস্তার ওপর। হরিবোল পেছনে ঝুলে খুঁটি দিয়ে দাঁড়াচ্ছে এক-একবার। তার কোমর আর হাত তার স্ত্রী আর ছেলেমেয়েরা টেনে ধরেছে। ঠিক সেই সময় সামনে থেকে তার মাথার অনেকদিনের না-কাটা চুল এবং কোমরের পাড়-সার কাপড় ধরে হ্যাঁচকা টান দিচ্ছে বরকন্দাজরা, হরিবোল দমক খেয়ে উল্টে পড়ছে বরকন্দাজদের গায়ে। তার স্ত্রী আর ছেলেমেয়েরাও হুমড়ি খেয়ে পড়েছে মাটির ওপর। গায়ে পড়ার অপরাধে বরকন্দাজ আটজন হরিবোলকে হাঁটু দিয়ে গুঁতো মেরে মেরে সোজা করে দিচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে ফাউ চালাচ্ছে কীল, চড় আর চুল টানার। যন্ত্রণায় হরিবোল যে-ই চিৎকার করতে যাচ্ছে একজন করে বরকন্দাজ তার মুখ চেপে ধরে রগড়ে দিচ্ছে। হরিবোলের গলা দিয়ে জানোয়ারের গোঙানির মতো শব্দ উঠছে আর যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে উঠছে তার মুখ আর সর্বাঙ্গ।

সামনা-সামনি হতেই হরিবোল দেহের সর্বশক্তি দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে জড়িয়ে ধরলো নবীনকে। নবীন বিহ্বলের মতো তাকে চেপে ধরলো বুকের ওপর। হরিবোলের মুখ দিয়ে শুধু বেরিয়ে এলো —খুড়ো, গিলাম খুড়ো। হাঁপাতে হাঁপাতে যতই সে এলিয়ে পড়তে লাগলো ততই তার মুখ দিয়ে ফেনা গড়িয়ে পড়তে লাগলো দলা দলা হয়ে।

হরিবোলের স্ত্রী হাউ-মাউ করে ডুকরে উঠলো, নবীনের সামনে পড়ে বলতে লাগলো—বাঁচাও ওরে কাকা, বাঁচাও।

নবীনের দেহ বার-দুই কেঁপে উঠলো। তারপর শক্ত করে হরিবোলকে ধরে খুঁটী দিয়ে দাঁড়ালো সামনের দিকে ঝুঁকে।

বরকন্দাজগুলো আকস্মিক ঘটনা পরিবর্তনে প্রথমে হকচকিয়ে পেছনে হটে গিয়েছিল। সামলে নিয়ে একসঙ্গে তারা লাঠি উঁচিয়ে ছুটে এলো। নবীনের সামনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সমস্বরে তারা হেঁকে উঠলো—খবদ্দার!

আতঙ্কে হরিবোল গোঙাতে গোঙাতে শুয়ে পড়লো মাটিতে। তার স্ত্রী আর ছেলেমেয়েরা কেঁদে উঠলো হাউ-মাউ করে। পেছনের দিকে নবীনের স্ত্রী আর ছেলেমেয়েরা ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো নির্বাকে।

নবীন কি করবে ভেবে না পেয়ে বলে উঠলো—দুহাই আপনাগের সিপাই বাবু, দুহাই।

—ছাড়, ছাড় বলতিছি। পুরোনো মোটা বরকন্দাজটা চেঁচিয়ে উঠলো বাংলা ভাষায়।

—মরারে আর মারেন ক্যানো, দুহাই আপনাগের, খ্যান্ত দেন এট্টু।

—শালার শালা সুমিন্দির ভাই, দরদে বুক ভাসে যাচ্ছে। বুলি কাচারী যাবি কি তুই? খাজনা দিবি তুই?

—রাগ করতিছেন ক্যান্, এট্টু রয়ে সয়ে......

—ওরে আমার ছোতনের ছোতন, কাছারীর সাতে কেষ্ট-পীরিত! তর শালা ফ্যাল্ টাকা। নবীনের সামনে মুখ ভেঙচে হাত পেতে ধরলো গোঁপওয়ালা বরকন্দাজটা। আর একজন নবীনের মা আর বাবার নামে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি দিতে লাগলো।

টাকার কথায় নবীন ঘাবড়ে গেল।

জবাব খুঁজে না পেয়ে বললে—আপনারাগেন্ রাজার সিপাই, আপনারা এট্টু দয়া করেন গরীব বুলে।

কিন্তু গরীব বলে কোন দয়াই দেখালো না তারা, হরিবোলকে ধরে

নিয়ে গেল কাছারীতে। তার স্ত্রী আর ছেলে কাঁদতে কাঁদতে তাদের পেছনে পেছনে যেতে লাগলো। নবীন সেই দিকে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে চেয়ে রইলো। পাড়ার আর যারা এসে পৌঁছেছিল তারাও নবীনের পাশে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইলো সেই দিকে।

হরিবোলের স্ত্রী, তার ছেলের হাত ধরে ফিরে এসে, নবীনদের বাড়ীতেই প্রবেশ করলো। তখন তাদের কান্না থেমে গেছে। অসহায় দুর্বলতায় হরিবোলের স্ত্রী ওদের রান্নাঘরের বারান্দায় একটা পুঁটলির মতো দলা হয়ে বসে রইলো। তার পিঠের ওপর রুক্ষ চুলগুলো জটা পাকিয়ে ঝুলে পড়েছে। তৈলহীন পিঠে চুলকোবার সাদা সাদা লম্বা দাগ এঁকে রয়েছে বেত্রাঘাতের মতো। লিকলিকে পেটমোটা ছেলেটার উলঙ্গ দেহের হাড়গুলো চামড়া ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে গিয়ে কোণ তৈরী করে করে উঁচু হয়ে আছে। মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁধে হাত রেখে স্তব্ধ হয়ে আছে ছেলেটা। তার রক্তহীন মুখে বহুযুগের অনাথ শিশুর বেদনা জমাট হয়ে আছে।

মাদারী জিজ্ঞাসা করলে—ও বউমা, ধরলে কিসির জন্যি—খাজনা বাকী, না ধান?

একটুও মুখ না তুলে হরিবোলের স্ত্রী চুপ করে রইলো।

মাদারী পলা ভাঁড়ে করে সরষের তেল এনে ওর পিঠে আর চুলে মাখিয়ে দিতে দিতে বললে—মানষিরি আর মানুষ রাখলে না উরা, গরু ছাগলের মতো গলায় দড়ি দিয়ে টানতি টানতি—

সহানুভূতির কোমল স্পর্শে বউটি কাঁদতে লাগলো আপন মনে ইনিয়ে বিনিয়ে। সারা বাড়ী ভরে উঠলো তার সেই করুণ সুরে।

হরিবোলের স্ত্রীর কান্নাকাটি সহ্য করা কঠিন। নবর সঙ্গে পরামর্শ করে কাছারী গিয়ে চেষ্টা করে দেখাই ঠিক করলে নবীন। নব অবশ্য

সঙ্গে যাবে। নবকে ডাকতে ছেলে পাঠালো নবীন। নব এসে খাওয়া দাওয়া করবে ওদের বাড়ীতেই।

নবীন আর নবর প্রশ্নের উত্তরে হরিবোলের স্ত্রী বললে যে, জমিদার কাছারীতে তারা প্রতি বছরই টাকা জমা দিয়ে থাকে। তাদের জমি মোটে দু'বিঘে। তার খাজনা দিতে হয় ছয় টাকা। তার সঙ্গে নায়েব, মুহুরী, কাছারী, যাত্রা, পূজো-পার্বণ, নানা সুদ আর তহরী পরবীর নামে আরও চার টাকা বেশী দিতে হয়। কাছারী থেকে হরিবোল কি-সব কাগজও এনে থাকে প্রত্যেক বছর। এ-বছর অজন্মা হয়েছে, ধান নেই তাই ছাগল বেচে চারটাকা সেদিন দিয়েছিল। বাকী টাকার জন্যে হরিবোলকে ধরে নিয়ে গেছে ওরা।

নবর বিশ্বাস হলো না। মাত্র এক বছরের ছয়টাকা খাজনা বাকীর জন্যে হরিবোলকে কেন ধরে নিয়ে যাবে তা বুঝতে না পেরে বললে—কাগজগুলোন এট্টী দেখাতি পার আমারে।

হরিবোলের স্ত্রী ছুটতে ছুটতে বাড়ী থেকে একটা বাঁশের চোঁঙা নিয়ে এলো। নব সেটা উপুড় করে কয়েকবার ঘা মারতেই তার ভেতর থেকে অনেকগুলো কাগজ বেরিয়ে এলো। সেগুলো খুলে একখানা একখানা করে পড়ে নব সাজিয়ে রাখলো পর পর। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে—কই, দাখলে তো একখানও নেই, সব যেন্ ফস্ কাগজ, তাতে মোটে তিনটাকা চারটাকা করে জমা আছে বছর বছর।

হরিবোলের স্ত্রী প্রতিবাদ জানিয়ে বললে—ক্যান্? গ্যালো বারে ধান বেচিলো দুই শলি, তার তামাম টাকা তো দেলে কাছারীতি। তার আগের বার, সেইযেন্ ও কাকা, সেই রাঙা গাই ব্যাচলে ধলো র বাবার কাছে দশ টাকায়। সে-টাকা ধরে দিয়ে আইলো কাছারীতি। তার আগের বার, সেই বড়ো তুফোন হলো যি-বার, সেই পাট ব্যাচলে—

নব মাথা নাড়িয়ে আস্তে আস্তে বললে—না, পুরো টাকা জমা নেই কোনো কাগজে, তা ছাড়া দাখলে কই। এতে কি হবে? আসল ঘরের মুষল কই?

শুধু হরিবোলের স্ত্রী নয়, সবাই ওরা উত্তর হারিয়ে বসে রইলো বারান্দায়।

দুপুরের একটু পরেই নব আর নবীন হরিবোলের স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে প্রতাপনগরের জমিদার কাছারিতে রওনা হলো। নিজের ছেঁড়া কাপড় ছেড়ে মাদারীর একখানা আস্ত শাড়ী পরে হরিবোলের স্ত্রী কাগজগুলো আঁচলের প্রান্তে খুব ভাল করে বেঁধে নিতে ভুললো না।

প্রকাণ্ড দীঘির পাড়ে জমিদার কাছারী রাস্তা থেকে অনেক উঁচুতে, যেন পাহাড়ের ওপর এক দুর্গ। চারি পাশে তার উঁচু পাঁচিল, কোথায় গিয়ে যে বাঁক ঘুরেছে বোঝা যায় না। দুটো দেউড়ী পার হয়ে তবে খাস কাছারীতে ঢুকতে হয়।

ওরা সোজাসুজি দেউড়ী পার হয়ে ভেতরের সিঁড়ি দিয়ে উঁচু কাছারীর বারান্দায় উঠলো। হরিবোলের স্ত্রী অতবড় কোঠা বাড়ী আর সুদীর্ঘ বারান্দা দেখেই ঘাবড়ে গেল। নবীন আর নবর মাঝখানে ঢুকে ফিস্-ফিস্ করে বললে—আস্তে আস্তে চলো কাকা।

খানিকটা দূর হেঁটে যাবার পর, যে-ঘরের সামনের বারান্দায় অনেক লোক বসে, সেখানে পৌঁছে ওরা দেখলে বাইরে যত লোক বসে আছে দরদালানে গিস্-গিস্ করছে তার চেয়ে অনেক বেশী লোক। সেই ঘরে ঢুকতেই একটা গুঞ্জন উঠলো ওদের দেখে। লোকগুলো নিজেদের মধ্যে কি-যেন বলাবলি করছে। দরদালান ছাড়িয়ে ওরা সোজা গিয়ে ঘরে ঢুকলো। নবীন আর নব সামনের দিকে তাকিয়ে গলায় গামছা দিয়ে মাটিতে উপুড় হয়ে প্রণাম করে বললে—পেন্নাম

হই লায়েব মশায়, পেন্নাম হই মউরী মশায়। বাঁ দিকে মাথা ঘুরিয়ে বললে—পেন্নাম হই প্যায়দা মশায়। ডান পাশে ফিরে বললে—পেন্নাম হই গিরামি গুরুজন।

ওরা ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো। কেউ ওদের বসতে বললে না এক বারও, এমন কি হরিবোলের স্ত্রীকেও নয়। বসতে বলা কৃপা করার সামিল, দাঁড়িয়ে রাখাই রেওয়াজ। তাছাড়া কথাবার্তা বলার আগে বসে পড়ার মতো বেয়াদবি আর নেই।

হেড মুহুরী নবীনকে বললেন—হেই নবে, তোর কি?

নবীন চমকে উঠে আবার প্রণাম করে বললে—এইগেন্ বড়বাবু, এইগেন্ ইনার জন্যিতি। হরিবোলের স্ত্রীর দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে রইলো সে।

কথা বলার আগে কোন টাকা পড়েনি দেখে প্রকাণ্ড খাটজোড়া ফরাসে সারিবদ্ধ দেবগণের মত উপবিষ্ট নায়েব মুহুরী সবারই নাক মুখ কুঁচকে উঠলো। কেউ কোন কথাই আর বললে না। নবীন তেমনি হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে রইলো।

নবীনকে অগ্রাহ্য করে নবর দিকে তাকিয়ে মুহুরী বললেন—তোর কি, নবা?

নব এগিয়ে গিয়ে আবার প্রণাম করে জোড়হাতে বললে—ওই ইনারই জন্যি।

তখনও গদীতে একটা পয়সা পড়লোনা দেখে হেড মুহুরী আর ওদের দিকে মনোযোগ দেবার প্রয়োজন বোধ করলেন না। মাটিতে বসা একজনকে বললেন—হেই ফুলচাঁদা, তোর কি?

ফুলচাঁদ প্রণাম করে উঠে গেল এবং গাঁট থেকে খুলে খাটের গদীতে দুটো টাকা দিয়ে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে রইলো।

নায়েব মশাই টাকা দুটো হাত দিয়ে ছুঁড়ে দিলেন। হেড মুহুরী

সে-টা তুলে নায়েব মশাইয়ের বাঁ পাশের কাঠের বাক্সের ডালায় ওপরকার লম্বা ছ্যাঁদা দিয়ে গলিয়ে দিলে।

ফুলচাঁদের হিসেব বার করে হেড মুহুরী বললে—কই, বাকি খাজনার টাকা ফ্যাল।

ফুলচাঁদ জোড়হাত কপালে আর বুকে ঠেকিয়ে বললে—আপনারা ভুস্বামী, মিছে কব না এট্টুউ, ইবারগেন্ বিষ্টি হয়নি, জল না পায়ে ধান মরে গ্যালো, ডাঙ্গা আর নিচের সগোল জমির।

হেড মুহুরী বললেন—হারামজাদা, তুমি মিছে কথা বলবার যায়গা পাওনি। নিচের জমির ধান মরে গেল? ভেবেছ জানিনে কিছু? গড়ের জমির ধান কি হলো?

ফুলচাঁদ অবাক হয়ে গেল। বললে—দুহাই আপনার, গেড়ে তো আমার কুমু জমি নেই।

হেড মুহুরী বেকুব হবার লোক নন। বললেন—নেই তো নেই, খালের মুখের জমির ধান?

—কন কি বড় কর্তা। খালের মুখিউতো আমার জমি নেই।

হেড মুহুরী এবার চেঁচিয়ে উঠলো—না থাকলেও আছে হারামজাদা। যা বলছি, কেবল নেই আর নেই! ফ্যাল্, টাকা ফ্যাল্।

ফুলচাঁদ কাঁপতে কাঁপতে বললে—দুহাই বড়বাবু, কয়ডা দিন সুমায় পিরাথোনা করি, ছাগলডা বেচে টাকা দিয়ে যাবো।

হেড মুহুরী মুখ ভেঙচে বললে—ছাগল বেচে! ছাগল বেচে তো হবে চার টাকা। তা দিয়ে চার বছরের খাজনা, সুদ, কাচারী, এ সব দিবি কেমন করে?

ফুলচাঁদ অবাক হয়ে বললে—দুহাই বড়কত্তা আমার বাকী তো নেই এক পয়সাও, গ্যালোবারযেন্ দামড়া গরু বেচে চার বছরের খাজনা-পাতি সবই শোধ দিয়ে গিইলাম।

নায়েব তো নায়েব, একবারে বাঘা নায়েব নিবারণ মুখুজ্জে। তিনি স্পষ্টই দেখলেন যে, ফুলচাঁদ শুধু প্রতিবাদই করে নি, কর্তৃপক্ষের কথা বেঠিক বলে প্রতিপন্নও করেছে। এমন অঘটন ঘটতে দেওয়া যায় না এতোসব প্রজার সামনে। যেভাবেই হোক এই প্রতিবাদকে স্তব্ধ না করে দিলে কাছারীর অখণ্ডনীয় মর্যাদা থাকবে না।

নায়েব মশাই ফুলচাঁদের কথায় খুব চটে গেলেন। উচ্চারণ করা যায় না এমন অশ্লীল ভাষায় তার মৃত মা আর বাবাকে উদ্ধার করে যেন আর সবাইকে উদ্দেশ করেই বললেন—জমিদারের কাছারীতে দাঁড়িয়ে ও বলেছে আমরা মিথ্যেবাদী। ও গুখেকোর ব্যটার সাহস দেখেচো।

নায়েব মশাইয়ের উষ্ণ কণ্ঠস্বরে দু'জন বরকন্দাজ লাঠি হাতে করে ভেতরে ঢুকে ফুলচাঁদের কাছে দাঁড়ালো। চাকরটা এসে তার ঘাড় ঝাঁকি দিয়ে বললে—অ্যাতো বড়ো আস্পদ্দা তোর, তুই কাচারীর মাটিতি দাঁড়িয়ে মিথ্যেপাদী বুলিস শালা।

ফুলচাঁদ কাঁপতে কাঁপতে বললে—সাত দুহাই আপনাগের, দুহাই লায়েব বাবা, দুহাই বড় বাবু, আমি মিথ্যেপাদী কই নি।

হেড মুহুরী এবার গর্জন করে উঠে দাঁড়ালেন—শালার শালা সুমুন্দির পো! তোর মার.........তোর গুষ্টির.........! নিশ্চয় বলেচিস্, আলবাৎ বলেচিস মিথ্যেবাদী। বলেছিসই তো যে, তুই খাজনা শোধ করেচিস। আমি খাতা দেখে বললাম চার বছরের বাকী, আর তুই বললি শোধ করে দিয়েচিস গেল বার। মিথ্যেবাদী বলা হলো না-তো পূজো করা হলো নাকিরে খানকির ছেলে!

ফুলচাঁদ ভয়ে ভীষণ ভেঙ্গে পড়লো। খাটের ওপর উপুড় হয়ে পড়লো দু'হাত জোড় করে।

খাট-শুদ্ধ কর্মচারীরা, বরকন্দাজরা, ঘরের আর সব চাকরবাকর

হৈ হৈ করে উঠলো। ঘাড়-ধরা চাকরটা ওর মাথার চুল টেনে ধরে বলতে লাগলো—শালার শালা সুমিন্দির ছবাল, তুই গদী পস্তো করিস্।

ফুলচাঁদ অভাবিত ঘটনার মধ্যে পড়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে জোড় করা দুই হাত ফাঁক করে হাউ-মাউ করতে করতে নায়েবের পা জড়িয়ে ধরে বলে উঠলো—রক্ষে করেন নায়েব বাবা!

নিচু জাতের হাত পায়ে ঠেকবার মতো অপমান সইবার পাত্র নায়েব মশাই নন। সমগ্র মহলের মধ্যে কাছারী এবং জমিদার বাড়ীর অখণ্ড-মর্যাদা রক্ষার কর্তব্য সম্পর্কে তিনি এমন সচেতন যে বসে বসেই বাঁ পা দিয়ে ফুলচাঁদের মাথায় সজোরে লাথি মেরে বললেন—কুকুরকে মুগুর না মারলে—। রাগে তাঁর গোঁপজোড়া ফুলে উঠলো।

বরকন্দাজরা তার চুল ধরে টেনে মেঝেয় ফেলে দিলে।

ফুলচাঁদ আহত হয়ে ডুকরে উঠলো—রক্ষে করেন, অ্যামোন কাজ আর করবো না, অ্যামোন কথা আর বলবো না—দুহাই—

হেড মুহুরী আবার গর্জন করে দাঁড়িয়ে উঠলো—গুখেকোর ব্যাটা, হারামজাদা, শালার শালা! কি ভেবেচিস তুই। অ্যাতোবড়ো আস্পদ্দা তোর, তোকে একেবারে......

বারান্দার আর দরদালানের প্রজারা ঘরের বাইরে ভীড় করে দাঁড়িয়েছে। কারো মুখে কথা নেই। নবীন, নব আর হরিবোলের স্ত্রী কোণের দিকে দেওয়ালের সঙ্গে মিশে আছে, ভয়ে তারা পাষাণ হয়ে গেছে যেন।

প্রজাদের উচিত শিক্ষা দিয়ে নিজেদের অন্যায় ঢাকবার এতবড় সুযোগ নষ্ট করা যায় না। তাই, সারা ঘরে হেড মুহুরীর গর্জন গম্-গম্ করে উঠলো আবার—অ্যাতোবড় সাহোস.........মিথ্যেবাদী বলিস......গদী পরশো করিস্......

জনতার ওপর আতঙ্কের ছায়া নামলো। প্রত্যেকেই নিজেকে নির্দোষ

প্রতিপন্ন করার কৌশল মনে মনে ঠিক করতে লাগলো এবং ফুলচাঁদের মতো অন্যায়কারীর উপযুক্ত শাস্তি কামনা করতে লাগলো। সেই সময় সবাই ভাবলে নায়েব আর মুহুরীই সত্যি কথা বলছে। তাদের মতো দেবতুল্য লোকদের নিজের হাতে লেখা খাতার ভেতর মিথ্যে কথা থাকতে পারে না—মিথ্যে কথা যদি কেউ বলে থাকে তো সে ফুলচাঁদ, এমন মিথ্যে কথা বলে প্রতিবাদ করে সে সর্বনাশা অন্যায় করেছে। শুধু কোণের দেওয়ালের গায়ে মিশে-থাকা নবীন, নব আর হরিবোলের স্ত্রীর মনে কাছারীর অন্যায় সম্পর্কে কোন সংশয়ই রইলো না। ওরা বুঝতে পারলে শুধু হরিবোলের ওপরই নয়, সবার ওপর একই কৌশলে দেনার ভার চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সেই জনতার মধ্যে তাকিয়ে তাকিয়ে হরিবোলের স্ত্রী খুঁজতে লাগলো তার স্বামীকে।

সন্ধ্যার একটু আগে ডাক পড়লো হরিবোলের স্ত্রীর। নবীন আবার হাতজোড় করে বললে—দ্যাখেন কত্তা, এই ইনারা গেন্ অ্যাক্কেবারে গরীব। তা ইনার স্বুয়ামী, ওইযেন্ আমাগের গিরামের সেই হরিবোল, তারেগেন্ ধরে আনাইছেন আপনারা। তাই ইনি আইচেন......

হেড মুহুরী বিরক্ত হয়ে বললে—হ্যাত্তোর শালার ভক্ত বিটলে। খালি হাতে এয়েচো গেরো আঁটতে? যা, যা—

কাজ হচ্ছে না দেখে নব এগিয়ে গেল হরিবোলের স্ত্রীর কাছে, কিছু আছে কি না জিজ্ঞাসা করলে। হরিবোলের স্ত্রী কোমরের খুঁটে যে সাড়ে বারোআনা বাঁধা ছিল তা থেকে বারোআনা বার করে নবর হাতে দিলে, আর দু'পয়সা বেঁধে রাখলে কোমরের আঁচলে জড়িয়ে জড়িয়ে এমন ভাল করে যেন মূল্যবান সম্পদ মহাযত্নে রেখে দিচ্ছে সংগোপনে।

নব দেখলে ব্যারো আনা পয়সায় কিছু হবে না। ও নিজের কোমরের গেঁজে থেকে আর চার আনা বার করে একটা টাকা পুরিয়ে হরিবোলের স্ত্রীর হাতে দিলে। তার কানে কানে বললে আলগোছে গদীর ওপর রেখে নায়েবকে দূর থেকে প্রণাম করতে।

হরিবোলের স্ত্রী তাই করলে। কিন্তু তাতেও নায়েব খুশী হলেন না বা কোন কথাও বললেন না, শুধু কৌটো থেকে একটা পান বার করে নিজের মুখে পুরে সেই অবস্থায় বড় করে হাই তুললেন। পাশের মুহুরীরা আর বরকন্দাজরা তুড়ি দিতে লাগলো হাই-তোলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত। হেড মুহুরী খক্ করে কাশি ফেললো মেঝেয় যেখানে প্রজারা ওঠে বসে।

উত্তেজিত হয়ে নব এগিয়ে গেল হেড মুহুরীর কাছে। মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে হাত জোড় করে বললে—গ্যাখেন বাবু, ইনার গেন্ খাজনা তো বাকী নেই। ইনারা গরীব মানুষ, দয়া করে অ্যাট্টা কিছু—

তখনও কাছারীতে কিছু কিছু লোক আছে। সেই দিকে চোখ বুলিয়ে নিলেন নায়েব আর হেড মুহুরী। হেড মুহুরীর হাতের কলম ঠক করে বাক্সের ওপর পড়ে গেল রাগে। কাঁপতে কাঁপতে সে উঠে দাঁড়ালো। নায়েব মশাইও একবার উঠে দাঁড়িয়ে বসে পড়লেন। নব তখনও হাত জোড় করে আছে।

চেঁচিয়ে উঠলো হেড মুহুরী—অ্যাঁই অ্যাঁই! যতো বড় মুখ নয় তত্তোবড় কথা। বাকী নেই খাজনা? বাকী নেই? আছে, আছে, আলবাৎ আছে!!

সবাই নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো আরও বড় ঘটনার প্রতীক্ষায়।

—গ্যাখা তবে দাখলে। হেড মুহুরী হুকুম করলো—কই গ্যাখা, গ্যাখা তবে।

নব বললে—দাখলে নেই।

—তবে টাকা বাকী নেই বললি কোন্ মুখে? জিভ টেনে ছিঁড়ে দেবো না! জুতো মেরে খাল খিঁচে দেব না!

অকস্মাৎ নবর জোড় হাত খুলে গেল। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললে—দাখলে আপনারা দ্যান নাই। দ্যান না তো কাউরে। আপনারা…

ঘরে যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। সবাই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার তীব্র কামনায় শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো একই যায়গায়।

—আরে, নব যে আমাদের অনন্তর ছেলে। শোন্ শোন্। বলতো, প্রজা আর মালিকের সম্পর্কের ভেতর দাখলে আর কাগজ দিয়ে কি হবে। তোর বাবা কি দাখলে নিয়েচে কোনদিন?

নবর উত্তেজনা নিভে গেল। কি বলবে ভেবে না পেয়ে শুধু বললে—যে আজ্ঞে নায়েব কত্তা।

নায়েব মশাই আবার বললেন—আমি রাজার প্রতিভু। রাজাও যা আমিও তাই। ভূস্বামীর সামনে মিছে বলতে নেই। তুই মিছে কথা নিশ্চয়ই বলিসনি এই ভূস্বামীর ঘরে দাঁড়িয়ে।

—আজ্ঞে না। নব বিশ্বেস মিছে বলে না, গদগদ হয়ে নব বললে।

নায়েব মশাই সুর আরও নরম করে চিনির সঙ্গে মধু মিশিয়ে বললেন—দাখলে যখন দেয়া হয়নি বলচিস্ তখন তোর কথাই মেনে নিচ্ছি। তুই আমাদের অনন্তর ছেলে। অনন্ত ছিল এই কাছারীর একটা বড় খুঁটি। সে এলে তাকে বসতেই বলতাম আমি। কতদিন যে সে প্রসাদ পেয়ে গেছে আমার বাড়ীতে তা তো তুই জানিস্ নে। হ্যাঁ, দাখলে না হয় না দিয়েচি। রসিদ তো দিয়েছি—কি বলিস্ দিইনি?

অতবড় কাছারীর বড় খুঁটিস্বরূপ পিতার নামে একান্ত গদগদ হয়ে নব বললে—আজ্ঞে হ্যা দেচেন। সে কথা নিশ্চয় বলবো। সে কথা অনন্ত বিশ্বেসের ছাবাল হয়ে—

এবার গলা দিয়ে মিছরীর সরবৎ ঢাললেন নায়েব—অনন্তর ছেলে না হলে এত সাহস কার হবে যে, কাছারী এসে আবদার ধরবে, হ্যা-হ্যা-হ্যা-। তুই যে আমাদের ঘরের ছেলের মত। তোর আবদার আমরা না রেখে পারি। কই দেখি রসিদগুলো।

নব হরিবোলের স্ত্রীর দিকে তাকালো। হরিবোলের স্ত্রী আঁচলের খুঁট থেকে কাগজগুলো অনেক ভাঁজ খুলে বার করে নায়েব মশাইয়ের পায়ের গোড়ায় আলগোছে রেখে দিলে।

নায়েব মশাই সেগুলো নিয়ে মোড়ানো মোড়ানো প্যাঁচ খুলে খুলে দেখলেন। তারপর হাই তুলে বললেন—এগুলো রেখে দিলাম আমরা। পরে তোর সঙ্গে কথা হবে। যদি দেখা যায় টাকা শোধ আছে, তাহলে দাখলে পাবে, নইলে কিন্তু নালিশ হবে বাপু, এ আমার সোজা কথা। এ শুধু তুই, অনন্তর ছেলে এসে আবদার ধরেছিস বলেই বললাম।

কাগজগুলো লোহার সিন্দুকে তুলে নায়েব মশাই আবার বললেন স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে—আচ্ছা, তা হলে এখনকার মত ব্যবস্থা কর্। মুহুরী মশাই।

এবার মুহুরীর পালা। নায়েব মশাইয়ের এই সূক্ষ্ম কৌশলে মনে মনে খুশীই হয়েছে সে। এবার একবার প্যাঁচ কষবে সে, দেখিয়ে দেবে কাছারীর ঝুলিতে কত ভানুমতীর খেল আছে। নবকে ডেকে বললে—হেই অন্তার ছেলে। শোন্, আর কি আছে দিতে বল ওকে।

নব আর নবীন আবার প্রণাম করলে। নব বললে—আজ্ঞে, বিশ্বেস করেন, আর কিচ্চুই নেই ওর কাছে। ওর সুয়ামিরে দয়া করে—

নবীন বললে—সেই সকাল বেলায় ধরে আনা হইচে হরিবোলরে। কিছু খাওয়া দাওয়া হয়নি তার—

—থাম হারামজাদা। ধরে আনালাম আর ছেড়ে দিলাম, এযেন মামার বাড়ীর আবদার। তবে, ধরে আনালাম কেনরে শালা?

হরিবোলের স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে হেড মুহুরী বললে—এদিকে আয়।

হরিবোলের স্ত্রী গদীর খাটের কাছে এগিয়ে গিয়ে জোড় হাতে দাঁড়িয়ে রইলো।

মুহুরী বললে—কি আছে পয়সা কড়ি? বের কর। এমনি এমনি জল বেরোয় না। ভাতার ঘরে ফেরাতে গেলে চাল চিঁড়ে চাই। কই দেখি—

হরিবোলের স্ত্রী তেমনি নীরবে ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলো।

রুখে উঠলো হেড মুহুরী—হেই মাগি, রূপ দেখাতে এসেছিস্ কাছারীতে। কৈ, কি এনেচিস্?

হরিবোলের স্ত্রী এবার ঘাড় নাড়লে দুপাশে, ডানহাত খানা উলটে দিলে—কিছুই আর নেই তার।

হেড মুহুরী উঠে দাঁড়িয়ে বললে—মিছে বলবার জায়গা পাস্নি হারামজাদা। কই দেখি তোর আঁচল?

হরিবোলের স্ত্রী কাঁধের ওপর থেকে আঁচল নামিয়ে দেখালে। যে কোণে কাগজ বাঁধা ছিল, সেই কোণে মোচড়ানোর ভাঁজগুলো আছে।

—দেখি, তোর গাঁট দেখি।

হরিবোলের স্ত্রী দু'পাশ ঘুরে কোমর দেখালো। গাঁট খুলে দেখালো, একটা তামাকপোড়া ভর্তি শামুক ছাড়া আর কিছু নেই।

হেড মুহুরী তুড়ি দিয়ে বলতে লাগলো—ঘুরে-ঘুরে, ঘুরে ঘুরে! আরে আরে, থ্যামটা নাচন, থ্যামটা নাচন! বা বেটী, বাঃ!

হেড মুহুরীর রসিকতায় গদীর ওপর হাসির কলরোল উঠলো। নবীন আর নবর এবং ঘরের ভেতর তখনও যে জনাকয়েক প্রজা ছিল তাদের মুখ অকস্মাৎ পাথরের মত নিথর হয়ে গেল। হরিবোলের

স্ত্রী লজ্জায় ভেঙ্গে পড়ছে, ঝড়-লাগা বাঁশের আগার মতো কাঁপছে। তাড়াতাড়ি সে আঁচল দিয়ে সারা অঙ্গ ঢাকতে গেল। ছোট আঁচলে তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে অঙ্গ ঢাকলো না। আঁচলের জোর টান খেয়ে ঢাকা যায়গাগুলো আরও আলগা হয়ে গেল।

—কাকের মত সেরেচিস দেখচি, সাফাই হাত তোর। হেড মুহুরী আবার বললে—দেখি, তোর খুঁট দেখি।

হরিবোলের স্ত্রী এবার ইতস্তত করতে থাকে।

—হারামজাদী, গুখেগোর বেটী, ভাতার নিতে এসেচিস্ কি—হেড মুহুরীর গর্জনে ঘর আবার কেঁপে উঠলো—কই দেখা, খুঁট দেখা।

হরিবোলের.স্ত্রীর সারা দেহমন অবশ হয়ে গেল। কি করতে হবে ভুলে গেল সব, তাড়া খেয়েই সে কোমরের খুঁট খুলে দেখালো। কিছুই নেই খুঁটের প্রান্তে। শুধু কোমরের কাপড়টা খুলে গেল মাত্র। সেই অবস্থায় কোমর চেপে সে দাঁড়িয়ে রইলো।

—শালি, হারামজাদি, খানকি! তোর......। তোর মার......। নিশ্চয় তলার খুঁটে রেখেচিস্, বার কর তলার খুঁট। গর্জন করে গদীর ওপর এক লাথি মারলে হেড মুহুরী।

ভয়ে চুরমার হয়ে গেল হরিবোলের স্ত্রী। কেঁপে ঘেমে তলার খুঁট দেখাতে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে তার পরনের কাপড় পড়লো খুলে। আর্তচিৎকার করে সেই খোলা কাপড় চেপে ধরে আহত শূকরীর মতো ছুটে পালালো হরিবোলের স্ত্রী ঘরের পেছন দরজা দিয়ে।

হেড মুহুরী হো-হো করে হেসে উঠলো। নায়েব মশাই-এর মুখখানা হাঁ হয়ে গেছে। সাপ-ল্যাজা গোঁপ ধনুকের মতো বেঁকে গেল তাঁর। চোখ দু'টো শিকারী কুকুরের মতো ধারালো হতে হতে থেমে গেল। তোবড়ানো গালের কোঁচকানো চামড়ায় রক্তিমাভা দেখা দিয়ে মিলিয়ে যেতে লাগলো।

ঘরের প্রজাদের বুকের ভেতর দিয়ে কে-যেন সদ্য বালি-দেওয়া গাছি-দা চালিয়ে গেছে। লজ্জায় আর অপমানে জ্বলছে সারা দেহমন, অথচ কথা বলে প্রতিবাদ জানাতেও ভয় পাচ্ছে তারা। হাত-পা নেড়েও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারছেনা পরস্পরের। প্রতিকারহীন অসহায়তায় পাথরের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো তারা মাটির দিকে মুখ করে।

ভেতর থেকে কান্নার রোল ভেসে এলো—ওরে তুমারে এ কী করেছে রে—এ—এ—এ……, এ কী-সব্বোনাশ করেচে রে-এ-এ-এ……

একসঙ্গে প্রজাদের সবারই অসাড় চেতনায় কে-যেন চাবুক মারলে। তারা জেগে উঠলো এক মুহূর্তে। পরস্পারের মুখের দিকে চকিত ভয়ার্ত দৃষ্টি তুলে চেয়ে দেখলে তারা। তারপর সারি বেঁধে পেছনের দরজা দিয়ে কান্নার দিকে এগিয়ে গেল।

ভেতর বাড়ীর উঠোনে সারি সারি গর্ত কাটা। বহু যুগ ধরে সেগুলো সেখানেই আছে। দীর্ঘকালের ব্যবধানে তার বাঁধানো শাণ চটে গেছে, চুণ শুরকীর ওপর ময়লা জমেছে। তারই ভেতর চৌদ্দ পোয়া দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তিন-চারজন লোক। হাতে তাদের ইট তুলে-দেওয়া। বারান্দার সিঁড়িতে একজন পশ্চিমা বরকন্দাজ বসে বসে খইনী টিপছে। তেলে পাকানো গাঁট উঁচু-উঁচু লাঠির এক প্রান্ত তার উরুর ওপর, আর এক প্রান্ত লম্বা হয়ে উঠোনে নেমে গেছে। সেখানে বসেই সে চ্যাঁচাচ্ছে হিন্দিতে—এ মাগ্‌গী, ছোড়্‌, ছোড়্‌, উসকো ছোড়্‌। নেহিতো লাঠি তেরি……

বউটা সমানে কেঁদে চলেছে চিৎকার করে হরিবোলকে জড়িয়ে ধরে। তার রুক্ষ চুল ছড়িয়ে পড়েছে সারা পিঠে, আঁচলখানা মাটিতে লুটাচ্ছে পেছনের দিকে।

লোকজন দেখে চৌদ্দ-পোয়া-দেওয়া লোকগুলো লজ্জায় অপমানে উপুড় হয়ে পড়েছে গর্তের ওপর। কান্নার আবেগে কাঁপছে তাদের দেহ।

লাঠি হাতে উঠে দাঁড়িয়েছে বরকন্দাজটা। সমানে হিন্দিতে হুঙ্কার দিয়ে চলেছে—খবরদার শালা আদমি! হট্‌ যাও! শালালোক তেরি মাইকো......তেরি বোহিনকো......

ততক্ষণে হেড মুহুরী এসে পড়েছে। সঙ্গে তার একপাল বরকন্দাজ, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লাঠি তাদের ঘাড়ে।

—এক পা এগিয়ে এসেছিস্‌ কি—! খুন করে ফেলবি ওদের।

হুঙ্কার ছেড়েই কাছারীর ভেতর ঢুকে গেল হেড মুহুরী, বরকন্দাজগুলো উঠোন দিয়ে ঘুরে প্রজাদের সামনে এগিয়ে গেল লাঠি উঁচিয়ে একসঙ্গে তারা চিৎকার করে উঠলো—ভাগো শালালোক, ভাগো—

প্রজারা পিছন হটতে লাগলো এক-পা এক-পা করে। বরকন্দাজরা বলছে—আউর হটো—আউর—

ভেতর থেকে হেড মুহুরী তখনও হাঁকছে—খুন করে ফ্যাল্‌! একটা একটা করে সাবাড় করে ফ্যাল্‌! হরিবোল আর তার স্ত্রী একসঙ্গে গলা মিলিয়ে কাঁদছে—ওরে বাবারে—

কাছারীবাড়ীর চারিপাশে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে ততক্ষণে।

তবু ওদের ছেড়ে দেওয়া হলো। হরিবোলকে ধরাধরি করে ওরা তিনজনে পালিয়ে এলো কাছারীবাড়ীর দেউড়ী পার হয়ে।

—কাকা এট্টু জল খাবো। ছাতি-ফাটা তৃষ্ণায় কাতরে উঠলো হরিবোল। হরিবোলের স্ত্রী আর নবীন তাকিয়ে রইলো নবর দিকে।

—তুমরা যাতি লাগো, আমি আসতিছি এক্ষোণি। বলেই নব ছুটে গেল বাজারখোলায়। বহু খোঁজা-খুঁজি করে চারটে আধশুকনো ডাব আর চার পয়সার বাতাসা কিনে ফিরে এলো।

হরিবোলকে গামছা পরিয়ে ধরাধরি করে ওরা স্নান করালো বড় দীঘিতে। নিজেরাও হাত-পা ধুয়ে এক যায়গায় বসলো গোল চক্র রচনা করে।

একটা ডাব জোড় থেকে খুলে নব ঘাটের রাণায় আছড়ে মুখটা ভেঙ্গে ফেল্‌লে, তারপর তুলে দিলে হরিবোলের হাতে।

ডাবের সবটা জল এক-নিঃশ্বাসে ঢক্‌-ঢক্‌ করে খেয়ে একটা আরামের শব্দ করে উঠলো হরিবোল। ফাটা ডাব থেকে জল গড়িয়ে পড়ে হরিবোলের মুখ গলা আর বুক ভেসে গেছে। হরিবোলের স্ত্রী আঁচল দিয়ে অতি পরিপাটি করে সেই ভিজে অঙ্গগুলো মুছে নিলে।

—ও কাকা, সেই কাগজগুলোন্? —কই দাও দিনি।

হরিবোলের স্ত্রীর তাগাদায় নবর মনে পড়লো, কাগজগুলো নায়েব মশাই তুলে রেখেছেন লোহার সিন্দুকে, আসবার সময় গোলমালের মধ্যে চেয়ে আনতে ভুলে গেছে সে। বললে—লায়েব-যেন্ তুলে রাখলে। বোদকরি দাখলে দেবে বুলে ওগুলোন লুয়ার সিঁন্দুকি রাখেচে।

বাতাসা-গোলা নারকেলের জল খেয়ে হরিবোল একটু সুস্থ হয়েছে এতক্ষণে। চিঁড়ে চিবুতে চিবুতে সে বললে—হ্যায়, যা কইচো কাকা, দাখলে দিবার জন্যি লায়েবের বুক চড়্-চড়্ করে ফাটে যাচ্ছে।

হরিবোলের কথার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটুকু বুঝতে ওদের দেরি হয় না একটুও। ওরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে—দাখলে নায়েব দেবেনা কিছুতেই।

শক্ত মানুষ বুলে তুমার হাতে দিলাম, আর তুমি কাকা সেগুলোন—

হরিবোলের স্ত্রীর কথা সত্যি। কাগজগুলো সে নবীনের হাতে দেয় নি, বিদ্যে-বুদ্ধি-ওয়ালা শক্ত মানুষ নবর হাতেই দিয়েছে। নবর মনে হলো সে-যেন বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে। দায়িত্ব পালনের অক্ষমতার গ্লানি দূর করবার উদ্বেগে সে উঠে দাঁড়ায়। তাড়াতাড়ি পা বাড়িয়ে বলে—তুমরা বসো, আমি দেড়োয়ে যায়ে সেগুলোন নিয়ে আসি।

নবীন তাড়াতাড়ি বলে—লোয়ার সিঁন্দুক আর আলগা হবে না মিতে মিছেমিছি মন খারাপ করবা না।

হরিবোল নির্লিপ্তের মত বললে—তুমি বসোদিন্ কাকা, ও নায়েব চন্দোরবোড়া সাপ—একবার যখোন গিলেচে, তখোন আর উগোরবে না।

নব সে-কথা জানে। কিন্তু নায়েব ওকে বোকা বানিয়েচে, ওকে ঠকিয়েচে, আপন কোঠায় পেয়ে ওর গালে চড় মেরেচে। সেই যন্ত্রণায় ওর সারা মন ছট্‌ফট্ করতে থাকে। তার ওপর হরিবোলের স্ত্রীর অনুযোগ ওকে আরও পীড়া দেয়। হরিবোলের স্ত্রী তবুও বলচে—তুমার পরে বিশ্বেস করে দিলাম, তুমি অ্যাতো বুঝাপড়া জানো—।

—থাম্, তুই থামদিনি। ধরা গলায় ধমকে ওঠে হরিবোল স্ত্রীর ওপর। নিশ্চিত অভিজ্ঞতায় পরিপক্ক লোকের মতো সে বলে—বুঝাপড়া, বুঝাপড়া! কত দ্যাকলাম বুঝাপড়া-লিখাপড়া-আওলা। কত বড়-মিয়া বগে ছোট-মিয়া হয়ে গেল কাচারী যায়ে, তার আবার—ও হলো যমপুরী, ও-সত্যিপীরির কাছে বুঝাপড়ার চুলকো-চুলকি খাটপে না।

হরিবোলের মুখ খুলে গেছে। সারাদিনের পীড়নের বেদনা কথা হয়ে ঝরে পড়তে লাগলো তার মুখ দিয়ে। চিবুতে চিবুতে থেমে থেমে ও বলতে লাগলো কেমন করে তাকে ধরে নিয়ে এলো বরকন্দাজরা সারা পথ ধাক্কা দিতে দিতে, কেমন করে তাকে পিঠ-মোড়া দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখলো নায়েবের সামনে, কেমন করে তার সারা অঙ্গ তল্লাসী করা হ'ল টাকার জন্যে, মাথা ঠুকে দেওয়া হল শানের ওপর আর কেমন করেইবা নাকে-খৎ দেওয়ানো হলো চার হাত লম্বা করে।

নব এসে বসে পড়েছে তার সামনে। হরিবোলের স্ত্রীর অনুযোগ থেমে গেছে। সে-ও ঘন হয়ে বসেছে। পাশের দিকে বসেছে নবীন।

হরিবোলের গলা ধরে যায়। দুঃখে তার চোখ দিয়ে জল পড়ছে। বাধো-বাধো গলায় সে আবার বলছে—মার খাতি খাতি গরুভ্যাড়াতেও খুঁটি দিয়ে দাঁড়ায়, শিং উঁচোয় ঘাড় নাড়ায়, বুঝলে কাকা। আমি-উ আর সহ্য করতি পারলাম না, চ্যাঁচায়ে উঠলাম—তুমার জুমাজমি

ফিরোয়ে গ্যাও লায়েব মশাই। লায়েব রুখে ওঠলে, ঘর-ভরা মানষির সামনে কি করলে জানো? আহত বুকের অংশটায় বাঁ হাত রেখে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। পাশে বসে স্ত্রীও তার ফুঁপিয়ে উঠলো। নব আর নবীনের মন যন্ত্রণার্ত হয়ে উঠলো নিষ্ফল আক্রোশে।

ওদের কারো মুখে কথা নেই। নিস্তব্ধ ঘাটের পাড়। দীঘির কালো জল শান্ত। চারিধারে ঘন অন্ধকার। উঁচু পাড়ে ঝাউ গাছগুলো অন্ধকারের মন্দির রচনা করে দাঁড়িয়ে আছে। ওপাড়ের আমগাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে স্তূপের মতো। মাঝে মাঝে এক-একটা মাছ লাফাচ্ছে অদ্ভুত শব্দ করে করে।

খেতে খেতে হরিবোল তখনও বলছে—সেই দুপোর রোদ্দুরি উঠোনের গত্তে চোদ্দপুয়া করে রাখে দেলে আমারে। পা উঠোবার জো নেই। নড়লিই সিপাইতি গুতো মারে লাঠি দিয়ে। আর শুধু কি আমি, সাগরকাঠির কেদার, চণ্ডীপুরীর পঞ্চা, এমনি আরও সাত আট জোনের। গুতোর চোটে—

আকাশ থেকে সাঁই-সাঁই শব্দ নেমে আসছে ঝাউ গাছের ভেতর দিয়ে মৃদু বাতাসের পিঠে চড়ে, যেন হাজারো মানুষ কেঁদে চলেছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। দীঘির ওপরকার সমগ্র ফাঁকা যায়গায় সেই ফোঁপানি ছড়িয়ে পড়েছে, যেন ছোট ছোট জলের ঢেউয়ে আহত হয়ে জেগে উঠেছে জড় জীবনের মর্মবেদনা।

একদল লোক নিয়ে কাছারীর বরকন্দাজরা ঘাটে এসে ঢুকলো। লোকগুলোকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে কাছারীতে। শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহভার টানতে টানতে অভিশাপ দিচ্ছে তারা। বরকন্দাজরা অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করছে। তারা ঘাটে নেমে জল খেলো, তারপর বসবার চেষ্টা করলো। বরকন্দাজরা ধাক্কা দিয়ে আবার তাদের ঠেলতে

ঠেলতে নিয়ে গেল যেমন করে কশাইরা গরু-ছাগলের পাল তাড়িয়ে নিয়ে যায় বড় শহরের দিকে। লোকগুলো আবার শাপ দিতে লাগলো। বরকন্দাজরা আবার বাপ-মা তুলে গাল দিতে লাগলো তাদের।

উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালো নব, ভয়ে কাঁপতে লাগলো হরিবোলের স্ত্রী। নতুন অত্যাচারের আশঙ্কায় কাঠ হয়ে গেছে হরিবোল। ক্রোধে চেঁচিয়ে উঠলো নবীন—অত্যেচার, এর চাইতি বড় অত্যেচার মানষির পরে মানষি করতে পারে না—

কান্না-জড়িত কণ্ঠে হরিবোলের স্ত্রী অভিশাপ দিতে লাগলো—ভগমান, এর ফল দিয়ো, দিয়ো দিয়ো—

নব রোষে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। দুই হাত তার মুষ্টি-বদ্ধ। স্থির চোখে তাকিয়ে আছে সে খেদিয়ে নিয়ে-যাওয়া অসহায় মানুষের পালের দিকে।

একটা বড় মাছ উথল দিয়ে উঠলো। কালো জলে আকাশের ছায়া ভেঙ্গে গেল সেই আঘাতে খান খান হয়ে।

থর-থর করে কাঁপছে হরিবোল। তাকে শক্ত করে ধরে রেখেছে নবীন। সেই দিকে তাকিয়ে অকস্মাৎ মর্মান্তিক কান্নায় দীঘির পাড় শোকাচ্ছন্ন করে তুললে হরিবোলের স্ত্রী।

নয়

রাজাপুরের নব বিশ্বাস এবার চড়কের দল করবে। চড়ক পুজো যে-সে কথা নয়, সবার কর্মও নয়—সেটা তাই নবর উপলক্ষ, গানের নামে দল বাঁধাটাই যেন আসল লক্ষ্য।

ছোট-ছোট ছেলেরা হবে সখী। যুবকদের কেউ হবে নন্দী আর কেউ হবে ভৃঙ্গী। একজন মহাদেব হবে, আর একজন হবে

গৌরী। পেছনে দাঁড়িয়ে দু'জনে বেহালা বাজাবে, আর দু'জনে বাজাবে বাঁশী, একজন বাজাবে খোল, আর একজন বাজাবে ঢোল। কাপড় আর চুল দাড়ি? সে চালিয়ে নেবে এক রকম করে। ভাসানের দলের চুল দাড়ি হলেই চলবে, কাপড় আর সখীদের ঘাঘ্‌রাও নেবে সেখান থেকে। পেছনে দাঁড়িয়ে জনাচারেকে দোহার দেবে আর একজন বই কি খাতা হাতে করে ছাতা মাথায় দিয়ে গান মনে করিয়ে দেবে। আর কাউকে পাওয়া না গেলে একাজটা নাহয় সে নিজেই করবে।

দল তৈরীর জন্যে নব শুধু নিজের গ্রামের ওপরই নির্ভর করে না, আশ-পাশের গ্রাম থেকেও গুণী-জ্ঞানী লোক সংগ্রহ করে। প্রথমে কেউ রাজী হতে চায় না, দুর্বৎসরে হাত আর গলা খুলবে না বলে ওজর আপত্তি করে। কিন্তু নব ছাড়ে না, দরকার বুঝলে সে পায়ে ধরেই বসে, কাজেই শেষ পর্যন্ত তারা রাজী হয়ে যায়। সখী সাজবার জন্যে জনা আষ্টেক ছেলে নিজের গ্রাম থেকেই নিয়েছে। নবর হাতে ছেলে ছেড়ে দিতে কারো আপত্তি নেই, তার ওপর প্রতিবেশীদের অগাধ বিশ্বাস। কিন্তু মাষ্টার কে হবে, শেখাবে কে? হ্যাঁ-হ্যাঁ নাউলীর অধর গায়েন, তার তো ব্যবসাই হলো গান শেখানো, বলতে গেলে জাত ব্যবসায়। তার ছিল ভাসানের দল, চড়কের দলও বরাবর সে করে আসছে। এবার সেই-ই শেখাবে রাজাপুরের নব বিশ্বাসের চড়কের দলকে।

খরা চৈত্রে কাজ নেই চাষীপাড়ায়। দুপুরে আর রাত্রে প্রাজ (রিহার্সাল) চলে নবর খালি ঘরে। নবর বুড়ো পিসী চোখ বুঁজে পড়ে থাকে এক কোণে। রাজাপুরের লোকেরা ছেলে বুড়ো আদি করে প্রাজ দেখে হাসে, খুসী হয়, কখনও বা বিরক্ত হয়। তারা মনে করে, দলটা নবর নয়, তাদের। তারা সানন্দে পান দেয় তামাক দেয়, তেল দেয় জল দেয়, কোন কোন দিন খেতে দেয়, শুতেও দেয়। এমনি করে নব একান্ত আপনার করে নেয় নিজের গ্রামটাকে।

প্রথম দিকে চলে গান আর নাচ শেখানো। ছোট ছোট ছেলেরা তাল মিলিয়ে পা ফেলে ফেলে নাচে আর গান গায়। ভাঙ্গা প্রাজ হয়ে গেলে জোড়া প্রাজ হয় নাচের আর গানের।

সারি বেঁধে সখীরা দাঁড়িয়েছে। তাদের গায়ে বহুযুগ আগের ছেঁড়া গাউন, ময়লা কোঁচকানো আর রঙ-ওঠা। গায়ে বড় হয়েছে বলে কোমরের কাছে ভাঁজ করে দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দেওয়া। বড় বড় গলাগুলো বুক দিয়ে নেমে যায় বলে পেছনটা খেজুরের কাঁটা বিঁধিয়ে সেফ্‌টিপিনের মতো টাইট করে এঁটে দেওয়া। পায়ে বেঁধে দেওয়া হয়েছে ঘুঙুরের মালা। মাথার পরচুলগুলো ঠিক মতো বসেনি, বেশী বড় বলে সরে সরে পেছন দিকে ঝুলে পড়ছে। তার ফাঁক দিয়ে মাথার তেল কুচকুচে আসল চুল বেরিয়ে এসেছে ঘামে আর তেলে মিশে। চোখে তাদের কাজল, মুখে খড়ির গুঁড়ো।

তাদের একপাশে গৌরী, আর একপাশে মহাদেব। গৌরীর দিকে ভৃঙ্গী, মহাদেবের দিকে নন্দী। মহাদেবের মুখে একটা প্রকাণ্ড সাদা দাড়ি। মাথার জটা পাওয়া যায়নি বলে, পাট কেটে জটা বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেই জটাগুলো ঝুলে পড়েছে পা পর্যন্ত। পরনে তাঁর বাঘ ছাল নয়, কালী দিয়ে ডোরা কাটা চট। তাঁর বাঁ হাতে একটা নারকেলের মালা, আর ডান হাতে একখানা ছোট কঞ্চির গোড়া। বাহুতে আর কব্জীতে তাঁর পাট বাঁধা, সারা গায়ে মুখে আর কপালে খড়ির ডোরা কাটা। কানে একটা ছোট্ট গাঁজার কল্কে। নন্দীর দশাও শিবের মতো, শুধু তফাত এইটুকু যে, তার হাতে একখানা মোটা পাটকাঠি, বোধহয় শিবঠাকুর নাচগানে ব্যস্ত থাকায় তাঁর ত্রিশূলখানা আইনত তারই হাতে গিয়ে পড়েছে। তার কানেও একটা গাঁজার কল্কে। গৌরীর পাশে ভৃঙ্গী, তার গায়ে কালী আর খড়ি দিয়ে ডোরা কাটা, হাতে একটা ঝোলা, বোধহয় গৌরীর ভ্যানিটীব্যাগ।

তা'থেকে গৌরী মাঝে মাঝে এক একটা বিড়ি নিয়ে ধরাচ্ছেন এবং আধ-খাওয়া করে ভৃঙ্গীকে দিচ্ছেন। পেছনের সারির মাঝখানে ঢুলী আর খুলী, আর তাদের হু'পাশে কর্তালী, তাদের হু'পাশে বেহালাদার আর তাদের হু'পাশে হুই আড়-বাঁশীয়াল। পায়ে তাদেরও ঘুঙুর। এই হুই সারির মাঝে স্মারক; তাঁর হাতে পৌরাণিক যুগের একখানা খাতা, গোড়ায় বাঁশের চটা ছ্যাঁদা করে দড়ি দিয়ে বাঁধা আর মলাটের ওপর বিড়ির প্যাকেটের রাধাকৃষ্ণের ছবি।

হঠাৎ গুড়্-গুড়্ করে ঢোল বেজে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে খোল কর্তাল, বাঁশী, বেহালা সব ঝন্-ঝন্ খন্-খন্ পুঁ-পাঁ শব্দে বেজে উঠলো। বাজনাটা জমে উঠতেই সবাই সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো—বো—ও—ও-ল্ শি-ই—বোল মহাদে-এ-এ-ব। সেই অবস্থায় সামনে ডান পা রেখে হাঁটু ভেঙ্গে বসে পড়লো তারা, তারপর পিঠ তুমড়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে 'বোল্ শিবোল মহাদেব' বলে চেঁচাতে লাগলো। তাদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে সমবেত নারীপুরুষ আর শিশুদের জনতা চেঁচিয়ে উঠলো 'বোল শিবোল মহাদেব' বলে, উপুড় হয়ে গাজনের দলের মতো করেই 'বোল শিবোল' বলতে লাগলো। লম্বা খোলা উঠোনে তারায় ভরা আকাশের তলায় সেই ভূমিষ্ঠ জনতার ওপর পড়তে লাগলো খড়ের চালে ঝোলানো লণ্ঠনের মৃদু আলো।

সেই আলোর আভায় তারা উঠে দাঁড়ালো এক সময়। চোখে তাদের বিহ্বল দৃষ্টি, মুখে অদ্ভুত ভঙ্গী। এক মুহূর্তে সবাই যেন বদলে গেছে, নিত্যদিনের সংসার ছাড়িয়ে যেন তারা এক নতুন দেশে এসে নতুন হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিচ্ছে, আর সমগ্র দেহমন সেই নতুনের স্বাদ নিচ্ছে একাগ্র হয়ে।

ডুম্ ডুম্ করে ঢোলক বাজলো আবার, আবার বাজলো খোল, কর্তাল, বাঁশী, বেহালা। পায়ে পায়ে তাল উঠলো ঘুঙুরের। স্মারক সখীদের কানের কাছে মুখ নিচু করে চেঁচিয়ে উঠলো—

(ও) শিবো গেলেন বিভা করিতে……

(ও) গিরি পুরিতে……

সখীরা সামনে পা বাড়িয়ে দুহাতে ছেঁড়া ন্যাকড়ার রুমাল তেরছা করে ধরে চোখে দৃষ্টি হেনে গেয়ে উঠলো—ওশিবো-ও-ও……

ওরা গাইলে কেমন করে শিব গিরিপুরে বিয়ে করতে গেলেন বাঘছাল পরে গলায় সাপ জড়িয়ে একহাতে ত্রিশূল আর একহাতে ডমুরু নিয়ে ষাঁড়ের পিঠে চড়ে। সঙ্গে তাঁর নন্দী ভৃঙ্গী আর সহস্রকোটী ভূত প্রেত পিশাচ। গিরিরাজ পর্বতের চূড়ায় উঠে দেখলেন সেই প্রলয়কাণ্ড। মেয়েরা ভয় পেয়ে ঘরে দরজা বন্ধ করলো। জামাই বরণ করতে গিয়ে গৌরী-জননী হায়-হায় করে উঠলেন—এ কী করেছিস্ মা, কার গলায় মালা দিয়েছিস্ তুই। কিন্তু শিব হলেন শান্ত সুন্দর, তাঁর হাসিতে সবার বুকে আনন্দের ঢেউ খেলে গেল। শুভলগ্নে বিয়ে হলো। ভূত প্রেত পিশাচের নৃত্যে আর সঙ্গীতে নগধিরাজের পার্বত্যভবনে মধুরাত্রি নেমে এলো।

বোল শিবোল মহাদে-এ-এ-এব্……

ওদের সঙ্গে সঙ্গে তন্ময় জনতা সমবেত কণ্ঠে উল্লাস ধ্বনি করে উঠলো—বোল শিবোল মহাদেব। বাজনার যন্ত্রগুলোয় একসঙ্গে জলদি তালে বোল উঠলো, পায়ের নূপুর আর ঘুঙুর দ্রুত তালে ঝুমুর-ঝুমুর ছন্দ তুললো। আকাশ বাতাস ভরে উঠলো শব্দ ঝঙ্কারে। জনতার বুকে উল্লাসের আলোড়ন তুলে সেই ঝঙ্কার বাতাসের পিঠে ভর করে ছড়িয়ে পড়লো সারা গ্রামে, গ্রাম ছেড়ে গ্রামান্তে, দিগন্তহীন বিলের পারে। অর্ধনগ্ন সেই বিমুগ্ধ জনতা মাটির কথা ভুলে গেল, গতিশীল ঝঙ্কারের বিলীয়মান শব্দের দিকে কান পেতে তাকিয়ে রইলো নক্ষত্রখচিত আকাশে। ওদের নবজাগ্রত কল্পনার আলোকে ভেসে উঠলো গিরিপুরী, যার মিলনানন্দে বিভোর শিবনৃত্যের ছন্দ থেকে

উৎসৃত হয়ে মাটির বুকে আনন্দের ধারা নেমে আসছে ওদের হৃদয়ের পথ বেয়ে অবিরল ধারায়।

চাষীদের গ্রামে ওরা নাচগান দেখিয়ে বেড়ায়। চাষীদের ছেলে মেয়েরা ভুলে গেল নাওয়া খাওয়া। এক বাড়ী থেকে আর এক বাড়ী, এক পাড়া থেকে আর এক পাড়ায় যেতে লাগলো গাজনের দলের পেছনে পেছনে। বউরা সব শিশু কোলে নিয়ে পাড়া প্রতিবেশীদের বাড়ী বাড়ী গান শুনে বেড়ালো। পুরুষরা জটলা পাকিয়ে পাকিয়ে ঘুরে বেড়ালো এক বাড়ী থেকে আর এক বাড়ী। মেয়েরা ঘর থেকে কুলো ভরে চাল দিলে, সুপুরী দিলে, বেগুন আর লাউ দিলে, ছ'একটা পয়সাও মিললো কোন কোন বাড়ী থেকে। গাজনের দল গ্রাম ছাড়লে ছেলেদের দল গ্রামের সীমান্তে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলো চলন্ত সারির দিকে। যখন আর দেখা গেল না তখন গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে তাদের মনে হলো জীবনের সব আনন্দই যেন গাজনের দলটা তাদের গ্রাম থেকে কেড়ে নিয়ে চলে গেল, গ্রামের পুরোনো মাঠের আর জঙ্গলের জীবনটা যেন মিছে হয়ে গেছে তাদের।

সাতভিটেয় গিয়ে গাজনের দল সেদিন আস্তানা গাড়লো।

নবীনের বাড়ীতে সকালের খাওয়া-দাওয়া সারবার জন্যে তারা ধড়াচূড়া খুলে ঘরের ভেতর রাখলো। খাওয়া-দাওয়ার পর সখী সাজবার জন্যে বড় ছেলেটা পোষাক আনতে গিয়ে দেখে দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। দরজা খুলতে বললে ভেতর থেকে উত্তর এলো—হেই ফাজিল ছ্যামড়া, যা—তোর অধিকারীরি পাঠাগে যা। ছেলেটাকে উদ্দেশ করে কথাটা এমন জোরে বলা হলো যে বারান্দায় আর উঠোনে বসে যারা

পান খাওয়া আর তামাকের ধোঁয়া ওড়ানোতে মনোনিবেশ করেছিল তারাও উৎকর্ণ হয়ে উঠলো। ছেলেটা ফিরে এসে কথাটা তাদের বললে একে একে ঢুলী গেল, খুলি গেল, নন্দী গেল, ভৃঙ্গী গেল, শেষ পর্যন্ত স্মারক গেল, হাতজোড় করলো, অনুরোধ করলো, অনুনয় বিনয়ও করলো, কিন্তু খুললো না! ভেতর থেকে সেই এক কথা, অধিকারীকে চাই, ফাঁকি হরগৌরীর বিয়ে আর চলবে না—আসল গৌরী কবে আসবে সেটা আজ ঠিকমত না জানলে দরজা তারা কোন মতেই খুলবে না।

নব কথাটা শুনে অনেকক্ষণ গম্ভীর হয়ে বসে বসে তামাক ফুঁকছিল আর মাঝে মাঝে—এসব তামেসা ভাল হচ্ছেন না কিস্তুক—বলে রোথ-রাথ্ দেখাচ্ছিল। তার ফলে ঘরের ভেতর থেকে ভয়ের আঁৎকানির পরিবর্তে হাসি আর পাল্টা জবাব আসতে লাগলো—শিব আলেন শ্মশানেত্তে ধুতরো মাথায় দিয়ে, গাঁজার কলকে কানে দিয়ে করতি গ্যালেন বিয়ে—প্রভৃতি নানারকম ফোড়ন সহযোগে।

স্মারক মশাই ব্যর্থ হওয়াতে নব রেগে গেল এবং ছুটে বারান্দায় উঠে দরজায় ধাক্কা মেরে বললে—দরজা খোলো কিস্তুক, না'লি—

ঘরের ভেতর থেকে জবাব এলো—লাফে আসে ঝাঁপে যায়, তারে মারিচি নালির ঘায়।

নব অসহায় ভাবে কি করবে বুঝতে না পেরে মাদারীকে ডেকে উঠলো—ও মিতেনি, বুল তুমিউ কি মরিচো নাকি?

ঘরের ভেতর খিল্-খিল্ করে হেসে উঠলো মেয়েরা। নবর মনে হলো একদল ডাকিনীই বোধহয় আক্রমণ করেছে তাকে।

মাদারী বললে—কি করবো মিতেন কও। ইরা কিরে করেছে—আসল গৌরী কবে আনবা তুমি সিডা ঠিক করে না বুললি দরজাও খোলবে না, সাজগোজও দেবে না।

নব রোখ দেখায়—হ্যায়, যা বুলিচো আর কি। আসল গৌরী নাতো অ্যাকেবারে রাজকন্থে ধরে আনবানে। খোলো খোলো, দুয়োর খোলো, না হলি কিন্তুক—

—ঠিক বুললে তো, ও মিতেন? তিন সত্যি করো কিন্তুক।

অসহায় নব তিন-সত্যি করে—হ্যায় তো, বুললামই তো। বুললাম, বুললাম—

হঠাৎ দরজা খুলে যায় আর মেয়েদের দল দরজার দু'পাশে সরে যায় দু'ভাগ হয়ে। নব তড়াং করে লাফিয়ে ঘরে ঢুকেই হকচকিয়ে হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে গেল। পেছনে তার তৎক্ষণাৎ দরজাটাও বন্ধ হয়ে গেল তাকে না জানিয়েই। মেয়েদের দল ঘিরে ধরলো নবকে। মেজগিন্নির হাতে শিবের দাড়িটা, উল্টো করে ধরে সে দোলাচ্ছে সেটা, কানে তার গাঁজার কল্কেটাও। হরিবোলের বউ-এর এক হাতে গৌরীর ভ্যানিটি ব্যাগ, আর এক হাতে মহাদেবের ত্রিশূল, সেই পাটকাঠিটা। কেষ্টর বউ শিবের জটাটা মেজগিন্নির মাথায় পরিয়ে দিলে। ভীমের বউ চট করে নবর মাথায় পরিয়ে দিলে গৌরীর চুলটা। নব সেটা খোলবার জন্যে হাত উঁচু করবার আগেই মাদারী 'এসব হচ্ছে কি' বলে এমন করে নবকে ধাক্কা দিলে যে সে পাক খেয়ে মেজগিন্নির ঠিক বাঁ পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে টাল সামলাতে লাগলো। চন্দোরের বউ শিবের মালাটা ঠক্-ঠক্ করে বাজাতেই সবাই একসঙ্গে উলু দিয়ে উঠলো আর সব ঢোল খোল কর্তাল বাঁশী বেহালা একসঙ্গে দিলে বাজিয়ে। নব আর মেজগিন্নি দু'জনের দিকে দু'জনে রোষকষায়িত লোচনে তাকিয়ে কেউটে সাপের মত ফুঁসতে লাগলো। দেখে মেয়েরা একসঙ্গে 'বোল শিবোল মহাদেব' বলে চেঁচিয়ে উঠলো।

মাদারী দরজা খুলতেই নব হ্যাঁচকা টান দিয়ে মেজগিন্নির মাথা থেকে শিবের জটাটা কেড়ে নিয়ে লাফিয়ে বাইরে গিয়ে পড়লো।

মেজগিন্নিও ছাড়োন-বান্দা নয়, নবর মাথায় পরিয়ে-দেওয়া গৌরীর চুলের আগাটা সে ধরে ফেলেছিল, নব বাইরে পড়তেই সেটা রয়ে গেল মেজ-গিন্নির হাতে। মেয়েরা আবার হেসে ভেঙ্গে পড়লো। বাইরে কারও বুঝতে বাকী নেই ব্যাপারটা, উঠোনেও তাই হুটোপুটি কাণ্ড বেধে গেছে।

নব সেদিন সারা দিন-রাত্রি ধরে মেজগিন্নির দুটো বড় বড় চোখ দেখতে লাগলো, পথেঘাটে মাঠেবাটে গাছপালা পশুপাখী দেখে মনে হতে লাগলো সারা দুনিয়ায় বসন্ত নেমেছে, রোগা রোগা মানুষ গরু দেখে সব-কিছু দিয়ে ফেলবার ইচ্ছে হতে লাগলো তার অদম্য। মেজগিন্নিও নবর উত্তেজিত মুখের কথা মনে করে আপন মনে ফিক্-ফিক্ করে হাসতে লাগলো দুপুর-সন্ধ্যে-রাত্রি ধরে, যেখানে-সেখানে এমন কি শুকনো খালের বুকেও ফুলের গন্ধ পেতে লাগলো, আর পাতিকাকগুলোর সামনে একমুঠো ভাত ছড়িয়ে দিলে।

চড়কের আর দেরি নেই বেশী দিন। দিন চারেক গাজন গেয়ে গেয়ে চাল পয়সা সংগ্রহ, দিন দুই পূজোর তোড়জোড় আর একদিন খেজুর ভাঙ্গা, সন্ন্যেসী পারণ, আর একটা দিন অন্তত হাতে রাখতে হয়। এই সব পরামর্শ করে নব তার দল নিয়ে চৈত্র সংক্রান্তির দিনসাতেক আগেই প্রতাপনগর আর ঢাকুরেয় গেল।

যাবার পথে ভগীরথ অনেক গল্প করলো। প্রতাপনগরের বাবুদের বাড়ী থেকে গাজন গানে কোন্-কোন্ দলের কোন্-কোন্ বার কতটা করে সিদে আর টাকা আদায় হয়েছে তার প্রত্যক্ষ বর্ণনা দিয়ে বললে যে, মুখুজ্জে বাড়ী আর বাঁড়ুজ্জে বাড়ী, চক্কোত্তি বাড়ী মিত্তির বাড়ী আর ঘোষ বাড়ী, মনে রাখতে হবে এই কয় বাড়ীর কথা—এখেনে যে-সিধে পাওয়া যাবে তা' বয়ে আনতেই গরুর গাড়ী লাগবে, আর টাকা পয়সার তো কথাই নেই। তাছাড়া মিত্তির বাড়ী

আর বাঁড়ুজ্জে বাড়ীর বউদের নজর একবার যদি ধরে যায় তো—কি-যে হবে বাকীটা আর ভগীরথ বলতে পারে না। ভগীরথ সারা জীবন প্রতাপনগরে থেকে এসেছে, ভদ্রপাড়ার হালচাল সম্বন্ধে সেই-ই একমাত্র প্রামাণ্য ব্যক্তি, কাজেই নতুন চড়ক-পুজারী নবর মনটা নিশ্চিত আশায় ভরে ওঠে। আর কিছু না হোক পূজোর খরচটা উঠলেই হলো, সন্ন্যাসী ভোজনটা সে নিজের গাঁ থেকেই না হয় চালিয়ে নেবে।

প্রতাপনগরে ঢোকার মুখেই গাজনের দল এমন অভ্যর্থনা লাভ করলো যে সেটাকে উপলক্ষ করে নবর জীবনের গোটা চেহারাটাই যেন পাল্টে গেল।

ওরা গ্রামে ঢোকার আগে মাঠের শেষে রাস্তায় বসে যথারীতি সাজগোজ করে একেবারে তৈরী হয়ে নিয়েছিল, যাতে আজ্ঞামাত্র কোন বাড়ীতে নাচ-গানে কোন ব্যাঘাত না হয়। মাঠের ধারে তেমাথায় যেখানে গ্রামে ঢোকবার বড় রাস্তা থেকে অন্য গাঁয়ে যাবার ছোট রাস্তাগুলো বেরিয়ে গেছে তারই সামনে উদ্ধব ঘোষদের বাগ বাগিচা। উদ্ধব ঘোষের মেজ-ভাগ্নে ডাঃ পি. কে. ভোস্ ডি. এম. টি (হাতুড়ে)-এর মধ্যম ভ্রাতা, যার বিয়ে ভেঙ্গে গেছে এবং হাতেও কোন কাজ নেই, গাঁয়ের গুণ্ডা ছেলেদের সর্দার, সেই বল্টু ওরফে চাষীদের মেজবাবু, সদলবলে সেই সাত-সকালে মামার নারকেল বাগানে পড়ে কাঁদি-কাঁদি সবুজ ফল সহযোগে প্রাতঃরাশ সমাপন করছিলেন আর নানাবিধ সুমধুর সুশ্লীল আলাপনে মাতুল কুলের নারিকেল বাগান বুঝি ভেঙ্গেই ফেলছিলেন। নারকেল ভক্ষণ প্রায় সমাপ্ত হয়ে গেছে, এমন সময় গাজনের দল পড়লো তাঁদের সম্মুখে। এই সুযোগে বল্টুবাবু নারকেল বাগানে অভিযান ছেড়ে দিয়ে সমগ্র চাপটাই ছেড়ে দিলেন সেই হতভাগ্য গাজনের দলের ওপর।

ওদের দেখেই বল্টুবাবুর দল লাফিয়ে উঠলো—ইরি-বিরি-কিরি, ইরি-বিরি-কিরি—হেঁইয়ো। তারপর ছুটে গিয়ে পথ আগলে দাঁড়ালো। গাজনের দলটা তামাসা হচ্ছে ভেবে দাঁড়িয়ে গেল খুশী মনে। কিন্তু পরক্ষণে বল্টুবাবু সখী-সাজা ফর্সা ছেলেটাকে সজোরে চেপে ধরলেন নিজের বুকে। ছেলেটা ভয়ে চেঁচিয়ে উঠতেই "আরে ধ্যেস্, রসো-ভঙ্গ করিস্ ক্যানো" বলে টান মেরে ছেলেটার বুকের ওপরকার গাউনটা ফ্যাঁৎ-ফ্যাঁৎ করে ছিঁড়ে দিলেন। নেতার এহেন নতুন ধরনের লীলা খেলায় হাততালি দিয়ে "হো-হো" করে হেসে উঠলো বল্টুবাবুর দল। সঙ্গীদের উল্লাসী অভিনন্দনে অধিকতর উৎসাহিত হয়ে বীরত্বের পরিমাণটা আরও আশ্চর্যজনক ভাবে বৃদ্ধি করবার উদ্দেশ্যে বল্টুবাবু ছেলেটির তুলতুলে গালটা দাঁত দিয়ে নখ দিয়ে এমন জোরে টিপে-খুঁড়ে-হেঁচড়ে নিলেন যে, কেটে কেটে রক্ত বেরিয়ে এলো দর-দর ধারায় তার সারা মুখ বেয়ে। তাঁর দেখা-দেখি দলের আর ক'টি মহাবীরও পালাক্রমে অন্য সখীগুলোকে বুকে চেপে, গাউন ছিঁড়ে মুখ কেটে ক্ষতবিক্ষত করে দিলে। সখী-সাজা ছেলেগুলো ভয়ে কেঁদে উঠলো হাউমাউ করে।

আকস্মিক ক্রোধে নব জ্ঞানহারা হয়ে যায়। সামনে লাফিয়ে পড়ে সে চেঁচিয়ে উঠলো—খবদ্দার বুলতিচি কিন্তুক, খবদ্দার!

আর যাবে কোথায়! বল্টুবাবু 'শুয়ারকা বাচ্চা' বলে এক হাত দিয়ে ধরলেন নবর গলা আর এক হাত দিয়ে ধরলেন তার চুল। দলের আর ছেলেগুলো তাকে ঠেলতে ঠেলতে গাজনের দল থেকে বা'র করে নিয়ে গেল। যার গায়ে যত জোর ছিল, তাই দিয়ে মনের সাধে তারা নবর দেহটা তছনছ করে দিলে। তারপর দু'খানা ডাবের খোলার ছোবড়ায় গেরো বেঁধে নবর গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে 'হনু যাবেন শ্বশুর-বাড়ী সঙ্গে যাবে কে' প্রভৃতি শ্লোক পড়ে আবার হাততালি দিয়ে

হেসে উঠলো। ভগীরথ কি যেন প্রতিবাদ জানাতে যাচ্ছিল। ফলে সেও রেহাই পেলে না, যথোপযুক্ত লাঞ্ছনার পর তার গলাতেও নারকেলের মালা ঝুলিয়ে 'ওরে দাদা জাম্বুবান, নাচো দেখি নাচোরে' বলে গান করে হাত তালি দিয়ে হেসে গাজনের দলকে কিছু ভাববার অবকাশ না দিয়েই বল্টুবাবুরা জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

নব সারা জীবনে এত বড় অপমান ভোগ তো করেই নি, এমন কি স্বপ্নেও কোনদিন কল্পনাও করতে পারে নি। সারা দেহ তার বিদারণমুখী রোষে চৌচির হয়ে ফেটে যেতে চাইলো। আঘাতে ফুলে-ওঠা মুখখানা তার রক্তের চাপে আগুনে-তাতা লোহার মত ডগ্-ডগ্ করতে লাগলো। চিৎকার করবার চেষ্টায় সে-মুখখানা আরো বীভৎস হয়ে উঠলো রোদের আভায়। নবর মনে হলো যদি তার এতটুকু ক্ষমতা থাকতো, সেই মুহূর্তে বোধকরি সে উন্মত্ত শিবের মত তাণ্ডব ঘটিয়ে বিশ্বজগৎটা ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলতে পারতো। কিন্তু সে কিছুই করতে পারলো না, অনেকক্ষণ ধরে রোদের ভেতর নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলো এবং অকস্মাৎ এক সময় দু'হাত দিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে-থাকা লাঞ্ছিত ভগীরথকে জড়িয়ে ধরে হু-হু করে কেঁদে উঠলো।

ওরা যখন উদ্ধব ঘোষের বা'র বাড়ীর উঠোনে গিয়ে দাঁড়ালো ঘোষ মশাই তখন বাইরের ঘরে রামলোচনের সঙ্গে লক্ষ্মণ মণ্ডলের সবেমাত্র দেওয়া টাকা কিভাবে উশুল হবে তাই নিয়ে ব্যস্ত।

নব বিস্ময়ের সঙ্গে অনুভব করলো তার মনে আজ এক দুর্জয় সাহস এসেছে, দেহে এসেছে সাত অসুরের বল। গাজনের দলকে ঠিকমত দাঁড়িয়ে রেখে সে লাফিয়ে ঘোষ মশাইয়ের বাইরের ঘরে প্রবেশ করলো এবং সোজা ঘোষ মশাইয়ের সামনে দাঁড়িয়ে ঘোষ মশাইয়ের মাননীয় 'ঘোষকর্ত্তা' সম্বোধন বাদ দিয়ে ডাকলো—ঘোষ মশায়, ও ঘোষ মশায়।

ঘোষ মশাই দেখলেন গলায় নারকেলের মালা দোলানো নবকে। মনে করলেন কোন তামাসা হচ্ছে বোধহয় বহুরূপীর মতো, অন্তত তার সম্বোধনের সঙ্গে মিলিয়ে সেইটাই সম্ভব বলে মনে হলো তাঁর। পরিহাস-তরল হাসিতে মুখ তুলে তিনি কি বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় নব ধমকে উঠলো—কানে কম শোনেন নাকি, বাইরি আসেন, গ্যাখেন।

ঘোষ মশাই এমন হুকুম চাষীদের মুখ থেকে পাননি কোনদিন, পাবার কল্পনাও করেন নি। তিনি চেয়ে দেখলেন নবর মুখের দিকে এবং এইবার তিনি দেখলেন লাঞ্ছিত উদ্ধত একখানি মুখ দৃঢ়তায় দুঃসহ হয়ে স্থির হয়ে আছে ঠিক তাঁর মুখের ওপরেই দৃষ্টি ফেলে। কি করবেন ভাববার আগেই নব দৃঢ়কণ্ঠে হুকুম করলে—এখনো বসে থাকলেন, উঠে আসেন বুলতিছি।

বাবার মৃত্যুর পর জীবনে এই প্রথম এক অনস্বীকার্য নির্দেশ অনুভব করলেন উদ্ধব ঘোষ এবং চিরদিনের বাধ্য কুকুরের মতো সেই মহামানী উদ্ধব ঘোষ নবর পেছন পেছন উঠে গেলেন বাইরে ঘরময় চটি জুতোর ফটাংফটাং শব্দ তুলে কোমরের কাপড় ঠিক করতে করতে।

উদ্ধব ঘোষ কোমরে কাপড়ের খুঁট ঠিক করতে করতে বারান্দার ধারিতে দাঁড়ালেন, নব দাঁড়ালো পৈঠের ওপর। সেখেনে দাঁড়িয়ে নব হুকুম করলে—গ্যাখেন উরগে, চায়ে গ্যাখেন—

উদ্ধব ঘোষ দেখলেন। স্বচক্ষে তিনি দেখলেন সখীদের বুকের গাউন ছেঁড়া, দেখলেন তাদের ক্ষত-বিক্ষত মুখ। দেখলেন ভগীরথের গলায় নারকেলের মালা ঝুলছে, সর্বাঙ্গে তার লাঞ্ছনার চিহ্ন। নবর দিকে চাইলেন তিনি ভাল করে, তার গলাতেও ঝুলছে নারকেলের মালা, মুখের আহত মাংস ফুলে উঠে চোখ ঢেকে যাবার মতো হয়েছে। আবার তিনি সারিবদ্ধ লাঞ্ছিত লোকগুলোর দিকে চাইলেন এবং দেখলেন তাদের লাঞ্ছনায় বিবর্ণ মুখে রোদ পড়েছে। নবর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলেন তিনি।

বুকের মধ্যে আজ যে দুঃসাহসী দৈত্য জেগে উঠেছে তারই ভাষায় জিজ্ঞাসা করলে নব—কি করতি চান আপনারা ?

ঘোষ মশাই কি বলতে যাচ্ছিলেন। নব বাধা দিয়ে চেঁচিয়ে ল —মানুষরি আর মানুষ বুলে মনে হয় না আপনারগে, না? বিনি কারণে এই লোকগুলোনরে এই অপমান ক্যানো করলেন, আর অ্যামোন অত্যোচারই বা কিসির জন্যি ?

নবর দুঃসাহসী আক্রমণ প্রতিরোধের সহজাত প্রবৃত্তিবশে অকস্মাৎ জেগে উঠলেন উদ্ধব ঘোষ, দুর্ধর্ষ বিত্তবানের অভ্যস্ত বুদ্ধি দিয়েই উদ্ধব ঘোষ অনুভব করলেন, ঘুমন্ত কেউটের লেজে পা দেওয়া হয়েছে আজ। চোখের ওপরই দেখলেন তিনি কাল কেউটের উদ্যত ফণা—চোখে তার ক্রূর দৃষ্টি, হলদে খড়মের দাগওয়ালা সেই ফণাটা দুলছে ডাইনে আর বাঁয়ে, লক্-লক্ করে জিভ দুটো বেরিয়ে বেরিয়ে আসছে। বুকের ভেতর শির্-শির্ করে উদ্ধব ঘোষের।

ওদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে জবরদস্ত তালুকদার আর অতি ধূর্ত মহাজন পরিপূর্ণ সজাগ হয়ে উঠলো উদ্ধব ঘোষের মধ্যে। সাপুড়ের বাঁশী মুখে দিয়ে অতি নাটকীয় কৌশলে তিনি বাজিয়ে উঠলেন —নব! ওরে নবরে! এ দৃশ্য আমার সহ্য হয় না আর! একবার শুধু বলে দে—কে! কে করেছে এই পশুর কাজ, আমি বলছি, সে যেখানেই থাক আর যত বড়ই হোক, উদ্ধব ঘোষের শাস্তি থেকে তার রেহাই নেই। উদাত্ত স্বরে বলতে বলতে সুবিচারের প্রবল ইচ্ছায় উদ্ধব ঘোষের চোখ-মুখ মহারাজ বিক্রমাদিত্যের মত মহানুভব হয়ে উঠলো। নিশ্চিত [illegible]রের সম্ভাবনায় নব আর তার সঙ্গীরা অকস্মাৎ বিশ্বাস করে ফেললো—এ হলো স্বয়ং উদ্ধব ঘোষ, আর কেউ নয়, ভাগ্নে হোক আর যেই-ই হোক, উদ্ধব ঘোষের সুবিচারের খড়্গ তার ওপর পড়বেই পড়বে। সেই মুহূর্তে তারা অনুভব করলো জয় হয়েছে আজ তাদেরই।

ভগীরথ গলার নারকেলের মালা ফেলে দিয়ে বারান্দায় উঠে উদ্ধব ঘোষের পায়ের গোড়ায় উপুড় হয়ে পড়ে কেঁদে উঠলো—ঘোষকত্তাগো, আপনার ভাগনে মাজেবাবু গো, বাঁচান গো—

সখী-সাজা লাঞ্ছিত ছেলেগুলো ডুকরে কেঁদে উঠলো এবং লজ্জা ও অপমানের প্রথম ও তীব্র অনুভূতিতে লাঞ্ছিতা কিশোরীর মতো বুক ধরে তারা বসে পড়লো।

ঘোষ মশাই সমস্বরে বলতে লাগলেন—বল্টু! আমার ভাগ্নে বল্টু! নরপশু! এমন শাস্তি তাকে দেব যে তার মরা-বাপ স্বর্গে থেকেও তা কল্পনা করতে পারবেন না। আমার ভাগ্নে বল্টু, বল্টু…বলতে বলতে তাঁর চোখে-মুখে একবার কুটীল, একবার উদার, আর একবার বীর ভঙ্গী দেখা দিতে লাগলো।

এবং কয়েক মিনিট পরে পাঁচটা টাকা এক ধামা চাল আর মধুর বাক্য সহযোগে চিঁড়ে মুড়ি নারকেল নিয়ে গাজনের দল মনের হরিষে তাঁর বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলো।

উদ্ধব ঘোষ গদীতে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বাঁধানো হুঁকোয় তামাক খেতে খেতে নিজের এই অতি নাটকীয় অভিনয়ে নিজেই বিস্মিত হলেন এবং নিজের বুদ্ধির ওপর নড়বড়ে আস্থা আবার ফিরে পেলেন। তবুও তাঁর মনের এক অবহেলিত কোণে বোধ হতে লাগলো, ফণা তোলা এই কালকেউটের জাগ্রত রোষ শুধু বাঁশী বাজিয়ে থামানো যাবে না, বিষ দাঁতও তার ভাঙ্গা যাবে না আর। অতি ক্ষীণভাবে তাঁর সমস্ত মনের পর্দায় গোক্ষুর জাতীয় সাপের ফোঁস্-ফোঁসানী ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। আস্তে আস্তে তিনি ডাকলেন—রামলোচন!

—অ্যাঁ!

—কালকেউটে দেখেচ?

—হ্যাঁ, আজ তার ফণাও দেখলাম।

দু'জনেই চুপ করে গেলেন। ঘোষ মশাইয়ের হুঁকো থেকে শুধু তামাক টানার জলের শব্দ উঠতে লাগলো।

পথে পা দিয়েই নব বিশ্বাস বুঝতে পারলে—ধূর্ত উদ্ধব ঘোষের হাতে তাদের পরাজয় ঘটেছে। নিজের ভাগ্নেকে শাস্তি দিয়ে সমগ্র চাষীদের সামনে আপন জাতের মাথা, আর যেই করুক, অতি তীক্ষ্ণ বৈষয়িক বুদ্ধিসম্পন্ন উদ্ধব ঘোষ কোন মতেই নিচু করাবে না। অকস্মাৎ নব অনুভব করলো জমিদার-মহাজনকুলের মাতুল শকুনির কাছে পাশার দান না পড়তেই সে আজ নিতান্তই বোকা যুধিষ্ঠিরের মতই হেরে গেছে। পরাজয়ের যন্ত্রণায় নবর মনে হয় কে যেন তার সারা গায়ে অজস্র খেজুরের কাঁটা সজোরে ফুটিয়ে দিয়ে তার ওপর দিয়ে পা ঘসে ঘসে হেঁটে বেড়াচ্ছে।

সেদিনের মত সাতভিটেতেই আশ্রয় নিলে গাজনের দল। খাওয়া দাওয়ার পর বিশ্রাম করে যখন ওরা উঠে বসলো তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ফলে ইচ্ছে থাকলেও বাড়ীতে যাওয়া আর সম্ভবপর হলো না কারো।

সন্ধ্যার পর দলের সবাই ভগীরথের বাড়ীতে এসে জমা হলো। পাড়ার সবাই এসে সেখানে ভীড় জমালো। সেখানে ওরা সাজগোজ না করেই গাজনের গান গাইলো। কিন্তু গান বাজনা নাচ তেমন জমলো না।

নাচ গানের পর সবাই উঠোনে গোল হয়ে বসলো, পান তামাক আর বিড়ি খেলে। কথায় কথায় সকালের ঘটনার কথা উঠে পড়লো। গাজনের দলের সবাই কাহিনীটা সঠিক করে বলতে গেল। ফলে ঠিক মতো বলা না হয়ে খণ্ড খণ্ড কাহিনীর অঙ্গে নানা বর্ণ লেগে গেল। ছেলেরা তাদের ক্ষত-বিক্ষত গাল দেখালো এবং নব ও ভগীরথের সর্বাঙ্গে আঘাতের দাগ দেখালো। এই বাস্তব দৃশ্যের সঙ্গে সেই নানাবর্ণ বিভূষিত কাহিনী সবাই যখন এক ক'রে মিলিয়ে দেখলো তখন অপমান

আর ঘৃণায় নরনারী নির্বিশেষে জনতার প্রতিটি মুখ বজ্র-বর্ষী মেঘের মতো থম্‌থমে হয়ে উঠলো। অন্ধকারের ভেতর যদি দেখা যেত, তাহলে বিধাতা পুরুষও সেই রোষে-ক্ষুব্ধ মুখগুলো দেখে ভয়ে শিউরে উঠতেন!

ঠিক এমনি সময় রাম বাছাড়, তার ছেলে সহদেব, তার অনুগত খাতক ও বর্গাদার ভ্যাবলা, লক্ষে, অনন্ত, সহদেবের বন্ধু শান্তে আর বাছাড়ের মাহিনদার কুশল একসঙ্গে এসে সেখানে হাজির হলো। রামবাছাড় কোন দিকে না তাকিয়ে কোন কুশল প্রশ্ন না করে বলতে লাগলো—তুমরা ভাবিচো কুনডা। এই নব বিশ্বেসরে আজই যদি গিরামেত্তে না খ্যাদাও তো আমার কাছেত্তে কুনু সাহায্যি তুমরা পাবা না। এই নবা, আজকে গাজনের দল নাচাতি পিরতাপলগর যায়ে যে-সব্বোনাশ করে আয়েচে তা শুনলি স্যায়ং ভগমানও ভয় পাবে। দেবতার মতন মানুষ আমাগের ঐ ঘোষকত্তা, তিনারে কিনা ও যায়ে গেন্—

রাম বাছাড় এক দমকে বলে হাঁপিয়ে উঠেছিল। দম নিয়ে আবার বলতে লাগলো গল্‌-গল্ করে মনের সাধ মিটিয়ে। গ্রামের যার ওপর যত রাগ ছিল এই উপলক্ষে তাদের ওপর সে তার সব ঝাল ঝেড়ে নিলে। নবকে সে গরীব চাষীদের পরম শত্রু বলে বর্ণনা করলো এবং বললে যে, কালই যদি তারা ছেলে বুড়ো আদি করে সকলে মিলে নানাবিধ উপঢৌকন সহ ঘোষের হুজুরে হাজির না দেয় এবং ক্ষমা না চায় তা'হলে কি যে হবে সে কথা সে নিজেই জানে না। প্রতাপনগরে রায়দের কাছারীবাড়ীর ভেতর মহলে ভদ্রলোকদের মিটিং হয়েছে বিকেলে এবং যে-সিদ্ধান্ত হয়েছে তা সে পুরোপুরি না শুনলেও যেটুকু শুনেছে তাতেই তার প্রাণ শিউরে উঠেছে।

অতঃপর রাম বাছাড় গলা নামিয়ে একান্ত আপন জনের মতো নরম স্বরে যা বললে তার অর্থ হলো, সবাই যেন ও যা-বলেছে সেই উপঢৌকনসহ হাজির হয়ে বাবুদের জনে-জনে পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে আসে

এবং যার যা দেনা আছে, খাজনা হোক আর কর্জই হোক, সবাই যেন তা শোধ করে আসে। নইলে যা হবে তার জন্যে আর যেই হোক সে কিন্তু দায়ী হবে না এবং সেই বিপদে আর যেই পারুক সে কিন্তু জমিদার মহাজন ছাড়া চাষীদের সাহায্য করতে কোন মতেই পারবে না।

হাঁপাতে হাঁপাতে বাছাড় বসে পড়লো ভগীরথের বারান্দায় পৈঠের ওপর।

বাছাড়ের পর তার ছেলে, তার ছেলের বন্ধু, তার অনুগত খাতক আর বর্গাদার, তার মাহিনদার, তার সঙ্গী যে যেখানে ছিল সবাই একসঙ্গে, একের পর একে, কাছে দাঁড়িয়ে, দূরে দাঁড়িয়ে, হাত উঁচু করে, গলা চড়িয়ে বাছাড়ের অনুকরণে ভয়ানক ভয়ানক কথা বললে, গালিগালাজ করলে এবং হিতোপদেশ দিয়ে ভগীরথদের হুঁকো টেনে নিয়ে ফড়াৎ-ফড়াৎ করে টানতে লাগলো।

উঠোনে-বসা লোকগুলোর কেউ কথা বললে না। তারা বাছাড়দের কথার সারমর্ম আর গুরুত্ব বুঝতে লাগলো শুধু।

বাছাড়ের ছেলে সহদেব হুঁকো থেকে মুখ তুলে বললে—তুমার তামাকডা তো বেশ! বাবা নিজির হাতে যে-তামাক মাথে তা মুখি দেবে কুন শালা।

বাছাড়ের খাতক বললে—হ্যায়, তুমারগে বাড়ীর ভাতই মুখি দিয়া যায় না, তার তামাক!

বাছাড় রুখে উঠলো—শালারা আমার খাবা আর আমার মুখি দাঁড়ায়ে পড়ে হাগবা। ফ্যাল্ আমার টাকা, এক্ষনি ফ্যাল্।

উঠোনের কেউ-কেউ তাকে ধরে বসিয়ে দিলে এবং না রাগতে অনুরোধ করলে।

সহদেব বললে—তা তুমরা এখেনে না বসে আমারগে বাড়ী যায়ে বসলিই তো পারতে।

বাছাড় আবার উঠে দাঁড়ালো। চেঁচিয়ে উঠলো—হারামজাদা মামার সব্বোনাশ করবি তুই। অ্যাতোগুলোন লোক একসঙ্গে নিয়ে যায়ে আমার তামাক পুড়াবি কলকে-কলকে আর—

আবার সবাই বাছাড়কে ধরে বসালে এবং না রাগতে অনুরোধ করলে।

স্মারক অধর গায়েন সকালবেলার ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করে বাছাড়ের মত জিজ্ঞাসা করলে—এমন অবস্থায় পড়ে তুমি বিচক্ষণ মানুষ, তুমিউ কি উরা যা করেছে তাই না করে পারতে?

বাছাড় চেঁচিয়ে বললে—বুলি তাতে হয়েছে কি, বাবুরা যদি কিছু বুলে থাকে তো তাতে চাষার আবার হয় নাকি কিছু। চাষার আবার মান! তার আবার অপমান!

তবুও ওরা প্রতিবাদ করে। সহদেব ছাড়া বাছাড়ের অন্য সঙ্গীরা এতক্ষণে উঠোনের দলে মিশে গেছে।

বাছাড় আবার চেঁচিয়ে বলে—ভিটে বাড়ী রাখপা তারগে জমিতি, ভোগ করবা তারগে জমি, ভাগে চষপা তারগে জমি, বিপদে পড়লি টাকা নিবা তারগে, আর গায়ে আঁচড় যেই লাগবে সেই রুখে উঠপা। ইডা কুন দেশী আইন শুনি?

ওরা কথা বলে না। বাছাড় রাগতে রাগতে চলে যাওয়ার সময় বলে যায় গ্রামে কারো বিপদে সে একপালি ধান কি একটা পয়সা দিয়েও সাহায্য করবে না। সহদেব অনেক পিছনে থেকে বাপের অনুসরণ করে। আর সঙ্গীরা উঠোনেই বসে থাকে।

উঠোনের লোকেরা অনেকক্ষণ নীরব হয়ে বসে থাকে। ওদের মাথার ওপর আকাশ ভরে ওঠে আবেদনহীন লক্ষ তারায়, গায়ের ওপরয় দমকা বাতাস ঝাপটা দিয়ে চলে যায় কোন সাড়া না জাগিয়ে।

কখন জানি ভগীরথ জিজ্ঞাসা করে—কি করবা গো তুমরা। বাছাড় যা বললে তাই করবা, না চুপ মারে থাকপা।

অনেকক্ষণ পরে অধর গায়েন বলে—না, তা হয় না। এ্যাতোবড় অপমানের পরে, যারা অপমান করলে, মুখি চুণকালি মাখে আবার যায়ে যেন্ তারগে পায়ে ধ'রে বলবো 'খ্যামা করেন গো কত্তা', সে আমি পারবো না।

নবীন বলে—ঠিক কইচো গায়েন দাদা। জমি খাই—খাজনা দিই, কজ্জো নিই—শোধ দিই। খাজনা না পাও—নালিশ করো, কজ্জ টাকা না পাও—সুদি-আসলে আদায় করো কোর্টে যায়ে। অপমান করবা তুমি কোন ছোতনরে আমার!

ভীম বলে—তারা নেছেই তো সব, নেচ্ছেও সব। বুলি গিরামে কি গরু-বাছুর হাঁস ছাগল অ্যাট্টাও আছে আর, না ধান কলাই আছে এক মুঠো। সবই নেছে তারা। তারপরেও তুমি জুতো মারবা, তুমি কিডা হে!

কেষ্ট বলে—যাক প্রাণ তো থাক মান।

না, পায়ে ধরতে ওরা যাবে না, তা যা হয় হোক—এই সিদ্ধান্তই করলো ওরা।

অনেক রাত্রে ভাত খেয়ে নব আর ভগীরথ উঠোনে গিয়ে বসলো। নবীন আর ভীম এসে বসলো তাদের পাশে। একটু পরে অধর গায়েনও যোগ দিলে তাদের সঙ্গে। একখানা মাটির শানকিতে একগোছা পান, আস্ত সুপুরী, শামুক ভর্তি চুণ আর একখানা কোল কুঁজো যাঁতি এনে তাদের পাশে রেখে গেল মেজগিন্নি। ভগীরথ সুপুরী কাটলো, নব পানে চুণ লাগালো, নবীন সেগুলো গুছিয়ে গুছিয়ে সবার হাতে তুলে দিলে। ভগীরথ তামাক সেজে আনলো। সবাই মিলে পান আর তামাক খেতে খেতে আলোচনা করতে লাগলো—দুর্বৎসরের [redacted] কত মারাত্মক হয়েছে, কার ঘর থেকে কটা গরু মারা গেছে আর আধকড়ে করে বিক্রী করে দেনা শোধ দিতে হয়েছে। কার ঘরে এখুনি

ধান ফুরিয়েছে, কে কে কিষাণ বেচতে গিয়েও বেচতে পারে নি ; খাজনার টাকা আদায় না পেয়ে ভদ্রলোকদের অবস্থাও যে কত খারাপ হয়েছে, অভাবে পড়ে কোন্ কোন্ গরীব ভদ্রলোকের বউ আর বিধবা মেয়ে জমিদার বাড়ীর মেজ আর ছোট তরফের কোন্ কোন্ বাবুর সঙ্গে থাকতে বাধ্য হয়েছে, উদ্ধব ঘোষ কেমন লোক, নায়েব নিবারণ চক্রবর্ত্তী কত অত্যাচারী, রায়বাড়ীর জমিদাররা সহরে থেকে তাদের রক্ত-শোষণ করা পয়সায় কেমন করে মধু লুঠছে এবং কোন্ কোন্ চাষীর নামে এবার কয় দফা নালিশ হবে তারই সব রসাল আর করুণ বর্ণনা চলতে লাগলো।

মেজগিন্নি বারান্দায় পা ছড়িয়ে খুঁটি হেলান দিয়ে উঠোনের কথা শুনছে। একটা বিড়াল পা গুটিয়ে শুয়ে আছে। একটি মাত্র বাছুর গোয়াল নামক খোলা ভিঠেয় শুয়ে শুয়ে জাবর কাটছে। মাঝে মাঝে বাতাস আছড়ে পড়ছে, সেই ধাক্কায় তালপাতার ঘর ঝম্-ঝম্ করে নড়ে উঠছে।

প্রতিকারের উপায় আলোচনা করতে করতে কখন জানি গল্প সুরু হয়েছে অনেক পুরুষের আগের ঘটনার। অধর গায়েন তার ঠাকুর্দার কাছে শোনা কাহিনী বলছে নিজের ভাষায়।

……এমনি এক অজন্মার বছরে, অত্যাচারে বিল অঞ্চলের চাষী প্রজারা যখন মুমূর্ষু, তখন এই সাতভিটের সর্দারবাড়ীর শিবু সর্দার উঠে দাঁড়ালো। লাঠি হাতে করে দশাসই জোয়ান শিবু সর্দার দাঁড়িয়ে বললে—ভয় নেই, অত্যাচার আর সইবো না, যা দিয়েছি তা দিয়েছি, আর একটি কড়িও দেবো না, এক দানা ধানও ছাড়বো না। সর্দারের কথায় সাড়া দিলে সবাই, এক হয়ে রুখে দাঁড়ালো তারা। ঐ রায় বাবুরা লাঠিয়াল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো সাতভিটেয়, দাঙ্গা হলো, রক্ত-গঙ্গা বইলো। পরাজিত হয়ে ফেরার পথে লাঠিয়ালদের দল গাঁয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে গেল, চাষীদের তালপাতা আর খড়ের শত শত কুঁড়ে

তাদের যথাসর্বস্ব নিয়ে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। কিন্তু সাতভিটের শিবু সর্দার তার প্রতিজ্ঞা রাখলো, গ্রাম থেকে একটা কড়ি, কি এক দানা ধানও আর জমিদার বাড়ীতে যায় নি। সাতভিটের দেখাদেখি ক্ষেপে গেল রাজাপুর, লাউডাঙ্গা, কাটাখালি, নাউলী বিল অঞ্চলের আর সব গ্রামেও ঢেউ লাগলো সেই ভীষণ কাণ্ডের। জমিদাররা ভয় খেয়ে গেল। বিল অঞ্চল হাত ছাড়া হবার মতো হলো তাদের। ঘর থেকে বেরুনো কঠিন হয়ে দাঁড়ালো জমিদার গাঁয়ের লোকদের। শিবু সর্দার তখন চাষী অঞ্চলে দেবতা হয়ে গেছে, জমিদার তার নামে কাঁপতে সুরু করেছে।

মাথার ওপর নীল আকাশে সহস্র কোটি লাল তারা জ্বলন্ত চোখে চেয়ে চেয়ে আগুনের ভাষায় কথা বলছে ঘুমন্ত মাটির কানে। দুরন্ত বাতাস তখনও বইছে ঝাপটায় ঝাপটায়, হাজারো দুর্ধর্ষ সৈন্য যেন অন্ধকার রাত্রির দুর্গম পথ পার হয়ে হয়ে হানা দিয়ে চলেছে বিরামবিহীন ভাবে। মেজগিন্নি তন্ময় হয়ে কথা শুনছে, তার আঁচলের কাপড় ঝুলে পড়েছে পায়ের ওপর দিয়ে বারান্দার ছাঁইচে, দু'টি চোখ তার চেয়ে আছে আগুন-জ্বলা তারাদের দেশে। উঠোনে ওরা উত্তেজনায় সুদৃঢ় হয়ে উঠেছে। শিকারের পায়ের শব্দে মাংসাশী পশুর চোখে যে-আগুন জ্বলে ওঠে সেই আগুনে ওদের চোখগুলো তীব্র হয়ে উঠেছে। ওদের স্নায়ুতে আর পেশীতে শিবু সর্দার যেন শক্তির সঞ্চার করেছে আকস্মিক হুঙ্কারে—ভয় নেই, ওরে ভয় নেই!

তবুও তখনও মাঠের দিক্ থেকে তৃষ্ণার্ত চাতকের বুককাটা আর্তনাদ ভেসে আসছে অবিশ্রান্ত ধারায়। অধর গায়েন কথা বল্‌ছে উদ্দীপ্ত কণ্ঠে কখনও থেমে, কখনও আস্তে, কখনও জোরে, শিবু সর্দার যেন অনেক যুগ পার হয়ে কথা কইছে তার মুখ দিয়ে।

······কিন্তু তারপর, তারপর কি হলো, জমিদাররা কি করলো? পরাজয়ের এই অপমান বেশীদিন সইলো না তারা। ভাদ্রমাসে বিলে

তখন জল থৈ থৈ করে, নৌকোয় ছাড়া চলাচলের পথ নেই। হাটে গেল শিবু সর্দার গড়ে' ডোঙ্গায় চড়ে। হায় হায়! সে শিবু সর্দার আর ঘরে ফিরল না। ক'দিন পরে বিল ডুমুরিয়ার মাঝখানে তার গলিত শব ভেসে উঠলো। বিল ডুমুরিয়ার ঠিক মাঝখানে আজো আবাদ হয় না। সেখানটা, ঐ-যে শিবের গেড়ে বলে থাকে, ওই জায়গাটাতেই তাকে খুন করেছিল রায়বাবুরা। তাই ওখানকার নাম শিবের গেড়ে।

শিবের গেড়ের অর্থ এতদিনে পরিষ্কার ভাবে বুঝলো ওরা। জমিদাররা যে কত জঘন্য, কত কাপুরুষ, আর কত মরিয়া হতে পারে আজ এই মুহূর্তে কল্পনায় ওরা তার পরিমাপ করলে। কেউ কথা বললে না। গভীর অন্তর দিয়ে যুগ যুগান্তের অত্যাচারের ব্যাপকতা আর গভীরতা অনুভব করলো। জমিদারের শক্তির বিপুলতা কল্পনা করে বিমূঢ় হয়ে পড়লো। বিমূঢ়তা কাটাতে গিয়ে ওরা অনুভব করলো শিবু সর্দারের হত্যার অস্ত্র দিয়ে জমিদাররা চাষীদের কেমন করে ক্রীতদাসে পরিণত করে ফেলেছে। অত্যাচার আর দাসত্বের বেদনা, তার থেকে মুক্তির প্রয়াস, নূতন উদ্যমের পথের সন্ধান—সবে মিলে ওদের কল্পনায়, মনের জাগ্রত ও অর্ধজাগ্রত স্তরের ওপর স্নায়ুর প্রতিক্রিয়ায় আহত দেহের বিভিন্ন অংশে ওরা অদ্ভুত এক অনুভূতির আস্বাদ পেলো, যা স্বস্তি নয়, অস্বস্তি নয়, ভয় নয়, সাহস নয়, বোধ হয় রোষ নয়, দুঃখ নয়, কামনা নয়, ইচ্ছাও নয়। ওরা অনুভব করলো পাথর চাপা মাটির তলদেশ থেকে যেমন করে দুরন্ত শালের চারা মাটি ফাটিয়ে বেরিয়ে আসে, হাজার চেষ্টাতেও সেই দুর্জয় শিশুর জন্মগ্রহণ রোধ করা যায় না, তেমনি করে যেন শালের চারা জন্ম নিচ্ছে লক্ষ বছরের দাসত্বের পাষাণ-চাপা ওদের সর্বংসহা জীবন-মাটির গর্ভদেশ বিদীর্ণ করে। নতুন সম্ভাবনাকে অস্বীকার করার সহজাত

প্রবৃত্তিবশে সর্বদেহমন ওদের তীব্র হয়ে ওঠে এই নবজাত চেতনাকে প্রতিরোধের প্রয়াসে। কিন্তু তবু তারা অনুভব করে ওদের সব প্রতিরোধ জন্মকামী শিশু শক্তির কাছে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। এ-অনুভূতি ওদের কাছে নতুন, সম্পূর্ণ নতুন। সারা মন ওদের আচ্ছন্ন হয়ে থাকে এই অনুভূতির স্পর্শে, দেহ যেন হয়ে ওঠে থরস্পর্শী, সমগ্র চেতনায় যেন মাদল বাজতে থাকে দ্রিম্-দ্রিম্ করে।

অধর গায়েন তখনও বলছে—কিন্তু শিবু সর্দার মরেও মরেনি, তার আত্মা শিবের গেড়েয় চিরজীবী হয়ে আছে, সে-আত্মা চাষীদের গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়ায়। আবার যখন অত্যাচার হয় শিবু সর্দার তখন জীবন পায়। গভীর রাত্রে শিবুর গেড়ের তলা থেকে ডেকে ওঠে হে-এ-এ-ই-ই-ইহ্……

অধর বলে—সে জাগতে বলে। জাগেও কিন্তু—মাটি জাগে, ঘাস জাগে, মানুষও জাগে। আমিউ ঢ্যানো একবার শুনিচি সে ডাক সেই যেন্ যিবার পিরতাপনগরের বড় হাট পিরজারা তুলে নিয়ে গ্যালো মনিরামপুরি।

শিবু সর্দার তা'হলে জাগাতেও পারে! শিবু সর্দারের জাগরণী হুঙ্কার শুনবার আশায় উন্মুখ হয়ে ওঠে প্রতিটি অন্তর।

মার্চ কীস্তির রেভিনিউ দেওয়ার ক'দিন আগে প্রতাপনগরের বিখ্যাত জমিদার রায় প্রসন্ননারায়ণ বাহাদুরের তথা সারা বাংলার জমিদার সমাজের হাতে-গড়া প্রতিষ্ঠান 'দি গ্রেটার বেঙ্গল ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন'এ যে 'রান' হলো তা সামলাতে না পেরে ব্যাঙ্কটি যখন লালবাতি জ্বালালো তখন সমগ্র বাংলার শুধু জমিদার সমাজই নন, মধ্যবিত্ত সমাজ পর্যন্ত 'হায়-হায়' করে উঠলো। বাঙ্গালী জমিদারদের ছোট বড় অনেক ঘরের অনেক লক্ষ টাকা জমানো ছিল এখানে, মধ্যবিত্তদের তো কথাই নেই দু'একশো গেলনা এমন চাকুরী-জীবী বা সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘর প্রায়

রইলো না। এই ঘটনায় মুখ দেখানো বন্ধ করে ম্যানেজিং ডিরেক্টর রায় বাহাদুর প্রসন্ননারায়ণ শয্যা গ্রহণ করলেন। খবরটা যখন খবরের কাগজের মারফৎ উদ্ধব ঘোষ জানতে পারলেন তখন তিনিও শয্যাগ্রহণ করলেন 'যথাসর্বস্ব গেছে' বলে।

ব্যাঙ্কটা ফেল পড়বার কারণ যে আতঙ্ক বা গুজবের পরিণতি নয় রায় বাহাদুর তা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন। তাঁর নিজেরই যখন জমানো টাকা ভেঙ্গে রেভিনিউ গুণতে হলো তখন আর সব ছোট খাট জমিদারের পক্ষে যে ব্যাঙ্কে এসে জমা টাকা না তুলে অন্য কোন উপায়ই ছিল না, রায় বাহাদুর কেন, অন্যান্য ডিরেক্টরও তা অভিজ্ঞতা দিয়েই বুঝতে পারলেন।

খবরের কাগজে আরও দুটো সংবাদ বেরুলো পর পর। একটাতে সারা বাংলায় তামাদীর সময় মোট প্রায় দেড় লক্ষ নতুন নালিশ হবার কথা এবং অপরটাতে রেভিনিউ সেলে ছোট বড় প্রায় শতখানেক জমিদারী বিক্রী হবার কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় সংবাদের শেষে, বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হওয়ার অনুচ্ছেদে এ-ও লেখা আছে যে, অবস্থা বিবেচনা করে সরকার বহু জমিদারী রক্ষা করবার জন্যে সেগুলো কোর্ট অব ওয়ার্ডস্-এর তত্ত্বাবধানে নেওয়ার বিষয় সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছেন।

সেই খবর পড়ে রায় বাহাদুর আর একবার শয্যা নিলেন।

চড়ক পূজোর দিন ছয় সাত পরে রাম বাছাড় তার লোকজন নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে গেল। সে যা জানিয়ে গেল তাতে চাষী পাড়ার নরনারী তো দূরের কথা, গাছের পাতাগুলোও বোধ হয় খাড়া হয়ে উঠলো আতঙ্কে। সে জানিয়ে গেল, লোকে যখন তার কথা শোনেনি, তখন সে আর কি করবে। বাবুরা মত চাইলে, আর লোকেরাও যখন তার কথামত বাবুদের কাছে মাপ চায়নি তখন, সে আর মত না দিয়ে

কি করে। কাজেই নালিশ হয়েছে, সাতভিটের আর রাজাপুরের একটি বড়ীও বাদ যায়নি, অন্য গ্রামেরও তথৈবচ। কারো নামে বাকী খাজনার কারো নামে তামাদী খবর, আর যাকে ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে পাওয়া যায়নি তার নামে বাধ্য হয়েই নালিশ করা হয়েছে, তা সে মিথ্যেই হোক আর সত্যিই হোক, কারণ নালিশ তো করতেই হবে। নেমকহারাম দলকে সায়েস্তা না করে এ অঞ্চলে তারা, মানে পাওনাদাররা, বাস করবে কি করে। বাছাড় নিজেও কি যে-সে লোক, সে-ও কমসে-কম একুশ নম্বর নালিশ ঠুকে দিয়েছে, বাবুদের চেয়ে সে কম কিসে। তা ছাড়া বর্তমানে সে যখন একটা ছোট গাঁতির মালিক আর মহাজন হয়েই দাঁড়িয়েছে, তখন বাবুরা যা করবে বা বলবে তা না করে সে পারবেই বা কেমন করে। হাজার হোক, বাবুরা তাকে জাতে না নিলেও পায়ে নেব নেব করছে তো। আর, লোকেরাই বলুক, পাওনা টাকা তো বারো ভূতে লুটবার জন্যে শ্মশানঘাটে ফেলে রাখা যায় না। নালিশ সে করেছে, টাকা না আসে মাটি তো আসবেই, উশুল তার একরকমে না-একরকমে হবেই। তাছাড়া বাবুরাই যদি সব জমি নিলাম করে নেয় তো সেই-বা নেবে কি, তার টাকাও বা যাবে কোথায়, সে কি শুধু খুন্তি নাড়িয়ে বেগুনই সেঁকবে নাকি।

কিন্তু ভয় পেল না কয়েকটি লোক—নব, নবীন, অধর গায়েন এরা সব। তারা শুধু এইটুকু বুঝলো, জমিদারেরা একদা যে জমি টাকা নিয়ে বিলি করেছিল, সে জমি তারা আর ফেলে রাখতে চায় না, ঘরে ফিরিয়ে নেবেই। তার মানে হলো চাষীদের গরু-বাছুর মালপত্র ঘর বাড়ী ভিটে-মাটি সবই যাবে জমিদার মহাজনের পেটে। এই সর্বনাশা অবস্থাটার পর আর কোন অবস্থাই নেই। কাজেই ওরা যখন ডুবি হয়েছে, তখন ডুবেই ওরা বেয়ে দেখবে। ভয় আর ওরা করবে কাকে, আর কিসের জন্যেই বা। কিছু তো আর রইলো না। ভয় ওরা ভুলে গেল।

দশ

নবীন ফিরছিলো নবর বাড়ী থেকে সোজাসুজি মাঠ পেরিয়ে। প্রচণ্ড রোদে' দেহ খাড়া রাখা প্রায় অসম্ভব। পরণের কাপড় ভিজে গেছে কলকলে ঘামে, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠেছে, রক্তের চাপে মাথা করছে ঝিম্-ঝিম্, থিতিয়ে আসছে পা-ফেলা।

একটা লোক শুয়ে আছে বাছাড়দের উলুখড়ের জমির নিচে। এমন রোদে এমন জায়গায় শুয়ে থাকাটা কেমন যেন সন্দেহজনক। কৌতুহলে উত্তেজিত হয়ে উঠলো নবীন। কাছে গিয়ে দেখলো কাটাখালীর বলরাম পড়ে আছে প্রকাণ্ড একটা কাটলের ধারে। তার বাঁকখানা সিকেশুদ্ধ ছিট্‌কে গেছে খানিকটা দূরে, অনেকগুলো ফুটি কাঁকুড় সিকে থেকে বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে আছে চারিদিকে। কাঁধের গামছা এলোমেলো হয়ে ঢেকে আছে মাথাটা। অসংখ্য উলুখড়ের আঁটি বাছাড়ের জমি থেকে সুরু করে তার চারপাশ পর্যন্ত ছেয়ে আছে ছড়িয়ে ছড়িয়ে। একটা কাণ্ড যে ঘটেছে সে বিষয়ে নবীনের কোন সন্দেহ রইলো না।

বলরামকে নাম ধরে ডাকলো নবীন। উত্তর না পেয়ে নাড়া দিলে হাত ধরে। তাতেও সাড়া না পেয়ে কেমন যেন ঘাবড়ে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো নবীন।

সেবা শুশ্রূষার পর নবীনের বাড়ীতে যখন জ্ঞান হলো বলরামের, তখন সে আঁউ-মাউ করে চেঁচিয়ে আবার বুঁজিয়ে ফেললে চোখ দু'টো। অনেক ঝাড়-ফুঁক আর তেল জলের পর বলরামের জ্ঞান হলো।

বলরাম ঘটনার বিবরণ দিতে দিতে বললে যে, কাঁকুড় বেচতে যাচ্ছিল সে মণিরামপুরের হাটে। দারুণ রোদে মাথা-ধরা আর ছাতি-ফাটা তেষ্টা নিয়ে বাছাড়ের জমির নিচেয় পা দিতেই সে দেখতে পেলে—

একটা লতাপাতা আর ধূলোর থাম পাক খেতে খেতে এগিয়ে আসছে তার দিকে। থামটা এসে আছড়ে পড়লো বাছাড়ের জমির প্রকাণ্ড উলুখড়ের গাদাটার ওপর। সঙ্গে সঙ্গে সেই উলুখড়ের গাদাটাও তাল গাছের মাথা ছাড়িয়ে আকাশে উঠে গেল থাম হয়ে। তারপর সেই আকাশ-ছোঁয়া থাম রাক্ষসের মতো হেলতে হেলতে দুলতে দুলতে পাক খেতে খেতে ঝড়ের বেগে ছুটে এলো তার দিকে।

ছেলেবেলায় সে শুনেছিল দারুণ গ্রীষ্মে মরা মানুষের আত্মারা তেষ্টা মেটাবার অন্য কোন উপায় না পেলে জ্যান্ত মানুষের রক্ত খাওয়ার জন্যে হন্যে হয়ে ওঠে। আজ তাকে ভর দুপুরে ফাঁকা মাঠে পেয়ে সেই সব আত্মা দল বেঁধে ঘূর্ণী হয়ে তার ঘাড় মটকে রক্ত পান করতে আসছে ভেবে সে চোখ বুঁজে ফেলেছিলো ভয়ে। তারপর যে কি হলো সে কথা আর সে-জানে না।

গরম কালের দুপুর বেলায় ঘূর্ণী উঠতে প্রায় সবাই দেখেছে। কিন্তু বাছাড়ের প্রকাণ্ড উলুখড়ের গাদাটা লতাপাতার সঙ্গে মিশে আকাশে উঠে মাটি থেকে আকাশ পর্যন্ত থাম হয়ে গেল, আর সেই থামটা ঘুরতে ঘুরতে ঝড়ের বেগে এগিয়ে এসে বলরামকে পর্যন্ত ছিটকে ফেলে দিলে—এমন কাণ্ড দুঃস্বপ্নের মতই ভয়ঙ্কর!

অকল্পনীয় বিস্ময়ে অসংখ্য প্রেতাত্মার সম্মিলিত ডানার ছায়ায় বসে বসে সবাই ওরা বাইরে তাকিয়ে রইলো নীরবে। দেখলো মেঘশূন্য আকাশের সর্বদিকব্যাপী নীল রং জ্বলছে তীব্র আগুনের গন্‌গনে আঁচের নীল আভার মতো কেঁপে কেঁপে। তলায় জ্বলছে শুষ্ক বিবর্ণ পৃথিবী, তার বুক থেকে উঠে বাতাসের ভেতর লক্‌-লক্‌ করে জ্বলছে প্রতিফলিত রোদের তীব্র শিখা। মাঠের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত যতদূর চোখ যায় সমুদ্রের মতো রোদের স্বচ্ছ শিখার ঢেউ উঠছে পড়ছে, কাঁপছে আর ভাঙ্গছে। মড়কের সময় কালীবাড়ীর শ্মশানে যেমন করে

চিতা জ্বলত নিরন্তর তেমনি করে সারা পৃথিবীতে যেন চিতা জ্বলছে, আর তার লেলিহান শিখা যেন আকাশে উঠছে ধ্বক্‌-ধ্বক্‌ করে।

সেই অপরাহ্ণে বারান্দায় বসে মাঠের দিকে তাকিয়ে চাষী বউদের প্রথম মনে হলো জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে যে-আগুন লেগেছে তার মাঝে মড়ার মত পড়ে থেকে মানুষ গরু গাছপালা পশুপক্ষী বুকে নিয়ে পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে বিশ্বচরাচর। সেই বিশ্বব্যাপী মহাশ্মশানের চারিদিক থেকে অসংখ্য তৃষিত চিলের বুকফাটা কান্না ভেসে আসছে, যেন মুমূর্ষু প্রেতাত্মাদের শেষ জল-চাওয়া। প্রকৃতির এই নিষ্ঠুরতম ঘটনার মুখোমুখী দাঁড়িয়ে তাদের মগ্নচৈতন্য পর্যন্ত আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

এমনি অবস্থায় একদিন নব আর নবীনের নেতৃত্বে তাদের দুই গ্রামের প্রায় জনা পঞ্চাশ–ষাট চাষী রায়বাবুদের কাছারি গিয়ে হাজির হলো।

এমন অসময়ে দলবদ্ধ চাষীর আগমনে নায়েব নিবারণ মুখুজ্জে যখন অস্বস্তি বোধ করছেন তখন নবই সবার মুখপাত্র হয়ে হাতজোড় করে বললে—নায়েব মশাই, অ্যাট্টা নিবেদন জানাই। দেখতিচেন তো জল নেই তেরসীমানায়, চাষ-বাস বন্দ। জমি না উঠলি জমিদারের মাল খাজনাইবা উশুল হবে কি দিয়ে। আপনি হলেন ভুস্যামীর পিরতিনিধি, অ্যাট্টা ব্যবস্তা করে দ্যানগে।

নিবারণ মুখুজ্জের সমস্ত মন খ্যাঁকশিয়ালের মতো সতর্ক হয়ে উঠলো। ধীরে ধীরে সাপল্যাজা গোঁপে আঙুল চালাতে চালাতে বললেন—রোদ্দুর যখন ওঠে তখন সারা দেশেই ওঠে। অনাবিষ্টি তো শুধু তোদের গাঁয়েই আসেনি, জমিদারদের গাঁয়েও এসেছে। এ-যে ভগবানের বিধান, এর কাছে রাজা প্রজা সবাই সমান।

নবও কম ধূর্ত নয়। তেমনি হাতজোড় করে বললে—ঠিক বলিচেন আপনি। ভগবানের মার দুনের বার। তার পিরতিকার করতি পারেন

শুধো ভগবানের পিরতিনিধি রাজা ভুস্বামীরা। আপনি ছাড়া আর কিডু সে কাজ করবে বলেন।

নায়েব মশাই প্যাঁচে পড়ে কাটান খুঁজতে লাগলেন চুপ করে। সেই অবকাশে নব আরও দুঃসাহসী হয়ে প্রস্তাবটা পেড়ে বসলো—আমরা বুলতিচি কি, এট্টু জলের ব্যাবস্তা করেন গে যায়ে।

নিবারণ মুখুজ্জে সোজা হয়ে বসলেন। বললেন—জল? জল কোথায়? ভগবানই দিতে পারছেন না, তার আমি তো কোন ছার। আমি কি এখন দীঘি কেটে জল দেব তোদের ক্ষেতে।

জনতার ভেতর ফিস্-ফিস্ গুঞ্জন উঠলো। নব এক পা এগিয়ে গিয়ে বললে—আজ্ঞে দীঘি কাটপেন ক্যানো, দীঘি তো কাটাই আছে। রায়দীঘিত্তে জল ছাড়ার হুকুম দেন, আপনারে ধন্যি-ধন্যি করে জমিতে লাঙ্গল নামাইগে আমরা।

নায়েব মশাই রসিক লোক। বললেন—আরে, বিষ্টি যখন হচ্ছেইনা তখন আজ হোক কাল হোক রায়দীঘির জলতো ছাড়তেই হবে। তবে কি জানিস, তোরাতো জমিদারের প্রসাদ পাবি। রায় সড়কের সাড়ে তিনশো বিঘেতেই তো প্রথম জল নামবে, রাজভোগের পর প্রসাদ যদি থাকে, তোরা তো পাবিই তা। তার জন্যে আর দরবার কিসের।

এর পর আর কোন কথা চলে না।

অন্য প্রতিকারের আশায় ওরা গেল বুদ্ধিমান মহাশয় ব্যক্তি উদ্ধব ঘোষের কাছে।

গিয়ে ওরা অবাক হয়ে গেল। ঘোষ মশাই জেলা বোর্ডের টাকায় তাঁর নিজের জমিতে পুকুর কাটাচ্ছেন। আজ দুদিন হলো তাতে পশ্চিমা কোরাদার নেমেছে।

প্রস্তাব শুনে ঘোষ মশাই উদার কণ্ঠে ঘোষণা করলেন—আরে,

চাষের জন্যে জলের অভাব হয়েছে বলেই তো আমি কত চেষ্টায়-না জেলা বোর্ডকে দিয়ে পুকুরটা এই গাঁয়েই কাটাচ্ছি। কলেরা মহামারী হয়েছে বলে ম্যাজিস্ট্রেটকে দিয়ে সুপারিশটা আমিই করিয়ে নিয়েছিলাম। কিন্তু এই গাঁয়ে কি আর সহজে স্যাংশন দেয়। আমি বলেই-না এতবড় কাজটা কৌশলে সেরে ফেলতে পেরেছি। আর, একি আমার নিজের জন্যে, আমি পুকুর দিয়ে করবো কি? নিজের জমি লিখে দিয়ে পুকুরটা এখানে কাটিয়ে নিচ্ছি তোদের মতো চাষীদের সুবিধে হবে বলেই তো। তোদের গাঁয়ে এক ফোঁটা জল নেই, আহা! কী-যে কষ্ট তোদের! তা, এই পুকুরে জল উঠলেই তোরা জল নিবি। আমার কাছে আর অনুমতিও নিতে হবেনা তোদের, ঢালাও হুকুম দিয়ে রাখলাম আগে থেকে—নাও জল, ঢাল জল, চষ নাঙ্গল।

আনন্দের আতিশয্যে ঘোষ মশাই তুড়ি দিতে দিতে হাসি-হাসি মুখে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

ঢালাও হুকুম পেয়ে ওরা ফিরে এলো। পথে আসতে আসতে নবীন জিজ্ঞাসা করলে—আচ্ছা, মড়কটা তো হলো আমারগে আঠাশ গিরামে, তা সরকারী পুকুরডা বাবুপাড়ায় ওঠলে ক্যামোন কায়দায়, ও মিতে?

নব গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেছে। সে-ও ভাবছে, এতবড় অবিচারটা কেমন করে ঘটলো, কেমন করে তার প্রতিকারই বা সম্ভব।

উত্তরটা দিলে অধর গায়েন—ঝ্যামোন করে তুনার ধান কাটে নেলে ঘোষ মশাই, ঝ্যামোন করে আমরা চাঁদা দিলান—ইস্কুল আর রাস্ত হলো বাবু পাড়ায়, ঝ্যামোন করে—

ওদের মনে এক সঙ্গে অনেক অত্যাচার আর অনেক বঞ্চনার কাহিনী ভীড় করে দাঁড়ালো। ভীমের মনে পড়লো তার ছেলের মৃত্যুর কথা। জল না পেয়ে স্ত্রী আর মা কেমন করে শেষ নিঃশ্বাস ফেলে গেছে গভীর বেদনার সঙ্গে সেকথা জেগে ওঠে নবর মনে।

আবার ওরা মাঠে যায়, দীর্ঘশ্বাস ফেলে শুকনো ঘাস আর গুল্মের দিকে চেয়ে চেয়ে। বিলের মাঝখানের কুয়োর তলায় নামে, শুকনো জোব মাটি লাথি মেরে ভেঙ্গে ভেঙ্গে গুঁড়ো করে দেয়। খালের বুকে নেমে তলাকার বালি মুঠো-মুঠো করে তুলে ধরে চোখের সামনে, ছুঁড়ে দেয় চারপাশে। বাতাসের ধাক্কায় ছড়িয়ে পড়ে চিক্ চিক্ করে হাসতে থাকে বালির দানাগুলো, যেন ব্যঙ্গ করে ওদের। বিরক্ত হয়ে ওরা বাতাস শোঁকে। বাতাসের বুকও শুকনো, জলীয় বাষ্পের সঙ্গে যে সোঁদা গন্ধ থাকে—আভাষ মাত্র নেই তার।

ঘরে ফিরে ওরা কলা ঝাড়ের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। সবচেয়ে বেশী জল ধরে রাখে এরা। সেই কলাগাছের পাতাও ঝলসানো, মাঝপাতার ঘাড় নেই—সরু একটা দড়ির মত বাঁকা হয়ে নুয়ে পড়েছে সেগুলো।

না, জল নেই, রস নেই—জীবের প্রাণ রক্ষার প্রথম উপকরণ মিলিয়ে গেছে মানুষের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। কেনো রুষ্ট দেবতা বোধহয় জীবনের অতিপ্রয়োজনীয় রসটুকু হরণ করে লুকিয়ে রেখেছে এক দুর্ভেদ্য গুহায়, যার সন্ধান মিলবেনা মানুষের সহস্র চেষ্টায়ও।

সাতভিটের চাষীদের মনে ঐকান্তিক প্রার্থনা জেগে ওঠে—হে দেবতা প্রসন্ন হ'ও! জীবের জীবন শুকিয়ে যাচ্ছে, ফসলের কামনা বুকে নিয়ে মাটি মরে যাচ্ছে পাথর হয়ে। হে দেবতা করুণা কর, জল দাও ধারায় ধারায়—মানুষ বাঁচুক, গরু বাঁচুক, ফসল জাগুক মাটির বুকে।

শুক্রবার দিন দল-বেঁধে তারা শা-মাদারের তলায় গেল। হাঁস কেটে গাছের গোড়ায় রক্ত দিলে, সে রক্ত মুহূর্তে শুকিয়ে গেল দেখে তারা আনন্দে আত্মহারা হলো। তারা মোরগ উড়িয়ে দিলে এবং সে মোরগ অন্য দিকে না গিয়ে শা-মাদারের ডালে বসে

পশ্চিমমুখো হয়ে ডেকে উঠলো। কিন্তু এত সুলক্ষণ সত্ত্বেও সাত আট দিনের মধ্যেও যখন জল হলোনা তখন চাঁদা করে নিষ্কালি পাঁঠা কিনে তারা শনিবারে প্রতাপনগরের কালীবাড়ীতে নিয়ে গেল। পুরুতঠাকুর আর তার চেলারা মিলে পাঁঠা কেটে কলা গাছের খোলায় করে রক্ত দিলে মা কালীর পায়ে। পাঁঠাটা পুরুতদের উপহার দিয়ে পুকুর থেকে পেট ভর্তি জল খেয়ে তারা মনের হরিষে বাড়ী ফিরে এলো। কিন্তু তাতেও বৃষ্টি হলো না।

এখন কি করা যায়! চাষীপাড়ার পুরুষরা আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চন্দ্রমণ্ডল কবে হবে সেই সন্ধান করতে লাগলো। মাদারী আর মেজগিন্নির উদ্যোগে মেয়েরা পাড়ায় পাড়ায় জটলা করে অনেক পরামর্শ আর অনেক কথা কাটাকাটি করে এই সিদ্ধান্তে পৌছল যে জলের দেবতা বরুণ, তাঁর কোপ শান্তির জন্যে জল সওয়া আর কাদামাটি করাই প্রশস্ত।

মঙ্গলবার সকালে গ্রামের কুমারী মেয়েরা বরণকুলো মাথায় করে কাঁখে কলসী আর ধামা নিয়ে শঙ্খ বাজিয়ে উলু দিয়ে গান গেয়ে পাড়ায় পাড়ায় বাড়ীতে বাড়ীতে মাগন মেগে আর জল চেয়ে বেড়ালো। রাত্রিতে সব মেয়ে জাগরণ করলো। পরদিন ভোরে উলু দিয়ে শাঁখ বাজিয়ে গান গেয়ে সব মেয়েতেই গ্রাম প্রদক্ষিণ করলো এবং খালধারের বড় তেমাথাটার কাছে গিয়ে সমবেত হলো।

কুমারী মেয়েরা ছোট ছোট কোদাল দিয়ে তেমাথায় ছোট একটা পুকুরের মত গর্ত কাটলো। দুপুর বেলা মেয়েরা জল সইতে গেল পাড়ায় পাড়ায় উলু দিয়ে গান গেয়ে। সব বাড়ী থেকে একটু একটু করে জল দিলে তাদের নতুন কলসীতে। তারপর সেই পুকুরের চারিপাশ ঘিরে ওরা বরণ করলো জলের দেবতাকে মেঘকে আর পূবে বাতাসকে। ফুল দিয়ে পল্লব দিয়ে ভরিয়ে দিলে পুকুরের

ছোট বুকটা। মাগন-মাগা চাল তরকারী দিয়ে খিচুড়ী রেঁধে দেবতাদের ভোগ দিলে, গলায় বস্ত্র দিয়ে প্রণাম করলো, হাত জোড় করে প্রার্থনা জানালো। তারপর সেই তেমাথায় সেই ছোট পুকুরের চারিপাশে সবাই বসে কলাপাতায় করে পরমানন্দে সেই খিচুড়ী খেলে। সারা দুপুর আর প্রথম বিকেল তারা তেমাথার কাছে রাস্তার পাশে খালের পাড়ে আর খালের ভেতরে, গাছের ছায়ায় আর শেকড়ে বসে খোস গল্প করলো, অনেক বছর আগে আবার কবে অনাবৃষ্টির রাক্ষস এসেছিলো দেশে, এর চেয়ে বেশী মানুষ গরু মরেছিল, এর চেয়ে অনেক বেশী দুর্গতি হয়েছিল বুড়ীদের কাছে সেই কাহিনী শুনলো, তামাকের গুঁড়ো মুখে দিয়ে মাটিতে পিক ফেললে, গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে ছেলে মেয়েকে মাই খাওয়ালো, আর গরম বাতাসে চুল খুলে পেছনে ঘাড় বাঁকিয়ে রইলো তাড়াতাড়ি শুকোবে বলে।

বিকেলে আবার ওরা তেমাথায় কাটা নকল পুকুরটা ঘিরে ঘুরে ঘুরে গান গাইলো। বড় মেয়েরা আস্তে আস্তে আলাদা হয়ে গোল চক্র করে দূরে দূরে বসে রইলো। কুমারী মেয়েরা সার বেঁধে নাচলো আর বরণ করলো আর গান গাইলো জলের দেবতাকে ডেকে ডেকে —দেবতাগো, তুমি নেমে এসো, পৃথিবী পুড়ছে, সৃষ্টি মুছে যাচ্ছে, তুমি নেমে এসো!

বড় মেয়েরা অকস্মাৎ উলু দিয়ে উঠলো। কুমারী মেয়েরা গান থামিয়ে মেগে-আনা জল পুকুরে ঢেলে দিলে। বড় মেয়েরা আবার উলু দিয়ে উঠলো। কুমারী মেয়েরা হঠাৎ কাপড় খুলে সেই নকল পুকুরে লাফিয়ে পড়লো এবং দুই পা, হাত আর সারা দেহ দিয়ে কাদা মাটি করতে লাগলো। কুমারী মেয়েদের হুড়োহুড়ি ল্যাপটা-লেপটি আর হাসির হুল্লোড়ে তেমাথায় বুঝি নেমে এলো স্বর্গ নন্দন।

এমন সময় বড় মেয়েরাও এগিয়ে এলো কাদামাটি করতে। তাদের হাসি ঠাট্টা গান উল্লাস, ধ্বস্তাধ্বস্তি আর কুস্তাকুস্তিতে তেমাথা বুঝি ভেঙ্গে যায়। ছেলেদের দেখতে নেই এই কাদামাটি, তবু তারা অনেক দূরে অনেক উঁচু গাছে চড়ে দেখতে লাগলো অর্দ্ধোলঙ্গ মেয়েদের এই অপূর্ব্ব আনন্দলীলা আর মাঝে মাঝে গালে আঙ্গুল দিয়ে উলু দিতে লাগলো ঝাঁকে-ঝাঁকে। সেই দিকে তাকিয়ে মেয়েরা কাদা ছুঁড়তে লাগলো, ছেলেরা উলু আর হরিবোল দিয়ে তার জবাব দিতে লাগলো।

এমনি করে সাতভিটের মেয়েরা তাদের মন দিয়ে দেহ দিয়ে, যৌবন দেখিয়ে, লীলাভঙ্গী দেখিয়ে, গান গেয়ে করুণ কণ্ঠে প্রার্থনা জানিয়ে, কখনো জোড়হাতে প্রণাম করে আর কখনও বা হাসির হুল্লোড় তুলে জলের দেবতাকে আহ্বান জানালো।

সন্ধ্যার পর যে-যার বারান্দায় শুয়ে মাই খাইয়ে গান গেয়ে গেয়ে শিশুদের ঘুম পাড়াতে পাড়াতে মেয়েরা আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলো। ভরা চাঁদ উঠলো, আস্তে আস্তে তার চারিপাশে মেঘ জমা হলো, আস্তে আস্তে গোল গোল চক্র রচনা হলো। হঠাৎ মাদারী বারান্দা থেকে উঠোনে লাফিয়ে পড়লো, হাত উঁচু করে চাঁদের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো—হাগ্যাগো, চন্দোর মন্ডোল হুই যেন্, হাগ্যাগো……!

নবীন চেয়ে দেখলো, নব আর হরিবোলও চেয়ে দেখলো, আকাশে চন্দ্রমণ্ডল হয়েছে। উলু দিয়ে উঠলো মাদারী। তাদের পাশের বাড়ীতেও উলু উঠলো, তার পাশের বাড়ী থেকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে সারা গ্রামের সন্ধ্যার বাতাস উলুতে ভরে রইলো। মেয়েরা বিজয়িনীর গর্ব্বে তাদের পুরুষদের দিকে তাকিয়ে বললে—দেখলে মেয়ে মান্ষির খ্যামোতা, একদিনিই দেবতা জাগালে। পুরুষরা বলে—হ্যায়, স্বচক্ষিই দ্যাখলাম। ফুল ফুটলি ভুমরা ছোটে জানতাম এখন জানলাম, দেবতাও ছোটে।

বৃষ্টি হওয়ার আশায় তাদের চোখমুখ উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে, সেই উদ্দীপ্ত মুখমণ্ডলে তাদের চন্দ্রমণ্ডলের আভা। পুরুষরা সেই মুখের দিকে চেয়ে দেবতাদের হিংসা করে আর অপূর্ব অনুভূতিতে দুলে ওঠে।

কিন্তু তারপর দিন বৃষ্টি হলো না, তার পর দিনও নয়, তার পর দিনও নয়। বিল অঞ্চলের দিন যেমন চলছিল তেমনিই চলতে লাগলো।

তারপর কোন একদিন বিকেলে, মাদারী গা ধুচ্ছে ঘোষেদের মাঠের দীঘির আঘাটায়। মেজগিন্নি খুঁটে খুঁটে শাক তুলছে জলের কিনারা থেকে আর কেষ্টর বউ কলসী মাজছে পচা আমের পাতা দিয়ে।

একটা শব্দে সবাই উৎকর্ণ হয়ে উঠলো। আবার সেই শব্দ হলো। তিনজনেই সোজা হয়ে দাঁড়ালো। আবার শব্দ উঠলো। ওরা সবিস্ময়ে দেখলো দীঘির মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড টোপা-শ্যাওলার মাথার ওপর বসে একটা ব্যাঙ ডাকছে কট্-কট্ করে। আনন্দে ওদের বুকের রক্ত নেচে উঠলো। কেষ্টর বউ হাত বাড়িয়ে দেখালো—হ্যাত্থাখো! মেজগিন্নি আর মাদারী সেই দিকে তাকিয়ে রইলো অপলকে। বাতাসের ধাক্কায় তাদের কলসীগুলো ভেসে যেতে লাগলো গভীর জলের দিকে।

কোঁচড়ে শাক নিয়ে আর কলসী ভরে জল নিয়ে ওরা তাড়াতাড়ি বিল পাড়ি দিতে আরম্ভ করলো আর মাঝে মাঝে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলো। মেজগিন্নি একটা খেজুরগাছের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে—হ্যাদ্দ্যাখো দিদি! ওরা সবাই থেমে গিয়ে দেখলো খেজুর গাছের ডগাগুলো অনেক উঁচু হয়ে উঠেছে, তাদের পাতাগুলো খাড়া হয়ে উঠেছে আকাশে মুখ তুলে। ওরা চারিদিকে তাকিয়ে দেখলো—চারিপাশে সব গাছের পাতাই তেমনি খাড়া হয়ে উঠেছে আকাশের দিকে। ঘাসের মাজগুলোও সোজা হয়ে উঠেছে ওপরের দিকে। বাতাস থেমে গেছে। পরিষ্কার ছায়া-ছায়া অন্ধকারে

ভরে গেছে সারা মাঠ, থম্‌থম করছে চারিদিক। সারা পৃথিবী যেন রুদ্ধনিশ্বাসে অপেক্ষা করছে এক মহা ঘটনার জন্যে।

ওদের চারিপাশে পাখীদের আতঙ্কিত কলরব জেগে উঠলো। কাক বক শালিক পেঁচা ফিঙে আর যত রকমের পাখী আছে সবাই যেন প্রাণভয়ে তীব্র কণ্ঠে ডাকতে ডাকতে ঝাঁক বেঁধে আকাশ ছেয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। সেইদিকে তাকাতে গিয়ে ওরা একসঙ্গে দেখতে পেলো আকাশের বাঁপাশে ঝড়োকোণে মেঘ জমেছে। ওরা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, জীবনে যেন এমন আশ্চর্য ঘটনা আর কোনদিন দেখেনি তেমনিভাবে সেইদিকে চেয়ে রইলো। দলে-দলে ঝাঁকে-ঝাঁকে মেঘ জমতে লাগলো, একখানার পর একখানা গায়ে-গায়ে লেগে-লেগে সারা আকাশ ছেয়ে ফেললে ফ্যাকাশে কালো পুঞ্জ মেঘে।

অকস্মাৎ উল্লাসের অট্টহাসিতে ঈশান কোণ দুভাগ হয়ে গেল বিদ্যুতের অতি তীব্র ছটায়। পৃথিবীর সারা অঙ্গ ঝলমল করে উঠলো বিপুল আলোর আভায়। অকস্মাৎ আকাশের বুক দুলে উঠলো, পুঞ্জ-পুঞ্জ মেঘের ভারে ছড়িয়ে—পড়া সর্বব্যাপী সেই বিবর্ণ জটাজাল দুলে উঠলো সামুদ্রিক ঝড়ে আহত গভীর সাগরের ঢেউয়ের তালে। এবং অকস্মাৎ সেই সমকালে তাল নারকেল আর খেজুরের আলোড়নে দুলে উঠলো পৃথিবীর অসংখ্য বেণী, সুদূরের আলুথালু বনরেখায় উড়ে পড়লো তৃষিত মাটীর সবুজ মেখলা।

কাঁখে কলসী নিয়ে ওরা শুধু দাঁড়িয়ে রইলো তিনটি নারী। ওদের চারিপাশে তালে তালে গমকে গমকে তীব্র থেকে অতি তীব্র হয়ে উঠলো আকাশ আর মাটীর নৃত্যলীলা। আলোড়নে বিক্ষেপে, উল্লাসে হিল্লোলে, আকাশ ভেঙ্গে পড়ছে মাটীর বুকে, আর মাটী আপনাকে হারিয়ে ফেলছে আকাশের বুকে। দিকচক্রবালে আক্ষেপে চঞ্চল বাহু মেলে আকাশ আর মাটি ক্ষণে ক্ষণে জড়িয়ে ধরছে দুজনায়।

ঠিক ওদের মাথার ওপর দাঁড়িয়ে বজ্রহুঙ্কারে আকাশ আবার ডাকলো মাটাকে। ঠিক সেই মুহূর্তে পৃথিবীর বুক আবার জ্বলে উঠলো তীব্র আলোকচ্ছটায়। আর ঠিক সেই মুহূর্তে আহত হরিণীর মতো আর্তনাদ করে উঠলো মেজগিন্নি, কাঁখ থেকে তার জলভরা কলসী মাটীতে পড়ে খানখান হয়ে গেল। ওদের সামনে তালবনের সবচেয়ে উঁচু গাছটা জ্বলছে দাউ দাউ করে। হঠাৎ সারা আকাশের বুক ভেঙ্গে ঝর্‌-ঝর্‌ করে জলের ঝরণা নেমে এলো। মেজগিন্নির বুক আছড়ে আছড়ে সারা অঙ্গ অবশ হয়ে এলো। ওরা চেয়ে দেখলো, ঊর্দ্ধ্বে আকাশে মুখ তুলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে মেজগিন্নি।

প্রথম কালবৈশাখীর আকস্মিক আঘাতটা সামলে নিতেই চাষী পাড়ার দীর্ঘকালের তৃষ্ণার্ত মানুষের বুকে যে পুলকের বান ডেকে উঠলো বোধহয় ভাদ্রমাসের গঙ্গার বানের চেয়েও তার বেগ অনেক বেশী। তারা কেউ উঠে দাঁড়ালো দুহাত তুলে, কেউ উঠোনে নামলো, কেউ মাঠে ছুটে গেল, কেউ লাফালো, কেউ নাচের ভঙ্গীতে সারা উঠোনে ঘুরে ঘুরে হাত তালি দিতে লাগলো। কেউ হাসতে লাগলো আর কেউ বা মহা কলরবে অনেক কথা বলতে লাগলো। যেন এক ক্ষ্যাপা মহেশ্বর এই ঝড়বৃষ্টির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাদের বুকের ভেতর নেচে নেচে লীলা করে চলেছে।

বৃষ্টি থামতেই একসঙ্গে সব লোক ছুটে গেল গ্রামের বাইরে। এক দল খালধারে গিয়ে দেখলো বালিভরা শুকনো খালের বুকে ঘোলা জল ছল ছল করছে, আর স্রোতের বেগে সে-জল উত্তর থেকে দক্ষিণে গিয়ে বিল ডুমুরিয়ার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। উল্লাসে ওরা চিৎকার করে উঠলো সমস্বরে। ছোট ছেলেমেয়েরা লাফিয়ে পড়লো সেই জলে। সঙ্গে সঙ্গে স্রোতের ভেতর হাঁসের ঝাঁক নেমে গেল।

মাঠের দিকে চেয়ে চেয়ে তাদের মনে হলো তাদের হারিয়ে যাওয়া জীবন যেন বৃষ্টি ধারায় ঝরে ঝরে মাটির দেশে ফিরে এসেছে আবার। মাঠের ধারে গিয়ে ওরা দেখলো আল বাঁধা জমিগুলোতে জল জমেছে, বিলের তলাতেও জল চক্ চক্ করছে। তারা জোরে জোরে বুক ভরে নিশ্বাস নিয়ে সোঁদা গন্ধ বাতাস বুকের ভেতর ধরে রেখে রেখে ছেড়ে দিতে লাগলো। সন্ধ্যা পর্যন্ত অকারণ পুলকে তারা যেখানে সেখানে যা-তা করে বেড়ালো। শুধু তাদের মনে হলো, ফুরিয়ে যাওয়া হারিয়ে-যাওয়া অনেকগুলো দিন একসঙ্গে ফিরে এসে তাদের ক্ষেপিয়ে তুলছে যেন।

রাত্রিবেলা বারান্দায় বসে চাষীপাড়ার নরনারী রোজকার মতো প্রথমেই আর পরস্পরের দিকে তাকালো না, দূরে সেই নীল আকাশে তাকিয়ে রইলো যেখানে খণ্ড খণ্ড মেঘের দল তখনও উড়ে বেড়াচ্ছে বড় বড় পাখীর মতো। এমনি করে বসে থাকতে থাকতে মাদারী এক সময় নবীনের মুখের দিকে ফিরে চাইলো। মনের কোথায়ও ওদের ক্ষোভ নেই দুঃখ নেই, গভীর সন্তুষ্টি ছাড়া বাসনার একটুকু চাঞ্চল্য নেই। প্রশান্ত হাসিতে ওদের দুজনের মুখ ভরে গেল। কখন জানি ওরা দুজনে গল্প করতে আরম্ভ করলো, ঢিমিয়ে ঢিমিয়ে বলতে লাগলো ছোটবেলাকার ঝড়বৃষ্টি আর এমনিতর শান্ত রাত্রির কথা। আস্তে আস্তে গল্পের গতি স্তিমিত হয়ে এলো, আস্তে আস্তে ওদের চোখ ভেঙ্গে এলো ঘুমে আর কখন জানি ওরা গভীর প্রশান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লো বারান্দার ওপর।

সেই রাত্রে কেষ্টর বউ দেহ মনের চরম সন্তুষ্টির ভেতর দিয়ে টের পেলো নতুন এক শিশু আসবে তার ঘরে।

কিন্তু এই শান্তি মগ্ন পৃথিবীর মাঝে গভীর সন্তুষ্টিতে নিদ্রামগ্ন চাষী পাড়ায় ঘুম এলো না শুধু মেজগিন্নির চোখে।

ব্যাঙ ডাকছে খালধারে আর আশেপাশের খানা ডোবায়। কোটি-

কোটি ঝিঁঝির ডাকে পা ফেলে-ফেলে জোছনার পরীরা ঢিমে তালে নেচে চলেছে মাঠে বাটে উঠোনের ওপর। ঠাণ্ডা বাতাসে তাদের খসে পড়া ওড়নায় যেন মাঝে মাঝে ঢেকে যাচ্ছে মাটির বুক। আজ আর শকুন শিশুর আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে না, চাতকের করুণ কান্নাও থেমে গেছে। শুধু মাঝে মাঝে নীড়হারা পাখীদের ডানা ঝাপটানির শব্দ আসছে, পাখনা থেকে তারা জল ঝাড়ছে এখনও।

মাটির গন্ধ বাতাসের আমেজ আর ঝিঁঝির ডাক শুনে শুনে মেজগিন্নি বুঝতে পারে কাল সকালে মাটির বুকে জো নামবে, দুদিন বাদে নতুন ধানের চারায় ভরে উঠবে এতদিনের শুকনো মাঠ আর বিল, পথে ঘাটে আর বনে জঙ্গলে নতুন চারা মাথা গজাবে, গাছের পাতা ঘন সবুজ হয়ে উঠবে, পোকা মাকড় থেকে সুরু করে ব্যাঙেরা পর্যন্ত ডিম পাড়বে, পাখীরা আবার বাসা বাঁধবে নতুন করে। সে আরও বুঝতে পারে, রাত্রি আজ চাষীপাড়ায় মিলনের বাসরে পরিণত হয়েছে, চাষীবউরা তীব্র আনন্দের এই মধুলগ্নে আপন দেহে সন্তানদের ডেকে আনবে।

মেজগিন্নি নিজের ছায়ার দিকে তাকায়। ল্যাম্পের কম্পিত আলোয় দুলছে ছায়াটা। সে-ছায়ার সর্বাঙ্গে এক নিখুঁত নিটোল যুবতীর প্রতিমূর্তি এঁকে আছে। মেজগিন্নি নিজের গণ্ডে হাত বুলায়, দুটো আঙুল দিয়ে ঠোঁট দুখানা স্পর্শ করে। ভরা যৌবনের নিটোল স্পর্শে সর্ব অঙ্গ তার শির্-শির্ করে ওঠে। উঁচু দুটি বুকে হাত দিয়ে সে চমকে ওঠে, অনেক শিশুর কান্নায় তার সারা মন চঞ্চল হয়ে ওঠে, এখনি কোনো শিশুর মুখে তুলে দেওয়ার মতো করে সে স্তনদুটি তার এগিয়ে ধরে।

ঠিক সেই সময় তার দৃষ্টি পড়ে খেজুর পাতার পাটিতে শুয়ে-থাকা ভগীরথের দিকে। একটা মানুষের কঙ্কাল পড়ে আছে তার সামনে।

বয়সের প্রান্ত সীমায় এসে দিন গুণছে একটা লোক। তার মাথার পাকা চুল উস্কো-খুস্কো, গায়ের চামড়া জড়ে-জড়ো, হাতের আর বাহুর পেশী সূতোর মতো সরু, গলার হাড় শকুনের ডানার মতো, মেরুদণ্ডটা বেঁকে ধনুকের মতো হয়ে গেছে। ভগীরথের পড়া দাঁতের ফাঁক দিয়ে ফ্যাকাশে ওষ্ঠের ওপর দিয়ে লালা গড়াচ্ছে আর নিশ্বাস-প্রশ্বাসে 'ফকাৎ' 'ফকাৎ' শব্দ উঠছে। মাঝে মাঝে ঘুমের ঘোরেও সে কেসে উঠছে খুক্-খুক্ করে আর মুখের কাছে জমা লালা ফেলে দিচ্ছে, গায়ের জোরের অভাবে কখনো কখনো পাটিতেই পড়ে যাচ্ছে লালার দলা। ল্যাম্পের আলোয় মনে হচ্ছে, যেন একটা বৃদ্ধ পশু অন্ধকার গুহায় মরে যাচ্ছে আর শেষবারের মতো নড়ে নড়ে উঠছে এক আধবার।

মেজাগিন্নির সারা অন্তর হাহাকার করে ওঠে, সারা অঙ্গ ভেঙ্গে পড়ে বেদনায়। এই কি সেই চাষী যে তার জীবনে ফুল ফুটাবে, ফসল ফলাবে, ফল ধরাবে!

মেজগিন্নির কানে আর একটি মেয়ের কান্না ভেসে আসে বাছাড় বাড়ী থেকে। আর্তনাদ করছে রাম বাছাড়ের ছেলে সহদেবের বউ। বিল অঞ্চলের সবার মতো করেই মেজগিন্নি জানে প্রৌঢ় রাম বাছাড় এই মুহূর্তে বড় ঘরের দরজা বন্ধ করেছে তার বহু দূর সম্পর্কের তথাকথিত বোনকে নিয়ে। দক্ষিণের ঘরে সহদেব আর তার স্ত্রী। বউটির এখনও বয়স হয়নি; যুবক সহদেবকে সে খুশী করবে কেমন করে। সহদেব তাই রেগে যায়, বউকে মারে। বউটি কেঁদে ওঠে বাবা আর মায়ের নাম করে। সহদেব তখন রাগে উন্মাদ হয়ে লাথি মারে, চুল ধরে টেনে বাইরে ফেলে দেয়, তারপর সশব্দে দরজা বন্ধ করে খিল এঁটে দেয়। বালিকা বউটি ভয়ে আর যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে ওঠে। আজও বউটি তেমনি আর্তনাদ করে শান্ত রাত্রি করুণ করে তুলেছে।

মেজগিন্নির হৃদয়ও আর্তনাদ করে উঠতে চায়। বাছাড়ের ঘরে

যে নিষ্ফলতা, সহদেবের ঘরে যে ব্যর্থতা, ভগীরথের দিকে চেয়ে চেয়ে এই মুহূর্তে মেজগিন্নিও সেই নিষ্ফল ব্যর্থতার যন্ত্রণাদায়ক বেদনা অনুভব করে আপন বুকে।

তবু মেজগিন্নি উপুড় হয়ে পড়ে ভগীরথের ওপর। আস্তে আস্তে নাড়া দিয়ে দিয়ে জাগাবার চেষ্টা করে তার মুমূর্ষু পুরুষকে, ধরা গলায় ডাকে—শুনতিচো, ওগো, শুনতিচো—

ভগীরথ পাশ ফিরে শোয়, কি-যেন বিড়বিড় করে বলে ঘুমের ঘোরে, তারপর আবার তেমনি করেই ঘুমিয়ে পড়ে।

মেজগিন্নি তবু ডাকে—হ্যাদ্দ্যাখো, চোক ম্যালো—

ভগীরথ এবারে আর নড়েও ন, কথাও বলে না। তার পড়া দাঁতের ফাঁক দিয়ে আবার লালা বেরিয়ে এসেছে।

মেজগিন্নির মন সৃষ্টি বেদনায় ভেঙ্গে পড়ছে। সারা হৃদয় তার কেমন যেন কাঁপতে থাকে, দুটি চোখ তার টল্‌-টল্‌ করে ওঠে কামনার ভারে। আস্তে আস্তে সে বসে পড়ে ভগীরথের পাশে, আস্তে আস্তে সে ভগীরথের অঙ্গে অঙ্গ রাখে, অতি সন্তর্পণে ভগীরথের বুকের ওপর মাথাটা ঝুলিয়ে দেয়। আর অতি দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসের চাপে সে হাঁপাতে থাকে, সারা দেহ তার কাঁপতে থাকে ঠক্‌ ঠক্‌ করে।

ভগীরথ তখনও ঘুমে অচেতন।

এগারো

পরদিন ভোরে নবীনের চিৎকারে ঘুম ভেঙ্গে গেল মাদারীর। গোয়ালের কানাচ থেকে নবীন চেঁচাচ্ছে—ওরে জোঙালখান কইরে? কাছি, ওরে আমার নাঙ্গলে জুতবার কাছি কনে?

মাদারী জেগে জেগে শুনতে লাগলো নবীনের চেঁচামেচি। ও বুঝতে পারে, অনেক দিনের ঘুমিয়ে-পড়া কর্মঠ চাষী আজ কালবোশেখীর ছোঁয়াচ লেগে জেগে উঠেছে নবীনের ভেতর। নবীনের এত উৎসাহ, এত কাজের ইচ্ছা, এই ক্ষিপ্র চাঞ্চল্য—আগের দিনে এরা সব মাদারীকেও ছুটিয়ে তুলতো ক্ষিপ্রা হরিণীর মতো। কিন্তু আজ ওর দুঃখ হয় নবীনের জন্যে, দুঃখ হয় নবীনের মতো শত-শত চাষীর জন্যে। মাদারী শুয়ে থাকে জড়পিণ্ডের মতো, নড়বার জন্যে এতটুকু চেষ্টাও করে না।

নবীনের চিৎকার থামছেই না। চেঁচাতে চেঁচাতে এক-একবার সে উঠোন পর্যন্ত আসছে, আবার কানাচের দিকে ফিরে যাচ্ছে—ওরে, নাঙ্গলের ধারকাঠ কনে গেল, হায়? শালি বোধ করি উনোনে পুড়ায়েচে। পুড়ালি তো নাঙ্গলের ফালখানও পুড়ালি, ও শালি!

হায়, নুয়ার ফাল দিয়ে উনোন না জ্বালালি তুমার মাথায় ঘুঁটে ভাঙ্গবে কিডা? গোয়াল ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে জবাব দিল মাদারী।

নিজের বুদ্ধি সম্বন্ধে এহেন সহৃদয় মন্তব্যে নবীন লাফিয়ে উঠলো এবং ডান হাতে ধরা লাঙ্গলের ইস্-খানা ঘাড়ে ফেলে প্রায় ছুটেই এলো মাদারীর সামনে। রাগে তার সর্বশরীর ততক্ষণে কাঁপতে সুরু করেছে। ঘাড়ের ইস্-খানা দু'হাতে উঁচু করে ধরে নবীন ক্রুদ্ধ কণ্ঠে চেঁচিয়ে বললে—ও শালি, অ্যাখোন জমি চষপো কি তোর—

অশ্লীল শব্দগুলোর ওপর সে এত জোর দিলে যে, মাদারী খিল-খিল করে হেসে ফেললে।

মাদারীর হাসি দেখে নবীন একেবারে চুপ্‌সে গেল। রাগ অবশ্য তার পড়েনি। ইস-খানা মাটিতে নামিয়ে গামছা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বললে—বুলি নিচ্‌কোচ্চিস কি দেখে, আমার কি রূপ উঠেছে অ্যায়?

—না, তুমার রূপ দেখে না, ভাব দেখে। মাদারী হাসি

থামিয়ে জবাব দেয়। মুখখানা মাদারীর এমন গম্ভীর যে, সে-যে সত্যি কথা বলছে সে-সম্বন্ধে নবীনের আর সন্দেহ থাকে না। তার রাগ থেমে যায় একেবারে।

—তয়? তয় কিসির জন্যি হাসতিলি? জিজ্ঞাসা করে নবীন।

—তুমার মাথায় পাগল ভর করেছে দেখে।

নিজের বুদ্ধি সম্পর্কে পুনরায় এমন রুচিকর মন্তব্য শুনে নবীনের ভাল লাগে না। চেষ্টা করে একটু উষ্ণ হয়েই সে বলে—পাগল আমার মাথায় না তোর মাথায় ভর করিচে শুনি। বিষ্টি হয়েচে, জমিতি জো হয়েচে। জমি চষপো, তা এর মধ্যি তুই পাগল দেখলি কুনডা?

—ছাখপা তালি, কুনডা পাগল দেখিচি, ছাখপা?

মাদারী শাসাচ্ছে বলে মনে হলো নবীনের। মেয়েমানুষের শাসানীতে ঘাবড়ে যাবে এমন মন্দ নবীন নয়। রুখে উঠে বললে—হ্যায়, ছাখপো। ছাখা, কি ছাখাবি ছাখা—

—আসো এই দিকি—বলে মাদারী নবীনকে হাত ধরে গোয়ালের দরজার সামনে দাঁড় করিয়ে দিলে। তারপর গোয়ালের ঝাঁপ খুলে ভেতরে আঙ্গুল দেখিয়ে বললে—ছাখো, দেখতি পাচ্ছো।

নবীনের মাথায় অকস্মাৎ কে যেন প্রকাণ্ড মুগুর দিয়ে ঘা মেরে মাটিতে বসিয়ে দিলে। দু'হাতে মাথা ধরে বসে পড়ে নবীন শুধু দু'হাটুর ভেতর দিয়ে নিচু হতে হতে মাটিতে মিশে যেতে লাগলো।

মাদারী আবার বললে—কাজলা যেন্ নেই, তা তুমি জানতে না, না? ওই একখান হাড়কাষ্টি হাবলারে নিয়ে যদি ভূঁই চষতি পারো তো যাও, আমিউ উনোনেত্তে ফাল তুলে আনে দিচ্ছি।

মাদারীর তিক্ত শ্লেষে যন্ত্রণা বোধ করতে থাকে নবীন। মুখ দিয়ে তার কথার পরিবর্তে গোঙানীর মত একরকম শব্দ বেরোয়। সারা দেহটা তার কুঁকড়ে কুঁকড়ে গোল হয়ে যেতে থাকে।

মাদার্‌ ্‌ষ্ট হয় স্বামীকে এইরকম কটূক্তি করে। কাজলা যে মরে গেছে সে কথা নবীন হাড়ে হাড়েই জানে, জমি চষবার আকস্মিক উত্তেজনাতেই-না সে একমুহূর্তের জন্যে ভুলে গিয়েছিল সেই নিদারুণ কথাটা। এমনি উত্তেজিত আনন্দের মধ্যে শ্লেষের আঘাত দিয়ে এই করুণ ঘটনাটা স্মরণ করিয়ে দিয়ে স্বামীর বুকে শেল হানবার অপরাধে মাদারীর বুক কন্‌ কন্‌ করে।

নবীন বুক ধরে জরাজীর্ণ মানুষের মতো ঝুল দিয়ে দিয়ে ক্লান্ত পা ফেলে ফেলে উঠোন পার হয়ে বারান্দার দিকে চলে যাচ্ছে আর মুখ দিয়ে তার কাতরানির শব্দ বেরুচ্ছে ওহ্‌-ওহ্‌ করে।

মাদারীর চোখের সামনে কাজলার মৃত্যুর দৃশ্যটা ভেসে ওঠে ছায়াছবির মতো। কাজলা মরছে, ধীরে ধীরে, গলা লম্বা করে, পা চারখানা প্রসারিত করে করে……

নবীনের বাড়ীতে যে অবস্থা দেখা দিল, সাতভিটে, রাজাপুর হরিদাসকাটী, গাবোখালী নাউলী—সারা বিল অঞ্চলের চাষীদের গ্রামে গ্রামে বাড়ীতে বাড়ীতে প্রায় সেই একই অবস্থার সৃষ্টি হলো। কারো একটা বলদ নেই, কারো দুটোই নেই, কারো বা লাঙ্গল চষবার সমর্থ ছেলে নেই। প্রায় প্রতি বাড়ীর লোকেই আকস্মিকভাবে বেদনা ও দুঃখ অনুভব করলো। তারপর খুঁটিনাটী ঝগড়া বাধলো মেয়ে পুরুষে, ফলে স্তব্ধ হয়ে যে যেখানে পারে খুসীমত বসে রইলো এবং বেলা বাড়লে পুরুষরা বাড়া থেকে বেরিয়ে হয় রাস্তায়, না হয় বিলে, আর না হয় খাল ধারে গিয়ে জমা হলো। জমি চষবার সুসময় তাদের সামনে দিয়ে পার হয়ে গেল।

খালধারে গিয়ে ওরা দেখলে গত সন্ধ্যায় যে-খালের তলা জলভরা ছিল, তীব্র স্রোতের বেগে যে-খাল দিয়ে ডালপাতা ভেসে গেছে, সে-খালের তলায় আগের মতোই বালির চড়া পড়ে আছে আজ। তফাতের

ভেতর আজকের বালি চপ্‌চপে, আগের মতো চক্‌চকে নয়, সকালে রোদ লেগেও চোখ ঠিক্‌রে যায় না। পাড়ের দিকে যায়গায় যায়গায় বেনা ঝোপের আড়ালে কোলা ব্যাঙ আর সোনা ব্যাঙ জোড়া বেঁধে বেঁধে বসে আছে। ঝোপ ঝাড়ের রঙ একরাত্রে অনেকটা পাল্টে গিয়ে সতেজ হয়েছে। খালের ওপারে মাঠ, মাঠ ছাড়িয়ে বিল। মাঠ আর বিলের মাটি থেকে ধোঁয়ার মতো বাষ্প উঠছে পাকিয়ে পাকিয়ে, সকালের সূর্যের আলোয় সারা মাঠ আর বিলের বুকে দু'হাত উঁচু ঘন কুয়াশার স্তর দেখা দিয়েছে, রোদ লেগে লেগে তার ওপর রামধনু সৃষ্টি হয়েছে কত যায়গায়।

সারা বিলে একখানা লাঙ্গলও নামেনি এই সকালে। শুধু মাঠের ওপারে প্রতাপনগরে রায়দীঘির নিচে রায়বাবুদের সাড়ে তিনশো বিঘে খামার জমির একটি প্রান্তে তাদের তিন সরিকের নিজস্ব খান দশেক লাঙ্গলে সার বেঁধে জমি চষা হচ্ছে। তার থেকে আরো দূরে এক যায়গায় ঘোষবাবুদের তিনখানা, চক্কোত্তি মশাইয়ের একখানা, মিত্তিরবাবুদের দু'খানা, বাঁড়ুজ্জেবাবুদের তিনখানা—এমনি ক'খানা করে বাবুপাড়ার সঙ্গতিপন্নদের ঘরোয়া লাঙ্গল জমিতে নেমেছে মাত্র। বাবুদের খামার জমির তুলনায় লাঙ্গলের সংখ্যা যেমন কম সারা মাঠ আর বিলের ভেতর এই ক'খানা লাঙ্গল তেমনি অসীম সমুদ্রের ভেতর খান চারেক জাহাজের মতোই দেখাচ্ছে।

পাখীরা উড়ে উড়ে আজ মাঠে আর বিলে পড়ছে, আবার উড়ছে আবার পড়ছে। সাদা বকেরা ঝাঁকে-ঝাঁকে বিলের তলায় বসছে যেখানে খালের জল কাল সন্ধ্যায় বয়ে এসেছিল। কাঁটাসার দু'চারটী গরু মাঠে আর বিলে নেমে মুখ নামাচ্ছে আর তুলছে, আকাশের দিকে নাক করে দম টেনে নিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে ভর্‌-র্‌ ভর্‌-র্‌ শব্দ করে করে। দু'চারটে ছাগলের একটা দল মাঠের ওপরের দিকটায় ঘুরে ঘুরে ছুটছে।

চাষীরা দেখছে আর দুঃখের ভারে থমকে দাঁড়াচ্ছে, আবার পা টেনে টেনে চলছে, বেশী কথা বলছে না কেউ কারো সঙ্গে।

দুপুরবেলা নবীনের সেই ঘর গাঁথবার গাঁতার দলটা বসলো নবীনের বাড়ীতেই পরামর্শ করতে।

হিসেব করে ওরা দেখলো ওদের পাঁচজনের মোট দামড়া গরু আছে পাঁচটা, নবীন কেষ্ট আর হরিবোলের একটি করে দামড়া আছে, ভগীরথের মোটেই নেই, আর ভীমের ছেলে মরলেও দামড়া মরেনি, পুরোপুরি এক জোড়াই বজায় আছে।

কিন্তু পাঁচটা বলদে তো আর তিনখানা লাঙ্গল চালানো যায় না, অন্ততঃ আর একটা চাই। তার ভেতর ভগীরথের মোটেই গরু নেই, তাহ'লে সে ভাগীদারই বা হয় কিভাবে। দু'টো দামড়া একসঙ্গে মরার অপরাধে ভগীরথের অত্যন্ত দুঃখ হয় এবং ওদের করুণা উদ্রেক করার জন্যে নানাকথা বলে। আর সবাই একরকম নিমরাজী হলেও ভীম আমতা আমতা করে, তার দু'টো গরুই আছে যে।

ভগীরথ শেষে বলে যে, তার দামড়া দুটোকে তো আর গোভাগাড় থেকে তুলে আনা যাবে না। তবে, তার "কপিলে" নামে যে গাইটা আছে, যেটা দিয়ে অনেক আগে সে দুএকবার লাঙ্গল চষেছে, সেইটেকে একটা দামড়ার পাশে জুড়ে আর একখানা লাঙ্গল বাড়াতে ওরা যদি রাজী থাকে তাহলে ভালই, না হ'লে আর কি হবে, এবার না হয় সে গাঁতা থেকে সরেই থাকবে, তার জমিতে না হয় লাঙ্গলই পড়বে না, ভাগ্য যার মন্দ তার আর—ইত্যাদি ইত্যাদি।

কাজেই অনেক কথা কাটাকাটির পর ঠিক হ'ল হরিবোলের জোয়ান দামড়ার পাশে মেজগিন্নির সেবা যত্নে পুষ্ট 'কপিলে'-কে ভালই মানাবে।

জমিদার কাছারী থেকে দলে দলে বরকন্দাজ বেরিয়ে চাষীদের

গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে কাছারীর হুকুম জানালে—কাল ভোরে সবাই যেন লাঙ্গল আর গরু নিয়ে কাছারী বাড়ী হাজির হয় বার্ষিক বেগারে রায়বাবুদের সাড়ে তিনশো বিঘে জমি চষবার জন্যে। দু'একজন প্রবীন চাষী সন্দেহ জানিয়ে বললে যে, মড়কে গরুতো বেশী ছিল না, যা-ও ছিল বাকী খাজনা আর মহাজনের দেনা দিতে বেচে দিয়েছে। লাঙ্গল থাকলেও অনেকের গরু নেই, কাজেই ইচ্ছে থাকলেও সবাই গিয়ে বোধহয় লাঙ্গল দিতে পারবে না রায়বাবুদের জমিতে।

বরকন্দাজরা হুঙ্কার দিয়ে এমন নির্মম শাস্তির কথা বলে গেল যে সে-কথা শুনে স্বয়ং যমরাজেরও পিলে না চমকে পারে না। চাষীরাও বুঝলো, যে অসম্ভবকে সম্ভব করার জন্যে নায়েব এবার মরিয়া হয়ে চরম একটা কিছু করবেই।

সন্ধ্যাবেলা আজও ঝড় বৃষ্টি হলো, তবে আগের দিনের মতো অত জোরালো নয়। সারা রাত্রি ধরে ঠাণ্ডা বাতাস বইলো, ব্যাঙ ডাকলো, ঝিঁঝি ডাকলো, চাঁদের ওপর দিয়ে মেঘ ভেসে গেল। এবং পর দিন ভোরে যখন প্রথম রোদের আভায় সারা মাঠে আর বিলে কুয়াসায় আর কিছু দেখা গেল না তখন নবীনের দল লাঙ্গল গরু নিয়ে জমি চষতে লেগে গেল।

ওদের চারিপাশে নিকটে আর দূরে জমি চাষ-করা লোকের গলার স্বর, মাটী ফাটবার আর আগাছা ছিঁড়বার শব্দ উঠছে। নবীন ভীমকে তিরস্কার করলো দেরী করে আসবার জন্যে। বাঁ-পাশে ভগীরথ আর হরিবোলে মারামারি বাধবার যোগাড়। ভগীরথের 'কপিলে'র সঙ্গে হরিবোলের দামড়ার এমন ভাব জমে গেছে যে, লাঙ্গলে জুতে দিলে হরিবোলের দামড়া কপিলের দিকে আড় চোখে চেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে আর নাক দিয়ে এক রকমের শব্দ করছে, মাথাও ঝাঁকাচ্ছে মাঝে মাঝে। ভগীরথ রেগে গিয়ে দামড়াকে মারতে

চায়, হরিবোল আপত্তি জানিয়ে বলে যে, তার হাড়সার দামড়া হেলো-পাঁচনির বাড়ি খেলে বাঁচবে না, তাছাড়া দোষ তো ওই কপিলেরই।

ভীম বললে—হেই হরে, তোর দামড়ার কিন্তুক মান পচিশোন বোধ আছে, মায়ে মানষির সঙ্গে কাজ করতি চাচ্ছে না, বুঝিচিস্। আর জন্মে বোধ করি ও লায়েব ছিলো।

সবাই হেসে উঠলো হো-হো করে।

জমি চষাটা অত সহজ হলো না। বে-জোড়ের গরু দিয়ে চষতে গিয়ে ওরা দেখলো যে প্রায় নতুন করেই লাঙ্গল টানা শেখাতে হচ্ছে গরুগুলোকে। যে-জমি একখানা লাঙ্গলে চষা যেতো, তিনখানা লাঙ্গলে চষেও তা শেষ করা যাচ্ছে না।

পেছনের দিকে একটা হাসির রোল উঠতেই নবীনরা তাকিয়ে দেখলো একটা গাই গরুর সঙ্গে লক্ষ্মণ সর্দার একটা এঁড়ে গরু জুতে দিয়ে লাঙ্গল চষবার চেষ্টা করছে।

ভীম রসিক লোক। বললে—হদ্দ্যাখো, হদ্দ্যাখো দাদা, শালা অ্যাকেবারে সদর লায়েব জুতেছে ছিরিমোতির সঙ্গে। অ্যায়!

প্রাণ খুলে হাসলো মাঠশুদ্ধ লোক।

কিন্তু দেখা গেল সদর লায়েবের 'মান পচিশোন' সত্যিই অনেক বেশী। সে জোয়াল ভেঙ্গে জোতের দড়ি ছিঁড়ে ছিরিমোতিকে তাড়া করে ছুট দিয়েছে। লক্ষ্মণ সর্দার 'ধরো, ধরো' করে তাদের পেছনে ছুটছে হেলোপাঁচনি উঁচিয়ে।

কাছে আসতেই নবীন ছিরিমোতির দড়ি ধরে ফেললে এবং সদর লায়েব সুবোধ বালকের মতো দাঁড়িয়ে গেল তার পেছনে।

নানাপ্রকার অশ্লীল ভাষার ভেতর দিয়ে লক্ষ্মণ যা বললে তাতে বোঝা গেল যে, একটা দামড়া মরেছে তার গো-মড়কে, আর একটা গেছে নায়েবের পেটে। এদিকে জমিতে প্রথম জো নমেছে।

কাজেই উপায়ান্তর না দেখে সে একটা বুদ্ধি ঠাউরেছিল কাল বিকেলে, তার গাইটার সঙ্গে প্রতাপনগরের বাঁড়ুজ্জে মশাইদের ধর্মের ষাঁড়টা জুতে দিয়ে এবারকার মড়কটা একরকমে চালিয়ে নেবে সে। সন্ধ্যের অন্ধকারে তাই সে গাইটাকে নিয়ে গিয়ে ষাঁড়টাকে ভুলিয়ে এনে উঠোনে বেঁধে রেখেছিল রাত্রে। গাই আর এঁড়ে দিয়ে যে লাঙ্গল চষা যায় না এটা তার শোনা ছিল, বিশ্বাস ছিল না, সে-সত্যটা আজ সে হাড়ে হাড়ে বুঝেছে। এখন উপায় কি! লক্ষ্মণ প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়েই উপদেশ চাইলো সবার।

গম্ভীর মুখে ভীম বললে—উপায় অ্যাট্টা আছে, খুব ভাল উপায়।

অন্ততঃ একটা তৃণও পাওয়া গেছে মনে করে অতিশয় ব্যগ্রভাবে লক্ষ্মণ বললে—কওদিন ভাই, শীগগীর কও, ওদিকি আবার জো সরে যাচ্ছে।

ভীম বললে—ইনারগে দুই জনরে পিরতাপনগর নিয়ে যাও। তারপরে কালীবাড়ীতি জোড়ে পিরণাম করায়ে একদমে বাঁড়ুজ্জে বাবুরগে বাড়ী নিয়ে তোলোগে। বাঁড়ুজ্জে কত্তারে কওগে—এই নেন কত্তা, আপনার পুতির বউ আনিচি, ঘরে তোলেন অ্যাখোন।

লক্ষ্মণ অতি কুৎসিৎ খিস্তি করলো। মাঠশুদ্ধ লোক আবার হেসে উঠলো। কিন্তু নবীন হাসতে পারলো না। সে বুঝলো লক্ষ্মণের বেদনা কোথায়। শুধু লক্ষ্মণ নয়, অনেকজনই আজ লক্ষ্মণের দশায় পড়েছে। লক্ষণের ওপর একটা মমতাবোধ করলো নবীন।

মাঠের ওপারে চেয়ে দেখলে ওরা। রায়বাবুদের সাড়ে তিনশো বিঘে জমি চষা হচ্ছে। কিন্তু অন্যবারের মতো অনেক লাঙ্গল পড়েনি সে-জমিতেও। রায়বাবুদের নিজেদের খানদশেক ছাড়া আর বোধ হয় মাত্র খানছয়েক লাঙ্গল বেশী পড়েছে।

সারা মাঠে আর বিলে লাঙ্গলের সংখ্যা অনেক কম। অন্যবারের মতো কেউ গান গাইছে না। গরু না-থাকার নানা সমস্যায়

ঝালাপালা হতে হতে খিট্‌-খিট্‌ করতে করতে একঘণ্টার জমি চারঘণ্টায় চষছে সবাই।

নবীনের বুক থেকে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। না, এবার আর বিল উঠবে না, ফসল ফলবে না, মা লক্ষ্মী আর সোনার ধানের পানসি চড়ে চাষীর ঘরে পা ফেলবেন না।

রায়কাছারীর পেয়াদা আর বরকন্দাজরা মাঠে মাঠে ঘুরে ঘুরে জানিয়ে গেল—কাল সকালে সবাই যেন লাঙ্গল গরু নিয়ে কাছারী যায় এবং রায়মশাইদের খাস জমি চাষ করে আসে। এবার বাবুরা খুব সদয় হয়েছেন, বেগার দিতে হবে না, জমি চষলে তার বদলে পয়সা দেবেন। অবশ্য বেগার একটা দিতেই হবে, রেওয়াজ যখন আছে, তা সে যেদিন খুসী দিলেই চলবে। তাছাড়া, যারা বেগার দিতে যাবে তাদের ভোজ খাওয়ানো হবে, আর সে কি যে-সে ভোজ নাকি! সন্ধ্যার সময় প্রতাপনগরের বাজার থেকেও সবাই ওই এক কথাই শুনে এলো, বাজারে কাড়া দিয়ে কাছারী থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু কাছারী থেকেই নয়, প্রতাপনগর, ঢাকুরে, নরেন্দ্রপুর প্রভৃতি গ্রামের অবস্থাপন্ন তালুকদার, গাঁতিদার, মহাজন অর্থাৎ হরকছম জোতদারদের সবাই চাষীপাড়ায় লাঙ্গল ডাকতে ও খুঁজতে লোক পাঠিয়েছে।

—না, না, না—কিছুতিই না!

রুখে উঠলো হরিবোল। পিঠখানা নবীনের দিকে ফিরিয়ে দিয়ে বললে—ছাদ্যাখো কাকা, পিঠির চামড়াত্তে আজো মিলোয়নি লাথি আর লাঠির দাগ। কুন মুখি নাঙ্গল নিয়ে যায়ে দাঁড়াবো তারগে জমিতি ব্যাগার দিতি?

ভীম বললে—ধোস্‌, এর জন্যি আর ভাবে মরিস ক্যানো। এই শোন, নাঙ্গল নিবি, জুঙাল নিবি, জোতের দড়ি ভাঁড়ের কানাচের

মতো গলায় বাঁধবি। লায়েবরে বুলবি, পদোধূলির সঙ্গে গুণে গুণে সাতটা লাথি মারেন এই পিঠি। তারপর বুলবি, গরু যখোন নেই লায়েবমশাই তখন হুকুম দেন জুঙালের একদিকি আমি, আর একদিকি আমার বউ দাড়াচ্ছি। জুতে দিয়ে আর অ্যাট্টা লাথি মারেন, ঘোড়-দোড় দিয়ে রায় সড়ক এক দমে চষে ফেলি।

ভগীরথ বললে—হ্যাদ্দ্যাখ্ ভীম, এই হ্যাখ্ মুখ, এই হ্যাখ্ পিঠ আর এই হ্যাখ্ বুক। অ্যাতো দাগ যদি থাকতো তোর পিঠি তো অ্যামোন তামেসাডা করতি পারতিসনে মুখ ফুটে।

নবীনও উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। বললে ঠিক কইচো তুমরা। অত্যেচার আর অত্যেচার! তারগে বাড়ী নাঙ্গল ঘাড়ে করে ব্যাগার আমরা দেব ক্যোমন করে! তুই যা-দিন্ হরিবোল, নবোরে অ্যাট্টা খবর দিয়ে আয়গে।

বিকেল বেলা বৈঠক বসলো নবীনের বাড়ীতে। যুবকরা তো বেগার দেবে না বলে একপায়ে খাড়া। কিন্তু বৃদ্ধ যুধিষ্ঠির মণ্ডল বললে—অতো লাফায়ে না বাবা সগোল। অনেক দেখিচি এই পুড়া চোখি। কাচারীর ঘোলায় অনেক হাতীঘুড়া তল গেছে, তুমরা তো কুন মশামুশো!

নব বললে—সারা জনম ধরে যারগে কাছে পালাম শুধু মার-ধোর কানডলা, পালাম ধান-কাটে নিয়ে উপোষ দিয়ে মারা, মড়ক ছড়ায়ে শেষ সম্বোল কাড়ে নিয়া, তারগে বাড়ী আজ আর বেগার দিতি যাই ক্যোমন করে, ও মোড়ল কাকা? মার খাতি খাতি আজ যে-যাগায় আসে দাড়াইচি আমরা, তার পিছনে পলাবার যায়গা নেই আর। অ্যাখোন খুটি দিয়ে দাঁড়ানো ছাড়া আর পথ আছে কুনডা?

যুধিষ্ঠির মণ্ডল তবু বললে বিচক্ষণের মতো ধীরে ধীরে—অতো রোখ দেখায়ে লাভডা কনে। যে রোখ কাজে খাটানো যায়, সেইডেই

ত্যাখানো ভালো। কাচারী হলো কাঁচা-খেগো দেবতা, পালার ভোগ দিতিই হবে, না দিবা তো দেশশুদ্ধো গিলে খাবে।

ঘরের ঝাঁপের পেছন থেকে এর জবাব দিলে মেজগিন্নি—তিষ্টার জল বন্দো করে দিয়ে তিনবেলা ঘরের মায়ে মানুষির হাত ধরে যারা টানতি যাচ্ছে তারগে পা চাটতি দল বাঁধে না গেলি মদ্দ মানুষগের আর মান থাকপে কিসি ?

তাজা ক্ষতের ওপর আঘাত দিয়েছে মেজগিন্নি। তীব্র যন্ত্রণায় সবাই যেন চিৎকার করে উঠতে চায়। সবার চোখ দিয়েই আগুন ছুটে যায় যুধিষ্ঠির মণ্ডলের দিকে।

নব চাইলে ঘরের দিকে, চোখে তার সকৃতজ্ঞ প্রশংসা। সে-দৃষ্টি ধরা পড়ে মেজগিন্নির চোখেও।

না, বেগারের লাঙ্গল ওরা দেবেনা। জমিদারের জমিতেও নয়, উদ্ধব ঘোষের জমিতেও নয়, ভদ্রলোকদের জমিতে তো নয়ই !

সিদ্ধান্ত শুনে হন্যে কুকুরের মতো ছুটে এলো বাছাড়। সামনে পা দিয়ে আঙ্গুল উঁচিয়ে বললে—সত্যিপীরির সঙ্গে চুলকো-চুলকি পাইচো হারাম-জাদারা। এই আমি বাদী হলাম, দেখি তুরা ব্যাগার দিস্ কি না-দিস্।

সত্যিই বাদী হলো বাছাড়। বাদী হলো বাছাড়ের বন্ধু গাবোখালীর উত্তম বিশ্বাস—সাতটা গোলার মালিক ; বাদী হলো কাটাখালির মহাদেব সরদার—দেড়শো বিঘে খামার জমির মালিক ; বাদী হলো বিল অঞ্চলের জোদ্দার মহাজন চাষীরা। মা কালীর ভোগ বন্ধ যেমন মহাপাতক, বেগার বন্ধও তেমনি। জমিদারের বেগার বন্ধ আর খাজনা বন্ধের মধ্যে তফাৎ নেই। এমন অঘটন তারা ঘটতে দেবে না। বেগার দিতেই হবে। কেউ না দেয় তারাই দেবে।

দু'দিন পরে যখন ভগীরথের বাড়ীতে ছোটখাটো বৈঠক বসলো তখন হতাশ কণ্ঠে নব বললে ভগীরথকে—মানুষ সব দামড়া গরু

হয়ে গেছে মাজদা। জমিদাররা জুতে গেছে গাড়িতি। লাঠি খায়েও যেমন চলে, ঘুগোয়ে ঘুমোয়েও তেমনি চলে।

ভগীরথ চিরদিনের কালিদাস। বলবার ইচ্ছে থাকলেও এতদিন ধরে সে মনের কথা চেপে ছিল। সে-ই কথা বললে নবকে সমর্থন জানিয়ে—ঠিক বুলিচো ভাই। ভগমানের পিরতিনিধি ভূস্বামী, তারগে সঙ্গে লড়া মা কালীর সঙ্গে লড়ারই সামিল। যদ্দিন ভগমান আর মা কালী আছেন তদ্দিন তা-যে পারা যাবে, সে বুলে তো আমার মনে লয় না। মা কালীর ইচ্ছে থাকলি সবারিতো এককাট্টা করে দিতি পারতেন, তা দেচ্ছেন না কেন।

ভগীরথের কথা ভালো লাগে না ওদের। কেউ এসে সাথীত্বের সমবেদনা জানাক, যুক্তির আলোয় উজ্জ্বল করে তুলুক অগম্য পথ, উৎসাহের তীব্রতায় দেহ মনে প্রবাহিত করুক দুঃসাহসী অভিযানের সংকল্পের স্রোত—ওদের নিরাশায় অন্ধকার মন উন্মুখ হয়ে ছিল এই আশায়। ভগীরথ যেন ওদের লুকিয়ে থাকবার গুহার মুখে পাথর চাপা দিতে চায়। নিজেদের দলে দুর্বলতা সৃষ্টিকারী এই লোকটার জন্যে করুণা হয় নবর।

—মা কালী! মা কালী ওর সব্বো ঘটে। পরের পা চাটতি মা কালী, বরকন্দাজের পেচ্ছাপ খাতি মা কালী, নায়েব মোরীর জুতো খাতি মা কালী, ঘরের-বউরি হাত ধরে টানলি সে-ও মা কালী। দেখতিচোনা, মা কালীর দয়ায় ওর দশটা গোলা দুধির বন্যেয় ঢেউ খাতিচে—তীব্র আক্ষেপে ভগীরথকে চাবুক মারে মেজগিন্নি। আর সবাই খুশী হয়, তাদের হয়ে মেজগিন্নিই যেন আঘাত করেছে ভগীরথকে।

বিবেচকের মতো থিতিয়ে থিতিয়ে হুঁকো টানতে টানতে বললে অধর গায়েন—সব কাজে ষোল আনা মিল করে এক দিনি কলি উল্টোবা—সিডাতো হয় না সব সুমায়। জল বন্দো, কি মায়ে মানষির

অপমান—এর বিরুদ্ধি দল বাঁধা যতো সহজ, এসব জমিজমা টাকা পয়সা স্বাথের বেলায় কাজটা ততো সহোজ না। যারগের কথা বুলতিচো তুমরা, তারা সব শুড়ীর বন্ধু মাতাল। জমিদার বলো, উদ্ধব ঘোষ বলো, রাম বাছাড় বলো আর উত্তম বিশ্বেস বলো—ইরা সব এক জাত, তফাতটা শুধো গাছের গুঁড়ির আর ডালের। ইরা তো বাদী হবেই। কাজ যারা করবে তারা সব আমারগে মতো পুকামাকড় ইঁদুর বাঁদর। সব অত্যোচার একদিনি ফুস্ মন্তোরে উড়োয়ে দিবা—সিডা হলিতো কলি উল্টোয়ে যাতো অনেকদিন আগেই। একদিনি না হোক দশদিনি, দশদিনি না হয় দশ বছোরে হবে। ততদিন ধীরি ধীরি পাতা খাও, ডাল খাও, শিকড় কাটো গত্ত খোঁড়ো—বুড়ো বটগাছ একদিন পড়বেই পড়বে।

গান গেয়ে ধরতাই দিতেই দেখেচে সবাই অধর গায়েনকে। কিন্তু সেই স্ফুর্তিবাজ লোকটার মুখ দিয়ে এই সন্ধ্যায় যে-কথাগুলো উচ্চারিত হলো, ওদের হতাশ হৃদয়ে বীজ মন্ত্রের মতো তা ধ্বনিত হতে লাগলো নতুন এক জ্ঞানময় অনুভূতির জাগরণে। নতুন আলোয় পথ দেখলো ওরা কঠিন কাজের, নতুন শপথে উদ্বোধিত হলো ওদের ম্রিয়মান অন্তর, উত্তেজিত হলো শীতল স্নায়ু আর শিথিল পেশী।

তামাদী খাজনা আদায়ের চেয়েও জোর তাগিদ চললো রায় বাবুদের জমি চষবার জন্যে। লাঙ্গল পাওয়া যাচ্ছে না বলে হন্যে হয়ে গেছেন নায়েব। চাষীদের বাগে আনা যাচ্ছেনা কিছুতেই, বেগার তারা দেবেনা বলে গোঁ ধরেছে বুনোশুয়োরের মতো। মাতব্বর প্রজাদের দিয়েও জমি চষা যেমন বিশেষ কিছুই এগুচ্ছে না, চিরদিনের অধিকারও তেমনি বজায় রাখার পথ হচ্ছে না।

মাঝে আর একদিন ঝড় বৃষ্টি হয়ে গেল অল্প-স্বল্প। এমন জো

নেমেছে মাঠে যে বিনা চাষেও ঝরা ধানের অঙ্কুর গজাচ্ছে, বাগঝামা গাছ ঘন হয়ে জমি ঢেকে ফেলছে এক এক রাতের ভেতর, কেউটী ঝোপে কোঁড় গজাচ্ছে, শোলাগাছের চারা উঠেছে। সারা বিলে আর মাঠে উদ্ভিদের জাগরণ সুরু হয়েছে, মাটি ফাটিয়ে তারা ওপর আকাশে চাইবার জন্যে উঠে আসছে ঘুম ভেঙ্গে ভেঙ্গে।

হাটবারের পরদিন লক্ষ্মণ সর্দারের ঘুম ভাঙ্গেনি তখনও। হাতে তার কোন কাজ ছিল না। গাইয়ের সঙ্গে ষাঁড় জুতে লাঙ্গল চষবার বৃথা চেষ্টার পর জমি ওঠাবার পণ্ডশ্রম সে আর করেনি। ঘরে খাবার লোকও তার বেশী নেই, একদিন জন বেচলে দু'দিন চলে এমনি অবস্থা। আজ আর কিষান দেওয়ারও ডাক ছিল না কোন বাড়ী থেকে।

রায় কাছারীর আট-দশজন বরকন্দাজ লাঙ্গল দেওয়ার জন্যে ছোটবড় ধানী অধানী, গরু-থাকা আর গরু-না-থাকা সব চাষীর বাড়ীতেই হানা দিতে দিতে লক্ষ্মণের বাড়ী এসে হাজির হলো। লক্ষ্মণের বউ উঠোনে কাজ করছিল। অতগুলো বরকন্দাজ দেখে সে ছুটে ঘরের মধ্যে পালিয়ে যেতে গেলে একটা জোয়ান বরকন্দাজ তার পথ আগলে হিন্দীতে বললে—হেই মাগি তোর ভাতার কই ?

লক্ষ্মণের বউ ভয়ে কাঁপচে তখন, কথা বলতে পারছে না মোটেই। কোন উত্তর না পেয়ে বরকন্দাজটা রেগে গিয়ে হেঁকে উঠলো অশ্লীল ভাষায়—হেই···মাগি !.ভাতারকে······ভেতর রেখেচিস নাকি ?

লক্ষ্মণের বউ ভীষণ ভয় পেয়ে আবার ঘরের ভেতর পালাতে গেল। বরকন্দাজটা আরও রেগে তেড়ে গেল তার পেছন পেছন। বউটা চিৎকার করে উপুড় হয়ে পড়লো বারান্দায় এবং হাতের কাছে যে মাটির শানকী ছিল সজোরে তাই ছুঁড়ে মারলো বরকন্দাজটার দিকে। বরকন্দাজটার মাথায় লেগে সেখানা ভেঙ্গে গেল খান্ খান্ হয়ে।

—জান গিয়—বলে কাটা মাথা ধরে বরকন্দাজটা বসে পড়লো উঠোনে। মাথা দিয়ে তার রক্ত পড়তে লাগলো ধারায় ধারায়।

সঙ্গীর দশা দেখে সব বরকন্দাজ এক সঙ্গে লক্ষ্মণের বারান্দায় উঠে পড়লো। লক্ষ্মণের বউ ততক্ষণে ঘরে ঢুকে চিৎকার জুড়ে দিয়েছে। লক্ষ্মণের ঘুম আচমকা ভেঙ্গে যেতেই আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তিবশে সে তড়াং করে ঝাঁপের দরজার ঠাসা নিয়ে লাফিয়ে পড়লো এবং দু'হাত দিয়ে সেই তালকাঠের ঠাসা ধরে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সর্বশক্তি দিয়ে সামনের বরকন্দাজটার ঘাড়ে মারলো বাড়ি। বরকন্দাজটা পিতৃনাম স্মরণ করে ছিটকে পড়লো বারান্দা থেকে উঠোনে। অন্য বরকন্দাজগুলো সমস্বরে চিৎকার করে দরজার সামনে গিয়ে পড়লো। লক্ষ্মণ ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে আর্তস্বরে চিৎকার করতে লাগলো।

গোলমাল ও চিৎকার শুনে বিপদে সাহায্য করার জন্যে প্রতিবেশী চাষীরা যে যেখানে ছিল ছুটে আসতে লাগলো লক্ষ্মণের বাড়ীর দিকে চিৎকার করতে করতে। একসঙ্গে অত লোকের চিৎকার শুনে বরকন্দাজরাও এমন ভয় পেয়ে গেল যে উঠোনে লাফিয়ে পড়ে লাঠি আর পাগড়ী ফেলে যে যেদিকে পারলো চোঁচা ছুট দিলে। নিশ্চয়ই গুরুতর অন্যায় করেছে, নইলে বরকন্দাজরা পালাবে কেন, মনে করে চাষীরাও তাদের তাড়া করলো। কাছারীর দুধে-ঘিয়ে পাকানো আদুরে-গোপাল দেহ নিয়ে বেশীদূর এগুতে পারলো না তারা। চাষীরা তাদের যেখানে-সেখানে ধরে ধরে আচ্ছা করে ধোলাই দিয়ে দিলে। দেশ থেকে নতুন এসেছিল এমন কর্মঠ জনা দুয়েককে ধরা গেল না। মাঠ পর্যন্ত তাড়া করেও, নানা কায়দায় তারা পালিয়ে গেল।

দুর্বিপাকের খবরটা তারা ভগ্নদূতের মতই হাঁপাতে হাঁপাতে কাঁদতে কাঁদতে যথাসাধ্য ফলাও করে বিবৃত করলো নায়েব মশাইয়ের শ্রীচরণে।

বারো

লক্ষ্মণ আর তার স্ত্রী-স২ সর্দারপাড়ার জনাকুড়িক লোককে পুলিশে গ্রেপ্তার করলো দাঙ্গা-হাঙ্গামা, মারপিট আর নরহত্যার চেষ্টার অভিযোগে।

শুনেই খাঁচা-বন্দী বাবদের রং-তামাসাটা কেমন চলচে হাজতে গিয়ে দেখে আসতে চাইলেন নগেন চক্কোত্তি। কিন্তু উদ্ধব ঘোষ ভদ্রলোক, মত দিতে পারলেন না তিনি। নগেন চক্কোত্তি অবশ্য তাতে দমবার পাত্র নন, চিৎকার করতে করতে সারা গাঁয়ে আর হাটে বাজারে জানিয়ে দিলেন সুসংবাদটা।

নব আর নবীন শহরে ছুটলো জামিন দিয়ে ওদের খালাস করবার জন্যে।

দিন কুড়িক পরে এক সকালে গ্রামবাসীরা সবিস্ময়ে দেখলো সুরকী-বাঁধানো পাকা সড়ক ধরে ট্যাক্সির মিছিল রায়বাড়ীর সদর গেট অতিক্রম করে ক্রমেই ভিতর মহলে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এমন ঘটনা কলিযুগে এই প্রথম। তারা দল বেঁধে ছুটে গেল রায়বাহাদুরকে সশরীরে দেখবার আশায়। কিন্তু প্রথম দেউড়ীর বড় উঠোনটায় লাল পাগড়ী, তকমাধারী বরকন্দাজ আর বিচিত্র পোষাকের অসংখ্য মানুষের ভীড় দেখে ভয়ে ভয়ে ফিরে এলো তারা।

বিকেলে স্বয়ং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আর পুলিস সাহেব এলেন সদলবলে। ডেপুটী পুলিশ সুপার আর দারোগা বাবু তো সকালেই এসে গেছেন রায়বাহাদুরের সঙ্গে।

পুলিশ কর্তৃপক্ষের সুপরামর্শে সম্প্রতি-গঠিত পল্লীরক্ষী বাহিনীর প্রথম বার্ষিক অধিবেশনের সঙ্গে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হবে পুরস্কার

বিতরণী উৎসব। এক পক্ষকালের মধ্যেই নবগঠিত পল্লীরক্ষী বাহিনীর বার্ষিক অধিবেশনের ব্যবস্থা দেখে সহজেই বোঝা যায় যে, এ-বুদ্ধিটাও সরকারী তরফের। উদ্ধব ঘোষের কলেজ-ছাড়া আর বিয়ে ভেঙ্গে যাওয়া গুণধর ভাগ্নে হয়েছেন এই পল্লীরক্ষী বাহিনীর ক্যাপ্টেন। খাকীর হাফ প্যাণ্ট আর হাফ শার্ট পরে, মাথায় খাকীর টুপি চাপিয়ে, ইউনিয়ন জ্যাক উড়িয়ে, শহর থেকে ভাড়া-করে-আনা ব্যাণ্ড পার্টি সামনে পেছনে নিয়ে হিপ্-হিপ্ হুর্-রে করতে করতে বল্টুবাবুর দল যখন চাষীপাড়ার ভেতর দিয়ে উদ্বোধক পুলিশ সুপার আর পতাকা উত্তোলক জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে শোভাযাত্রা করে নিয়ে এলো তখন সে-যে কী এক মহাকাণ্ড ঘটলো সেকথা ভাষায় বলাই কঠিন। তবে সেই মহাকাণ্ডের একটা পারে জমিদার-গাঁয়ের লোকেরা একহাতে আনন্দাশ্রুবন্যা রোধ করতে করতে অপর হাতে চাষীপাড়ার দিকে তর্জনী উঁচিয়ে ধরলো এবং আর একটা পারে, সামনের কোন্ তারিখে যে ভিটে ছেড়ে পালাতে হবে তাই ভেবে ভেবে চাষীরা আতঙ্ক বোধ করতে লাগলো।

অনুষ্ঠানের যথারীতি সভাপতিত্ব করলেন রায় বাহাদুর, উদ্বোধন করলেন পুলিশ সুপার, পতাকা মানে ইউনিয়ন জ্যাক উত্তোলন করলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং পুরস্কার বিতরণও করলেন তিনি। খানা-পিনাটা চললো ভেতর বাড়ীতে এবং কলকাতা থেকে ভারী ট্যাক্সিতে করে বয়ে-আনা যে-যে দ্রব্য সহযোগে খানার সঙ্গে পিনাটা চললো সেটা আর বলাই বাহুল্য।

নানাশ্রেণীর প্রধান প্রজার কাছ থেকে রায় বাহাদুর নজরানা পেলেন পরদিন। দু'চারজন বড় ধরণের চাষীপ্রজা, যেমন রাম বাছাড়, অভিলাষ বিশ্বাস যে আসেনি তা নয়। তবে বিভিন্ন শ্রেণীর তালুকদার

গাঁতিদার, জোদ্দার প্রভৃতি শ্রেণীর ভদ্রলোক প্রজার সংখ্যা শতকরা প্রায় পঁচানব্বুই জনই। রায় বাহাদুরকে শুধু বসে থাকতে হলো যন্ত্রণাদায়ক নির্বাক অবস্থায় মুখ গম্ভীর করে। অবশ্য মাঝে মাঝে দাঁতও তিনি বার করলেন হাসি দেখাবার জন্যে।

কিন্তু সাধারণ প্রজারা, অর্থাৎ আসল চাষীরা রায় বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করবার বা তাঁকে সেলাম জানাবার কোন সুযোগই পেলে না।

রাত্রিবেলা তেতালার খোলা ছাদে ইজি চেয়ারে শুয়ে পাড়াগাঁয়ের অজস্র জোছনার আলোয় বিশ্রাম করলেন রায় বাহাদুর। পাশে মাত্র দু'জন লোক, একজন তাঁর সহপাঠী উদ্ধব ঘোষ, অপর জন সদর মহলের নায়েব নিবারণ মুখুজ্জে।

রায় বাহাদুর ইংরাজী আর বাংলায় মিশিয়ে সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন নায়েব মশাইকে—এই সামান্য ব্যাপারটাকে প্রজাবিদ্রোহ বলে চালিয়ে দেবার মানেটা বলতে পারেন নিবারণ কাকা?

উদ্ধব ঘোষ আর নিবারণ মুখুজ্জে দুজনেরই বুক কেঁপে উঠলো এক সময়ে এবং একসঙ্গে দুজনেই অনুভব করলেন রায় বাহাদুরের কাছে তাঁরা ধরা পড়ে গেছেন। একটিমাত্র কথায় রায় বাহাদুর তাঁর সমগ্র জমিদার-সত্বা নিয়ে অনেক ঊর্ধ্ব থেকে অনেক ব্যাপকতা আর গুরুত্বের সঙ্গে দুজনের মনেই চেপে পড়লেন। এ-প্রশ্নের সহসা কোন জবাব দিতে পারলেন না নিবারণ মুখুজ্জে।

উদ্ধব ঘোষ শুধু ইংরেজীতে বললেন যে, তাঁর জীবনকালে চাষী প্রজাদের এমন দুঃসাহস তিনি এই প্রথম দেখলেন এবং সময়োচিত ব্যবস্থা অবলম্বন না করলে আজ-যে কি অবস্থা হতো তা কল্পনা করতেও তিনি ভয় পান।

মৃদু হাসলেন রায় বাহাদুর। ইংরাজী বাংলায় মিশিয়ে থিতিয়ে থিতিয়ে এবং খুব মৃদু কণ্ঠে বললেন—সারা দেশ আজ [illegible] সামনে

এসে দাঁড়িয়েছে। দেশের একধার থেকে আর একধার পর্যন্ত নানা ঘটনাই ঘটছে। এমন দু'চারটে বিক্ষিপ্ত ঘটনা এখানেও যে ঘটবে তা আগে থেকেই আঁচ করা যেত না কি? লাঠিবাজিটা একটু কম করলেই আজ আর ছায়া দেখে এই ভূতের ভয়টা পেতে হতো না।

উদ্ধব ঘোষ আর নিবারণ মুখুজ্জে দু'জনের বুকটা কে যেন একটা ধারালো ছুরি দিয়ে চিরে সজোরে আলগা করে ধরে তার ভেতর কি আছে এক দৃষ্টিতে দেখে নিলে। তবু তাঁরা প্রতিবাদ করলেন এবং ঘটনাটি যে অন্তত প্রজা বিদ্রোহের সূত্রপাত সে-কথা প্রমাণ করার জন্যে নানারকম দৃষ্টান্ত দেখাতে লাগলেন।

কিন্তু রায় বাহাদুর পাকা লোক। তিনি যে সত্যিই জমিদার সে কথাটা নিজের বুদ্ধিদীপ্ত অস্তিত্ব দিয়েই বুঝিয়ে দিলেন ঘোষ মশাই আর নায়েব মশাইকে। এ অঞ্চলে কোন প্রজামঙ্গল সমিতি, কি কৃষক সমিতি, কি কংগ্রেস অথবা অন্য কোন রকমের জনকল্যাণমূলক সমিতি গঠিত হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করলেন তিনি। ওঁরা দুজনেই দুপাশে ঘাড় নাড়িয়ে গঠিত হয়নি বলে জানালেন। অতিরিক্ত প্রশ্নের উত্তরে একথাও তাঁরা জানালেন যে, নিকটবর্তী অঞ্চলে অন্য জমিদারদের এলাকাতেও এমন কোন ঘটনা ঘটেনি বা অনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠানও গড়ে ওঠেনি। অতঃপর রায় বাহাদুর যখন জিজ্ঞাসা করলেন—একে তাহলে বিক্ষিপ্ত বা অসংগঠিত ঘটনা বলে স্বীকার না করার কারণটা লজ্জা বা জিদ ছাড়া আর কি হতে পারে—তখন দুজনেই ওঁরা কথা হারিয়ে ফেললেন একসঙ্গে।

রায় বাহাদুর নিবারণ মুখুজ্জেকে বললেন—একটু সাবধান হয়ে চলবেন নিবারণ কাকা। যেটা ঘটেনি, কি ঘটবার আভাষও দেখা দেয়নি, অতিরিক্ত পীড়ন করে সেটাকে সত্যি সত্যি ঘটবার পথ খুলে দিয়ে লাভ হবে না কারো। দেশে অজন্মা হচ্ছে বছরের পর বছর।

প্রজারা খাজনা দিতে পারছে না, জমিদারী হয় বিক্রী হচ্ছে, না হয় কোর্ট অব ওয়ার্ডস্-এ যাচ্ছে—জমিদারদের অবস্থা আজ অত্যন্ত খারাপ। ওদিকে কংগ্রেসী আন্দোলন জোরদার হয়েছে। নানা জায়গায় ছোটখাট প্রজামঙ্গল সমিতি তৈরী হয়েছে। শীগগীরই এমন দিন আসতে পারে যখন দেশব্যাপী কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠবে, জমিদার আর জমিদারী ব্যবস্থাকে তখন শেষ বিচারের জন্যে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। এই অবস্থাটা আসবেই, কেউ ঠেকাতে পারবে না, কারণ জমিদারদের একদা-কাটা খাল যেমন বুঁজে এসেছে তেমনি করে তাদের হাতে গড়া জমিদারী ব্যবস্থাটাও আজ অচল অবস্থার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। তাই আমাদের কর্তব্য হবে এমনভাবে কাজ করা যাতে করে সেই ডকে-ওঠার অনিবার্য ঘটনার গতি শিথিল করে তাকে অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত ঘটতে না দিয়ে শুধু ঠেকিয়ে রাখা যায়।

শিক্ষিত উদ্ধব ঘোষ জমিদারী ব্যবস্থার ইতিহাস তুলে কি-যেন বিদ্যা জাহির করতে যাচ্ছিলেন। শুনে রায় বাহাদুর হাসলেন। বললেন—উদ্ধব, তুমি মধ্যবিত্ত। তোমার ডান পা জমিদার বাড়ী আর বাঁ পা প্রজাবাড়ী। জমিদার গেলেও তুমি যাবে না, প্রজার কাঁধে বাঁ পা রেখেই তুমি বাজীমাৎ করবে সেদিন। জমিদাররা ইচ্ছে করলে দেশের মঙ্গল করতে পারে, প্রজার ঘরে অন্নের বান ডাকাতে পারে—এইসব ইস্কুলে পড়া কথা কত-যে ভুয়ো তা তুমি না বুঝলেও আমি বুঝি। আমি রায় বাহাদুর প্রসন্ননারায়ণ রায়, প্রতাপনগরের তিনকালের রায়বংশের বুদ্ধিমান বংশধর, আমি যদি আমার গোটা জমিদারীটাই প্রজাদের হাতে বিলিয়ে দিই তা হলেও কি আমার প্রজাদের মঙ্গল হবে? আমার খাজনা যদি আজ প্রজাদের না দিতে হয়, তাহলেও কি তাদের ঐ বুঁজে-আসা খালটা কাটা হবে, সাবেক কালের রাস্তাটা বাঁধা হবে, ইস্কুল তৈরী হবে, হাসপাতাল হবে, গোলা

ভরতি ধান জন্মাবে, গা-ভরতি পোষাক আর গহনা হবে, না ঘরে ঘরে নাচ গান আর আনন্দের বন্যা নামবে? একি তুমি বিশ্বাস কর একজন উচ্চ শিক্ষিত হিসেবী আর বুদ্ধিমান লোক হয়েও? শতকরা একশো ভাগ সহানুভূতি আর উদারতা দিয়েও আমি কেন, সারা বাংলাদেশের জমিদার সম্প্রদায়ও প্রজাদের আর মঙ্গল করতে পারেন না। যে-নদী একদিন সারা মাঠের আর সমাজের রস যুগিয়েছে, তার দশা আজ কচুরীপানাভর্তি মুক্তিশ্বরীরই মতো। মুক্তিশ্বরীর মরণটাই আজ প্রতিফলিত হচ্ছে সারা দেশে, সারা সমাজে। এই অনিবার্য ঘটনার হাত থেকে রেহাই নেই কারো।

এই কঠোর সত্যের সহজ স্বীকৃতির সামনে কোন জবাব দিতে পারেন না উদ্ধব ঘোষ। শুধু রায় বাহাদুরের গুরুভার অস্তিত্বটার চাপ অনুভব করতে থাকেন সমগ্র মনের ওপর। তাঁর ইচ্ছে হতে লাগলো প্রতিবাদ জানিয়ে চীৎকার করে বলতে—হ্যাঁ, আছে আছে, রেহাই আছে——

রায় বাহাদুর বলে চলেন—জমি মাটি, এই সুজলা ও সুফলা শস্যভূমি—যার ওপর এতদিন ধরে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের গোটা সমাজ, সে-জমি আজ নিষ্ফলা, সমাজকে সে বাঁচাতে পারছে না। মানুষকে আর সমাজকে মাটির বাঁধন থেকে সরিয়ে দিতে পারলেই হবে এই সমাজের মুক্তি। সেটা সম্ভব হচ্ছে না বলেই জমিদার থাকছে, পচা জমিদারী ব্যবস্থাটাও থাকছে, সেই ব্যবস্থার ভাল ফল ফুরিয়ে গিয়ে মন্দ ফলটাই সব জায়গায় আত্মপ্রকাশ করছে। ইংরেজ যতদিন আছে ততদিন লোকের পা থেকে মাটির বাঁধন খসছে না, ততদিন জমিদারী আছে, ততদিন জমিদারী ব্যবস্থার চাপ আছে আর সেই ব্যবস্থার ভারপ্রাপ্ত জমিদারদের কাজকে অত্যাচার বলে মনে করবার যথেষ্ট কারণও আছে। আমরা, জমিদাররা আজ ইংরেজের

প্রভুভক্ত গোলাম, প্রজার সেবক তো নই। যাঁরা সেকথা বলে তারা হয় আসল কথা জানে না, না হয় ইচ্ছে করেই জমিদারদের মহত্ব প্রচার করে। প্রজা-সেবার যে মহান অধিকার একদিন জমিদারদের ছিল, ইংরেজ তা কেড়ে নিয়ে আমাদের হাতে শুধু জমিদারী যন্ত্রের হাতলটাই দিয়েছে, ষ্টিয়ারিংটা দেয়নি।

কাঠগড়ায় উঠে পুরাতন পাপী যেন অনর্গল স্বীকারোক্তি করছে। স্বীকারোক্তির প্রতিটি কথা যেন বেদবাক্যের মতো অপৌরুষেয় সত্য। বহুবর্ষের অপরাধে পাকা শয়তান দুর্বৃত্তের দিকে তরুণ উকীল যেমন মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে, উদ্ধব ঘোষ তেমনি করে তাকিয়ে থাকেন রায় বাহাদুরের দিকে তন্ময় হয়ে।

রায় বাহাদুর অনেক রাত্রি অবধি মনের সাধে জমিদারী ব্যবস্থা, জমিদারদের কর্তব্য, প্রজাদের বর্তমান অবস্থা, কংগ্রেসী আন্দোলনের শক্তি, কৃষক আন্দোলনর সম্ভাব্য রূপ, মজুর আন্দোলনের পরিণাম, সাম্যবাদ, গণতন্ত্র, নিজ বংশের ইতিহাস, নায়েবের কর্তব্য, মহাজনের দায়িত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁর নিজের ব্যাখ্যা অনুযায়ী ব্যক্তিগত মতামত ব্যক্ত করে গেলেন। উদ্ধব ঘোষ এবং নিবারণ মুখুজ্জে সেইসব বিশ্বব্যাপী ঘটনার প্যাঁচে পাক খেতে খেতে বাকশূন্য হয়ে বসে রইলেন।

পূব আকাশের চাঁদ মাথার ওপর উঠলো। মুক্তিশ্বরী নদীতে মাছ লাফাবার আর নৌকো বাইবার শব্দ উঠতে লাগলো। দক্ষিণ দীঘির ওপরকার ঝাউগাছে বাতাসের শব্দে অসংখ্য মানুষ যেন ফিস্ ফিস্ করে কথা কয়ে উঠলো। উত্তরের বাগানে ঝিঁঝি পোকা ডেকে চললো নিরন্তর। বণ্টুবাবুর পল্লীরক্ষীদলের ঘন-ঘন বাঁশীর আওয়াজ ভেসে আসতে লাগলো গ্রামের পথগুলোর সব জায়গা থেকে।

তবু কথা বলে চলেন রায় বাহাদুর, ধীরে সুস্থে অকম্পিত কণ্ঠে,

মনের কোন ভাব ভাষায় প্রকাশ হতে না দিয়ে। তাঁর কথা শেষ হলে সবাই অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন।

রায় বাহাদুর কথা বলতে বলতে থেমে যান মাঝে মাঝে। তাঁর বুকের কোথায় যেন কাঁটা বিঁধছে, অথচ সেটা এত ছোট যে চোখেও দেখা যাচ্ছে না, টেনেও বার করা যাচ্ছে না। ছেলেবেলায় ষোল বেয়ারার পাল্কী চড়ে যাবার বেলা যে-মাঠে তিনি ফসলের সমারোহ দেখেছেন, বাগবাগিচায় যে ফলের প্রাচুর্য দেখেছেন, চাষীপাড়ায় যে লক্ষ্মীশ্রী দেখেছেন, সন্তান-কোলে পল্লীবধূদের চোখে যে খুশীভরা কৌতুহল দেখেছেন, বাছুর পাশে রেখে সুস্থ শান্ত গাভীদের যে জাবর-কাটা-চেহারা দেখেছেন, ভদ্রপাড়ায় যে আনন্দের কোলাহল শুনেছেন, আজ সকালে ট্যাক্সি চড়ে ছুটে আসবার সময় তার জায়গায় দেখে এসেছেন জরাজীর্ণ পৃথিবীর কোটরগত চোখের বিস্ময়, দেখে এসেছেন চাষহীন বিবর্ণ মাঠ, ফলহীন বাগিচা, লক্ষ্মীছাড়া চাষীপাড়া, কঙ্কালসার গ্রাম্যবধূ আর বৎসহীন কাষ্ঠবৎ দুচারটে গাভী। ষোল বেয়ারার পাল্কী থেকে ট্যাক্সি চাপার পরিবর্তনে যতটা আনন্দ বোধ করেছিলেন আজিকার এই পার্থিব পরিবর্তনে তার চেয়ে অনেক বেশী দুঃখবোধ করেন তিনি। জমিদার হয়েও জমির প্রতি দায়িত্ব পালনের পুরুষানুক্রমিক অক্ষমতায় তিনি নিজেকে অপরাধী মনে করেন এবং আজিকার এই ফলহীনা পৃথিবীকে দীর্ঘকালের অবজ্ঞায় আর অবহেলায় বন্ধ্যা করে দেওয়ার রাজকীয় বিলাসে মনোবেদনা অনুভব করেন। মাটি মানুষ আর কাল—এই তিন সৃজনীশক্তি যে ভূস্বামীদের দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ ধরে অবজ্ঞায় অনাদরে অপালনে অকর্তব্যে অজ্ঞতায় অক্ষমতায় একটু একটু করে মুখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে, একটু একটু করে সরে সরে অনেক দূরে নাগালের বাইরে গিয়ে আজ ভূপতিদের দিকে পেছন ফিরিয়েছে

সেকথা আজ যেমন করে বুঝলেন মোগল যুগের জমিদার বংশের রক্তবাহী ও জমিদার সমিতির সহ-সভাপতি রায় বাহাদুর প্রসন্ন রায়ণ রায় তেমন করে বোধ হয় আর কোনদিন অনুভব করেননি।

নিবারণ মুখুজ্জে এক সময় জিজ্ঞাসা করলেন—তাহলে আমাদে: কাজ কি এখন ?

উত্তর জানবার জন্যে উদ্ধব ঘোষ উৎকর্ণ হয়ে রইলেন।

রায় বাহাদুর একবিন্দু উদ্বেগ প্রকাশ না করে ই।জচেয়ারে তেমনি মাথা হেলিয়ে রেখে অত্যন্ত কূটনীতিক স্বরে উচ্চারণ করে করে বললেন—সংঘর্ষটা যখন অনিবার্য, তখন যতদূর পারা যায় কৌশল করে জমিদারদের আড়ালে রাখাই বুদ্ধির কাজ। ইংরেজ নিজের স্বার্থে এমনি আইন বা।নয়েে৮ে যে তা দিয়েই প্রজাদের ঠেলে দেওয়া যাবে ইংরেজ গবরমেণ্টের সামনে। গবরমেণ্ট আর প্রজার ভেতর সংঘর্ষ বাধাতে পারলে জমিদারের দায়িত্বটাও যেমন ফুরিয়ে যায় স্বার্থটাও তেমনি বজায় থাকে ষোল আনা।

উদ্ধব ঘোষ আর মুখুজ্জে মশাই একথার বিন্দু বিসর্গও বুঝতে পারেন না।

রায় বাহাদুর বুঝিয়ে ব.লেন—ধরুন, একটা গাঁয়ের প্রজারা খাজনা দেওয়া বন্ধ করলো, আর আপনি নালিশ করে ডিক্রি করলেন তাদের নামে। একটা বড় প্রজার নামেও ডিক্রি করা আছে। সেটা জারিতে দিলেন এবং অস্থাবর ক্রোকটা এমনভাবে করলেন যে, প্রজারা বাধ্য হলো বাধা দিতে আর সরকার বাধ্য হলো আইনশৃঙ্খলা আর আদালতে: মান রাখতে।

উদ্ধব ঘোষ আর নিবারণ মুখুজ্জে এখন জলের মত বুঝে ফেলেন সব। তাঁদের ইচ্ছা হলো রায় বাহাদুরকে কাঁধে করে দুজনে এই মুহূর্তে সারা গ্রাম ঘুরিয়ে আনেন নেচে নেচে।

পরদিন সকালে রায় বাহাদুর কলকাতায় চলে গেলেন। নব আর নবীনের নেতৃত্বে বিভিন্ন গ্রামের প্রজারা আর্জি পেশ করবার জন্যে দল বেঁধে বেঁধে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসছিল। তারা শুধু কপালে হাতের চেটো ঠেকিয়ে তাঁর গাড়ীর পেছনে লাল সুরকির ধূলো উড়ছে দেখে ঘরে ফিরে গেলো।

রায় বাহাদুর চলে যাওয়ার ঝামেলা অনেক। নায়েব মশাই বলেন —'হাতী যেমন খায় তেমনি নাদে, সেই নাদ ফেলতেই একোপে যাও'। নাদ সাফ করে, গণ্যমান্য বিত্তবানদের মিটিং সেরে একেবারে অনেক রাত্রে ঘরে ফিরলেন উদ্ধব ঘোষ। বিছানায় গা দিতে দিতে ঘড়িতে বারটা বেজে গেল। একটু চোখ বুঁজতেই তাঁর মনে পড়লো আগের-রাত্রে বলা রায় বাহাদুরের কথাটা—উদ্ধব, তুমি মধ্যবিত্ত, তোমার ডান পা জমিদারবাড়ী আর বাঁ পা প্রজাবাড়ী। রাগ হল উদ্ধব ঘোষের—এর চেয়ে সরাসরি দালাল বললেই তো চলতো, খোলা কথা সহজ ভাবেই বোঝা যেত। কিন্তু আশ্বস্তও হন তিনি,—'জমিদার গেলেও "তুমি" যাবে না', রায় বাহাদুরের এই কথাটাও মনে পড়ে যায় তাঁর। তাহলে মৃত্যু নেই ঘোষ মশাইদের। কিন্তু যমে-মানুষে লড়াইয়ের সময় ঠ্যাং খোঁড়া হতেই বা কতক্ষণ —কম্পিত আশঙ্কায় উদ্বেগ বোধ করেন উদ্ধব ঘোষ।

তবুও উদ্ধব ঘোষ আরাম বোধ করেন, অপূর্ব অনাস্বাদিত আরাম। চোখ বুঁজে পড়ে থাকেন তিনি। আলস্যে দু'টি চোখ তাঁর আপনিই বুঁজে যায়, নরম বিছানায় সর্ব অঙ্গ এলিয়ে একখানা হাত বুকে আর একখানা হাত কানের পাশে ফেলে রেখে পড়ে থাকেন তিনি। জমিদার প্রসন্ননারায়ণের রক্তহীন পাষাণভার অস্তিত্বের অনস্বীকার্য অন্ধকূপ থেকে আপনার টলটলায়মান সত্বাকে ছানিয়ে এনে উদ্ধব ঘোষ তাকে অনুভব করেন ধীরে সুস্থে খুসীতে

আরামে, মা যেমন করে হারিয়ে পাওয়া স্নেহের শিশুকে মাই খাওয়াতে খাওয়াতে গায়ে হাত বুলোন, চুল শোঁকেন, তেমনি করে করে। নিজের স্বাধীন সত্বায় নিশ্চিন্তে আসীন হতে হতে তিনি সদ্যমুক্ত রাজনৈতিক বন্দীর আনন্দ বোধ করেন। খোলা জানালা দিয়ে বাতাস বইছে, জানালার কপাট আছড়ে পড়ছে, বিছানার চাদর উড়ে যাচ্ছে। এমনি এক শান্ত খোলা আবহাওয়া তাঁর সমগ্র মনে ছড়িয়ে পড়ে, মৃদু নেশার মত চেতনাকে তাঁর আচ্ছন্ন করে ধরে।

হ্যাঁ, তিনি মধ্যবিত্ত, হ্যাঁ তাঁর দুই পা সত্যিই দুই দুর্জয় সামাজিক শক্তির কাঁধে চাপানো। সেই দুর্বার শক্তিকে পরিচালনার যোগ্যতা আছে বলেই না তিনি মধ্যবিত্ত। এক নবজাগ্রত প্রসন্ন অহঙ্কারে প্রসন্ননারায়ণের এই অভিযোগ তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে স্বীকার করেন। অপরাধ গঠনের আগে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়ানো বিপ্লবী আসামীর মনে নিদারুণ বিবৃতি দিয়ে নিজের অস্তিত্বকে সারা দুনিয়ায় স্থায়ীভাবে ছড়িয়ে রেখে যাবার যে অদম্য কামনা দেখা দেয়, এই মুহূর্তে উদ্ধব ঘোষের মনেও সেই কামনা সহস্র শিখায় জ্বলে ওঠে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ! তিনি মধ্যবিত্ত, একশোবার তিনি মধ্যবিত্ত! শক্তিবোধের উত্তেজনায় হাঁপিয়ে ওঠেন উদ্ধব ঘোষ। কবির মতো মধুর ভাষায় তাঁর সওয়াল করতে ইচ্ছে হয়—হ্যাঁ, সমাজের সুধা আর হলাহল, আলোক আর আঁধার, সৃষ্টি আর বিনাশ সবই তো তাঁর হাতে। জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়ে এসবতো ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার ন্যায্য দায়িত্ব তাঁরই। মধ্যবিত্ত হতে পেরেছেন বলে গর্ব অনুভব করেন তিন। হ্যাঁ তিনি জমিদার নন, অত্যাচারের বান ডাকিয়ে নিজেকেও ভাসিয়ে দেবার মতো বোকামী করতে পারেন না তিনি। তিনি পারেন না চাষীর মতো হয়ে লাঙ্গল চষতে। তিনি পারেন গাড়ী চালিয়ে খোলা মাঠে গান গেয়ে চাষীবাড়ীর ধান নিয়ে হাটে

হাটে ব্যাপার করতে। তিনি মৌমাছি, তিনি জানেন ফুলের ভাণ্ডার থেকে মধু খেতে, এক ফুলের রেণু আর এক ফুলের কেশরে লাগিয়ে ফল ধরাবার দৌত্য করতে। তিনি সাপুড়ে, মুখে তাঁর বাঁশের বাঁশী, মাথায় তাঁর সাপের ঝাঁপি, কণ্ঠে তাঁর আদিম সৃষ্টির সম্মোহন সুর! তিনি মধ্যবিত্ত, তিনিই ধন্য!

কিন্তু প্রসন্ননারায়ণের অস্তিত্বকে তিনি সর্বশক্তি দিয়ে অস্বীকার করতে চাইলেও অস্বীকার করতে পারেন না। প্রসন্ননারায়ণ তাঁর প্রসন্ন হাসি নিয়ে, বলদৃপ্ত ঔদ্ধত্য আর উজ্জ্বল অহঙ্কার নিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ যেমন অর্জুনের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন সর্বব্যাপী বিশ্বরূপে। এই প্রসন্ননারায়ণ যেন বলতে চায়— আমিই সর্বলোক-বিধৃতিশক্তি, আমিই সৃজন আমিই পালন আমিই বিনাশ; আমার এক হাতে সৃষ্টি-পদ্ম, অন্য হাতে স্থিতির বরাভয়, অপর হাতে প্রলয়ের মারণ চক্র; দেখ, আমিই নগাধিরাজ হিমালয়, আমারই অঙ্গ থেকে জীবনের পদ্ম উৎসৃত হয়েছে, তারই জলধারায় মাঠে মাঠে ফসল ফলেছে, চাষীর গোলায় শস্য উঠেছে, মধ্যবিত্তের বুদ্ধি বিকশিত হয়েছে, মহাজনের লোহার সিন্দুক ভরতি হয়েছে, নায়েবের তহরী পরবী কাঠের বাক্সে ঢুকছে, ডাক্তারের ভিজিট——

উদ্ধব ঘোষ বিস্ময়ে চেয়ে থাকেন সেই জমিদারী বিশ্বরূপের দিকে। প্রতিবাদ করবার প্রবল ইচ্ছা অনুভব করেন মনে মনে, কিন্তু একটি যুক্তিও তিনি খাড়া করতে পারেন না, শুধু উচ্চমধ্যবিত্তের বুদ্ধির অহঙ্কারে ভর করে তিনি উপেক্ষার হাসি টেনে রাখতে চেষ্টা করেন দুই ওষ্ঠের ফাঁকে।

জমিদার প্রসন্ননারায়ণের বিশ্বরূপী হাসির ভেতর থেকে বিদ্রূপের প্রশ্ন উচ্চারিত হয়—আমি, এই নগাধিরাজ আমি, আমি যদি চূর্ণ হই?

উদ্ধব ঘোষের কল্পনায় একটা ভয়ঙ্কর আলোড়ন দেখা দেয়।

সত্যই যেন হিমালয় চূর্ণ হ'য়ে গেল, জীবন-গঙ্গার ধারা মুহূর্তে বিলুপ্ত হয়ে গেল, বুদ্ধির ফুল শুকিয়ে গেল, মহাজনের লোহার সিন্দুক কোথায় ছিট্‌কে গেল, তার পর…!!!

হে-এ-এ-এ-এ-ই-ইহ্……

মাঠের দিক থেকে চিৎকারটা এসে ছড়িয়ে পড়ছে যেন দিক্‌দিগন্তে। গ্রামের মধ্যে পল্লীরক্ষী দলের হুইশেল বেজে ওঠে তীব্র সুরে।

ও-ও-ওহ্‌-হো-উ-উ-ই-ইহ্……

জব'ব আসছে মাঠের পারের অনেক গ্রাম থেকে। উদ্বেগে অধীর হয়ে উঠে বসেন উদ্ধব ঘোষ খাটের প্রান্তে। জানলা দিয়ে চেয়ে দেখেন মাঠের আর বিলের ভেতর। চারিদিকে ক্ষিপ্র গতিতে তাকিয়ে দেখেন, একজায়গায় এসে তাঁর চোখ থেমে যায়, ভয়ে তাঁর গা কাঁটা দিয়ে ওঠে।

শামাদার তলার পাশে, লোকাল বোর্ডের সড়কের ওপরেই বোধহয়, আকাশের ভেতর আগুন জ্বলছে ত্রিশূলের মতো হয়ে দাউ দাউ করে। সেই আভায় শামাদার গাছও যেন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বিলের বুকে ছড়িয়ে পড়েছে সেই আলোর ছটা।

চোখ ফেরাতে পারেন না উদ্ধব ঘোষ, কে যেন সেই আগুন-জ্বালা যাদুদণ্ডের সঙ্গেই তাঁকে সম্মোহিত করে গেঁথে রেখেছে।

দণ্ডটা পুড়ছে, পুড়তে পুড়তে নিভে আসছে তলা থেকে ওপরের দিকে। ত্রিশূলের মাথা তিনটেতে আগুনের জোর এখন সব চেয়ে বেশী। বাতাসের বেগে সেই আগুনের শিখাগুলো পাক খাচ্ছে আর উঠছে পড়ছে।

কতক্ষণ পরে, ঘোষ মশাইয়ের ঠিক মনে নেই, ত্রিশূলের আগুন নিভে গেল। সজোরে দম ছেড়ে ঘোষ মশাই খাটের বাজু চেপে ধরলেন। ঠিক সেই সময় আবার হুঙ্কার উঠলো—হে-এ-এ-এই-ই-ই-ইহ্—

বল্টুবাবুর পল্লীরক্ষীদলের অসংখ্য হুইশেল তীব্র সুরে বেজে উঠলো আবার।

বিল-পারের গ্রামগুলোর ধার থেকে আবার জবাব এলো—ও-ও-ওহ্-হু-উ-উ-ই-ইহ্......

উদ্ধব ঘোষ তাঁর প্রাণপণে প্রসারিত দুটী চোখে স্পষ্টই দেখলেন—বিলপারের গাঁগুলো থেকে দশ পনেরোটা করে মশাল নাচতে নাচতে এগিয়ে যাচ্ছে নিভে যাওয়া ত্রিশূলটার দিকে। উদ্ধব ঘোষের সমগ্র মধ্যবিত্ত সত্বা হাঁক ছাড়বার মতো জেগে ওঠে। অকস্মাৎ তিনি অনুভব করেন—সাত পুরুষ পার হয়ে উপকথার শিবু সর্দার জেগে উঠেছে আজ চাষীদের গাঁয়ে। সত্ত জাগ্রত সেই শিবু সর্দার স্বর্গের দ্বারে আগুন জ্বেলে ডাক ছেড়েছে—ওঠো, জাগো—

মধ্যবিত্ত উদ্ধব ঘোষ আর্তনাদ করে ওঠেন। আজ থেকে দু'পা ই আমার তোমার ঘরে বাঁধা রাখলাম প্রসন্ননারায়ণ! আমাকে তুমি মাফ করো আর আমাকে তুমি রক্ষাও করো!

ঘোষগিন্নি ঘরে ঢুকে নিভন্ত আলোর শিখা উস্কে দিয়ে দেখতে পেলেন, উদ্ধব ঘোষ লোহার সিন্দুক জড়িয়ে ধরে উপুড় হয়ে পড়ে আছেন, সারা অঙ্গ দিয়ে তাঁর ঠাণ্ডা ঘাম বেয়ে পড়ছে, অতিশয় প্রসারিত চোখ দু'টি জানালার বাইরে চেয়ে আছে যেখানে অসংখ্য মশালের জমায়েতে আলোকিত হয়ে উঠেছে শামাদারতলাটা।

এই রাত্রেই পুরাতন উদ্ধব ঘোষ মারা গেলেন। যে উদ্ধব ঘোষ কোন কোন দিন চাষীর দুঃখে দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন, মানুষের লাঞ্ছনায় পীড়া বোধ করতেন, যে উদ্ধব ঘোষ মহাজনী করতে গিয়ে কোন এক দুর্বল মুহূর্তে গরীব দেনাদারের অর্ধেক টাকা ছেড়ে দিতেন, জমিদারের শোষণের বিরুদ্ধে যে উদ্ধব ঘোষ প্রতিক্রিয়ার যুক্তি তুলে নায়েবের কাছে প্রতিবাদ জানাতেন, এই বিক্ষুব্ধ রাত্রির আশঙ্কার

আঁধারে সেই উদারবুদ্ধি উদ্ধব ঘোষের নিশ্চিত মৃত্যু হলো, আর তার যায়গায় বেঁচে রইলো জমিদারের দাসানুদাস কুটবুদ্ধি এক দুষ্ট তালুকদার মহাজন।

পরদিন সকালে বিজয় উল্লাসে বল্টুবাবুর দল উদ্ধব বাবুর বা'র বাড়ীর উঠোনে প্রবেশ করলো এবং যুদ্ধ জিতে ফিরে-আসা সৈন্যদের মতো মহা কলরবে বাড়ী ফাটিয়ে তুললো।

ভয়ে ভয়ে সারা রাত্রি জেগে ঘোষ মশাইয়ের শরীর খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সবেমাত্র তিনি বাইরের ঘরে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে গড়গড়ায় মুখ লাগিয়েছিলেন এবং তহশীলদার রামলোচন চক্কোত্তি সবেমাত্র নানা দুর্দৈবের কথা বলতে সুরু করেছিলেন। এমন সময় পল্লীরক্ষী বাহিনীর কাপ্তেনী পোষাক পরে সদর্পে পা ফেলে বল্টুবাবু প্রবেশ করে হুঙ্কার ছাড়লো—মামাবাবু, শীগ্গীর একবার বাইরে আসুন।

এতবড় কাপ্তেন ভাগ্নের ডাক আজ আর উপেক্ষা করার সাধ্য ছিলনা উদ্ধব ঘোষের। বাইরে গিয়ে তিনি যে-দৃশ্যের সামনে পড়লেন তাতে এক মুহূর্তে তাঁর দেহ মনের জড়তা কেটে গেল, সারা দেহে অদ্ভুত এক উত্তেজনা অনুভব করলেন তিনি। ভয়ের বস্তুকে ঠিক সামনে দেখলে মানুষের যেমন ভয় কেটে গিয়ে আত্মরক্ষার স্বাভাবিক তাগিদে তীব্র কর্মচাঞ্চল্য দেখা দেয় ঘোষ মশাইও তেমনি চাঞ্চল্য অনুভব করেন এক মুহূর্তে।

বল্টুবাবুর দল বাইরে উঠোনে লাঠি হাতে সেনাদলের মতো সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। এদিকে বারান্দায় অসংখ্য বস্তু সাজানো রয়েছে। সেগুলোর দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বল্টু গত রাত্রের আগুন জ্বলার ঘটনা বিবৃত করলো এবং বললো যে ভোরবেলা তাদের দলটি

শামাদারতলা ঘেরাও করে মানুষজন না পেয়ে এই সব মূল্যবান জিনিষ সংগ্রহ করে এনেছে।

উদ্ধব ঘোষ ভাল করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন। প্রায় শতখানেক নারকেলপাতার কাড়ুর (মশালের) জ্বালিয়ে-শেষ-করা অবশিষ্ট অংশ, গোটা চারেক ন্যাকড়া-জড়ানো পোড়ানো মশাল, তামাক খাবার জন্যে তৈরী গোটা কুড়িক ধান-মাড়ানো-পলের আগুন রাখা বোঁদেল, একখানা পুরোনো ছেঁড়া গামছা, থানচারেক বাঁশের লাঠি, একখানা সুপুরী কাঠের সড়কি, কয়েকগাছা পুরোনো দড়ি, গোটাচারেক পোড়া সিগারেটের গোড়া আর দু'টুকরো ছেঁড়া কাগজ অপরাধ বিজ্ঞানের প্রদর্শনীর কায়দায় বেশ ভাল করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে বারান্দায়। উঠোনে থানতিনেক পোড়া বাঁশ। সরুখানার মাথা চিরে দু'খানা চটা ত্রিশূলের মতো করে লাগানো। এইসব বস্তুসমারোহে সুসজ্জিত প্রদর্শনীর চারিপাশে বল্টবাবু হেঁটে বেড়োত লাগলেন খট্‌খট্ শব্দে সবুট পা ফেলে ফেলে।

উদ্ধব ঘোষ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে একবারের যায়গায় দশবার করে প্রত্যেকটি জিনিষ লক্ষ্য করলেন, নাড়াচাড়া করে পরীক্ষা করলেন। সব জিনিষ ছেড়ে ঘোষ মশাই বেশীক্ষণ চেয়ে রইলেন পোড়া সিগারেটের গোড়াগুলোর দিকে। তারপর ছেঁড়া কাগজ দুখানা তুলে ধরলেন চোখের সামনে। ভাল করে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে কাগজের মসৃণতা আর পুরুত্ব পরীক্ষা করলেন। দুহাত দিয়ে উঁচু করে চোখ থেকে দূরে রেখে ভেতরে কোন জলছবি বা অন্য কোন অস্পষ্ট দাগ আছে কিনা পরীক্ষা করলেন। ভুল হতে পারে ভেবে আবার চোখের কাছে এনে পরীক্ষা করলেন। যেখানার ওপর-নিচে ছেঁড়া সেখানাতে উডপেন্সিলে লেখা আছে.........."প্রভৃতি গ্রামের কৃষকদের এই সভা শপথ করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করিতেছে যে"...। মাথা ছেঁড়াখানাতে লেখা আছে......"এই প্রজা রক্ষা সমিতির কাজ হইবে"—আর

কিছু লেখা নেই। ঘোষমশাইয়ের মনে হলো একটাতে একটা খসড়া প্রস্তাব অর্ধেকখানি লেখার পর ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। কাগজ দু'খানা থেকে তিনি আর চোখ ফেরাতে পারলেন না। বিস্ময়ের সঙ্গে বারে বারে তিনি উচ্চারণ করলেন—প্রজা রক্ষা সমিতি! প্রজা—রক্ষা—স-মি-তি-ই! প্রজা——

অক্ষরগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকেন উদ্ধব ঘোষ। যেন চেনা চেনা মনে হয়, যেন কোন অতীত যুগে এই হাতের লেখা দেখেছেন তিনি, এমনি টানে প-য়ে র-ফলাও লিখতে দেখেছেন। বিস্মৃত ছাত্রজীবনের অতীত দিনে ফিরে যান তিনি।

হষ্টেলের কামরায় পাশের বেডের একখানি মুখ বহু পুরাতন ছায়াচিত্রের মতো অস্পষ্ট হয়ে ভেসে ওঠে তাঁর কল্পনার কালো পর্দায়। একখানি মুখ, দৃঢ়বদ্ধ দু'খানি ঠোঁট, ঘন চওড়া জোড়া ভ্রুর তলায় টানা টানা দু'টি চোখ, চওড়া কপালের ওপর অবিন্যস্ত চুলে ভরা সুগঠিত একটি মাথা। হ্যাঁ, এইবার সঠিক চিনতে পারেন তিনি—সুদর্শন মুখুজ্জে, তাঁরই গ্রামের দুরন্ত সন্তান! কিন্তু একি! একি করছেন তিনি! এমন অসম্ভব কল্পনা কেন করচেন তিনি। না, না, এ অসম্ভব, একেবারেই অসম্ভব! ঝেড়ে ফেলতে চান তিনি এ-কল্পনা।

তাঁর আতঙ্কগ্রস্ত মনের পর্দায় আবার কিন্তু ছবি বদলায়, হষ্টেলের কামরায় পুলিসের তল্লাসী হয়। মুখখানি আবার যেন বিস্মৃতির অন্ধকারে ধীরে ধীরে হারিয়ে যায়। অতিশয় চেষ্টায় বিস্মৃতির কুয়াশা ভেদ করে মেঘে ঢাকা চাঁদের আভাষের মতো অস্পষ্ট হয়ে সে মুখখানার ছায়া আবার তিনি জাগিয়ে তোলেন মনের পর্দার শেষ কোণে। আলীপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে যেন আন্দামানের দিকে প্রসারিত হতে হতে দূর থেকে দূরে সরে সরে মিলিয়ে যাচ্ছে সে মুখখানি। ময়াল সাপের দিকে হরিণ শিশু যেমন গতিশক্তি হারিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে

উদ্ধব ঘোষও তেমনি করে সেই অস্পষ্ট যুগের কল্পনায় ভয়ে বিভোর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন স্থির হয়ে।

উঠোনে পল্লীরক্ষী দল 'হিপ্-হিপ্-হুর্-র্-রে' করে ওঠে। উদ্ধব ঘোষ তাকিয়ে দেখেন পাকা রাস্তার কালভার্ট পার হয়ে জোড়া দেবদারুর তলা দিয়ে থানার বড় দারোগাকে পিঠে নিয়ে একটা প্রকাণ্ড ঘোড়া নামছে তাঁর উঠোনে। তার পেছনে দেখা যাচ্ছে আরও দুটো ঘোড়ার মুখ।

দিন সাতেক পরে নগেন চক্কোত্তির বাড়ীতে ছোটখাট ডাকাতি হয়ে গেল। চক্কোত্তি গিন্নির গায়ের গয়না, চক্কোত্তি মশাইয়ের পোঁতা টাকা, দামী বেদামী কাপড়-চোপড় সবই গেল। যে-বটতলায় ললিতা বৈষ্ণবীর থান ছিল, বৈষ্ণবীর মৃত্যুর পর তার নাম হয়েছে 'বোষ্টমী তলা'। ডাকাতির পর যথারীতি পল্লীরক্ষী দল হাজির হলো, এবং চক্কোত্তি মশাইকে না পেয়ে খুঁজতে খুঁজতে তারা তাঁর জ্ঞানহীন দেহটা সেই বোষ্টমীতলায় যে-যায়গায় ললিতার কঙ্কাল পড়েছিল সেই যায়গায় পড়ে আছে দেখতে পেলে। চক্কোত্তি মশাই বড় সাবধানী ব্যক্তি, অজ্ঞান হয়েও তিনি তাকিয়ে ছিলেন বড় বড় চোখ করে!

শোনা যায়, প্রথম চোখ খুলে চক্কোত্তি মশাই হঠাৎ আতঙ্কিত চিৎকার তুলে 'হানাদার' বলে যাঁদের নাম করতে করতে আবার অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের সঙ্গে পল্লীরক্ষী দলের কোন কোন হোমরা-চোমরা নামের নাকি অবিকল মিল ছিল। কিন্তু সত্যিকার জ্ঞান ফিরে আসার পরে এবং ঘোষ মশাই, নিবারণ চক্কোত্তি, নন্দ বাঁড়ুজ্জে প্রভৃতির সমবেদনা জ্ঞাপনের অব্যবহিত পরেই, তিনি যে আগে কখন কি অবস্থায় কাদের নাম করেছিলেন সেকথা বেমালুম ভুলে গেলেন এবং ডাকাত হিসাবে এমন সব চেহারার হুবহু

বর্ণনা গড়গড় করে দিতে লাগলেন যার সঙ্গে সাতভিটের অনেক চাষীরই মিল আছে।

সম্প্রতি চক্কোত্তি মশাইয়ের বাড়ীতে তাঁর বিধবা বড় মেয়ের স্থায়ীভাবে আতিথ্য গ্রহণ, তাঁর বাড়ীতে বল্টুবাবুর ঘন-ঘন যাতায়াত, ডাকাতির দু'দিন আগে বিধবা মেয়েটিকে আর বল্টুকে আপত্তিকর অবস্থায় দেখে চক্কোত্তি মশাই কর্তৃক বল্টুবাবুকে তাঁর সীমানায় প্রবেশ না-করবার নির্দেশ দান, ডাকাতির সময় বিধবা মেয়েটির দামী দামী জিনিষেরও কোন ক্ষতি না হওয়া প্রভৃতির সঙ্গে আরও দু'চারটে হলপ-করা সত্য মিশিয়ে পাড়ার লোকে এমনভাবে আসর গুলজার করে তুললে যে চাষীদের কাছেও কথাটা জানাজানি হয়ে গেল।

পুলিশের তদন্ত অবশ্য হলোই। কিন্তু তারপরই ঘোষ মশাই আট বেয়ারার পাল্কী চড়ে থানায় গেলেন এবং তারও পরে কাউকেও গ্রেপ্তার করা হলো না। পাড়ার ফিস্‌ফিসানি আবার আসর জমিয়ে তুললো এবং অবস্থা দেখে চাষীরা নিজেদের ভেতর ফিস্-ফিস্ করে বলাবলি করলে—কিডা সাধু আর কিডা-যেন্ চোর, বুঝতি আমারগে বাকী নেই এট্টুউ।

মাসখানেক পরেই একটা পুলিশ ফাঁড়ী খোলা হলো প্রতাপনগরে।

অতঃপর জমিদারদের গাঁয়ে সার্বজনীনভাবে ধরে নেওয়া হলো যে চাষী মানেই চোর, ছ্যাঁচোড়, না হয় ডাকাত, আর তা-ও যদি না হয় তো' পল্লীরক্ষী দলের ভাষায় নিতান্ত একটা দুর্বৃত্ত তো বটেই। ফলে হাটে ঘাটে মাঠে পথে চাষীদের ওপর যে লাঞ্ছনা সুরু হলো কুম্ভীপাক নরককে ফেলে বোধকরি স্বয়ং যমরাজও পাপীদের সে শাস্তি দিতে ভয় পেতেন।

মাঠে আর বিলে লাঙ্গল পড়লো খুব কম জমিতেই। নিচের দিকে

কোনমতে দু'এক চাষ দিয়ে দু'চারটে যা ধান বোনা হলো। ডাঙ্গার কোল পড়ে রইলো বিনা চাষে। জমিদার মহাজন আর ভদ্রলোকদের জমি নিজেদের ঘরের লাঙ্গলে সিকি পরিমাণ উঠলো, বাকীটা পড়েই রইলো চাষীদের মতো।

ওদিকে নব, নবীন ও তাদের উকীলের হাজার চেষ্টাতেও লক্ষ্মণ সর্দাররা জামিন পেলে না। আরও তদন্তের নামে তারা হাজতেই পচতে লাগলো দিনের পর দিন।

এদিকে গ্রামে গ্রামে ছোটখাটো চুরি ডাকাতি লেগেই রইলো।

বল্টুর দল প্রচার করলো 'শালা নব আর নবীনের দলেরই কাজ এসব।' চাষীরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করলো পল্লীরক্ষা দলই এসব নৈশ অপরাধের স্রষ্টা।

আর যাই হোক, ঢেউ গুণতে দিলেও যাদের ঘরে রাজভাণ্ডার হেঁটে আসে, পরোপকার করে বল্টুবাবুর পকেটও যে কেমন করে তাঁদের মতো ভারী হয়ে উঠলো তার রহস্য একমাত্র পুলিশ ফাঁড়ীর কর্তারাই বোধ হয় জানে বলে প্রতিবেশীদের ধারণা হলো।

কিন্তু, এহেন বল্টুবাবুর এহেন পল্লীরক্ষা দল আর পুলিশ ফাঁড়ীর অতি সজাগ দৃষ্টি অতিক্রম করে এক বর্ষণ-শ্রান্ত অন্ধকার রাত্রে রায় বাবুদের ধানের চারা কারা যে অসংখ্য গরু দিয়ে খাইয়ে গেল, অতি-শিশু বল্টুবাবু কেন, পাকা নায়েব নিবারণ মুখুজ্জেও তার কোন হদিস পেলেন না। তবে হদিস যারা জানতো, সামান্য হলেও একটা প্রতিহিংসাও গ্রহণ করতে পেরেছে ভেবে মনে মনে তারা হাসলো, সে হাসি প্রথম চরিতার্থতায় উত্তপ্ত আর মৌনতায় ও গোপনীয়তায় ক্রুর।

তেরো

রায় বাহাদুরের স্বাক্ষরযুক্ত পত্র পেলেন নায়েব নিবারণ মুখুজ্জে। নায়েব হবার পর জীবনে এমন ধরণের কড়া সরকারী পত্র আর কোনদিন আসেনি তাঁর নামে। তাই ভয় পেলেন ঝানু নায়েব এমন অঘটন প্রথম ঘটতে দেখে।

টাকা! টাকা কোথায়! চক্ষে সর্ষে ফুল দেখলেন নিবারণ মুখুজ্জে। মরুভূমিতেও যদি জল পাওয়া যায়, তবু সারা সদর মহল চষে খুঁড়ে ফর্দা-ফাঁই করে দিলেও প্রজাদের গা দিয়ে রক্ত বেরুতে পারে এক ফোঁটা, পয়সা মিলবে না একটাও।

অন্ধকার রাত্রের অর্ধনিদ্রায় অসংখ্য দুঃস্বপ্ন দেখলেন নিবারণ মুখুজ্জে। ভাবতে ভাবতে ছটফট করতে করতে সর্দি পেকে কাসি হলো তাঁর। এমনি এক সঙ্কটজনক মানসিক অবস্থা নিয়ে হাজির হলেন তিনি অতি বিজ্ঞ উদ্ধব ঘোষের কাছে।

চারিদিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখলেন তিনি। তারপর ধারে কাছে কেউ নেই দেখে নিরাপদ মুহূর্তে ফেটে পড়লেন—এই নাও, ধরো! নিজেই বাড়িয়ে দিলাম এই গলা। এখন চালাও খাঁড়া, যত জোরে পারো—

ঘোষ মশাই বুদ্ধিমান ব্যক্তি। আপ্যায়িত করে ভালভাবে বসতে ও তামাক খেতে দিয়ে বললেন—কত্তারা ঝাঁকিয়েছে নাকি মুখুজ্জে?

—হ্যাঁ-হে, তোমার গুণধর পরাণ-বন্ধু। অ্যাকেবারে কাঁচা আমপাড়া ঝাঁকানি।

—গাছে কি আর আছে কিছু এবার?

—তা গ্যাখে কে? হোসেন শা'র আমুলে গাছ যখন আছে, আমেরও তাহলে অভাব নেই। অভাগা মালী-যে অ্যাখোন ফাঁসী যায়।

উদ্ধব ঘোষের হাত দিয়ে রায় বাহাদুরের কাছে পত্র লিখিয়ে নিজে পকেটে করে নিয়ে এলেন মুখুজ্জে মশাই। ব্যাঙ্ক ফেল-পড়ায় ঘোষ মশাইয়ের যে-সর্বনাশ হয়েছে, তা থেকে সুরু করে দেশের দুরবস্থা এবং সেই দুরবস্থার ফলে চুরি ডাকাতি ও প্রজাদের বিরোধী মনোভাব-সহ মহাভারতের যাবতীয় দুঃসংবাদ বলে-বলে লিখিয়ে নিয়েছেন মুখুজ্জে মশাই।

সেই পত্র ডাকে দিয়ে মুখুজ্জে মশাই বাড়ীতে ফিরলেন এবং ধপ্ করে চটিশুদ্ধ বসে পড়ে ফুক্রে উঠলেন—আর কি রাঙা-বউ শাঁখা-খাড়ু ভাঙো এবার। তার পরদিনই তিনি নারায়ণকে তুলসী দেওয়ানোর ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু সাতদিনের যায়গায় দশ-বারো দিনের মধ্যেও যখন রায় বাহাদুরের প্রাণের বন্ধুর স্বহস্তে লেখা পত্রের কোনই জবাব এলোনা তখন প্রমাদ গণলেন তিনি এবং রাঙা বউকে আর একবার ডেকে কাশী যাওয়ার টোপ্‌লা-টুপ্‌লি বাঁধতে বলে কাছারীতে অর্ধেক রাত পর্যন্ত কাটাতে লাগলেন। সদর মহলের আদায় তহশীলের মোটামুটি বিবরণ মুখুজ্জে মশাই স্বহস্তে তৈরী করলেন এবং পর-পর অজন্মা, মধ্যবিত্ত ও চাষী প্রজাদের আর্থিক দুরবস্থা, কল্পিত প্রজাবিদ্রোহের নতুন নতুন কাহিনী এবং সর্বশেষে তাঁদের সঙ্গে জমিদার বাড়ীর দীর্ঘকালের সম্পর্কের ইতিহাস প্রভৃতি বিদ্যাসাগরী নরম-গরম ভাষায় লিপিবদ্ধ করে রায় বাহাদুরের কাছে এমন এক বিরাট পত্র লিখলেন যে রেজেষ্ট্রী করতে গিয়ে ডবল মাশুল লেগে গেল। তারপর হরির লুঠ এবং সত্যনারায়ণ ও শনির সিন্নি দিলেন এবং কালীবাড়ীতে গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানিয়ে জোড়া-পাঁঠা মানত করে এলেন।

এ-পত্রের উত্তর আসতে দেরী হলো না। কিন্তু সে জবাবে মা-কালীর জোড়া-পাঁঠা খাবার ইচ্ছে একবিন্দুও প্রকাশ পায়নি। উল্টে

ইন্দ্রের বজ্রই নেমে এসেছে, শুধু তার কড়কড়ানিটাই যা নরম একটু। জবাবটা রায় বাহাদুর দেননি, দিয়েছেন ম্যানেজার। তাতে শুধু এইটুকুই লেখা আছে যে, মুখুজ্জে মশাই পুরোনো কর্মচারী বলেই রায় বাহাদুর খুশী হয়ে তাঁর জন্যে নির্ধারিত টাকা আদায় দেওয়ার মেয়াদ এক মাস থেকে বাড়িয়ে দেড় মাস করে দিয়েছেন। এই মেয়াদ যে আর একদিনও বাড়ানো হবে না মুখুজ্জে মশাই যেন সে কথাটা মনে রাখতে ভুলে না যান, এ সতর্কতাও জ্ঞাপন করা হয়েছে।

এ-পত্র যে প্রায় চরম পত্র, শুধু মুখুজ্জে মশাই ন'ন, উদ্ধব ঘোষও তা বুঝতে পারলেন।

কিন্তু এখন উপায় কি? হালই হোক আর বাকীই হোক, খাজনা আর আদায় হবে না। সুবছরেও তামাদীর পর এই সময়টা খাজনা আদায় বিশেষ কিছুই হয় না। এবছরের তো কথাই নেই।

মুখুজ্জে মশাই আর উদ্ধব ঘোষের দু'টি পাকা মাথা এক হলো। বিষয়-চিন্তায় বিকৃত দু'খানি প্রাচীন মুখ ঘন হয়ে ফিস্-ফিস্ করলো এবং তারই ফলস্বরূপ যে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত জন্মলাভ করলো তার পরিণাম যেমন ভয়ঙ্কর তেমনি অনিশ্চিত।

সিদ্ধান্ত হলো, অসংখ্য প্রজার নামে এযাবৎ যত খাজনা আর কর্জার ডক্রী না-জারী অবস্থায় পড়ে আছে, সত্ত-ফী দিয়ে সেগুলো জারীতে দিতে হবে—অন্য কোন পথ নেই।

অতএব সব ঝুঁকি ঘাড়ে নিয়েই নায়েব মশাই এই অতি দুর্গম পথই বেছে নিতে বাধ্য হলেন।

প্রজাদের ভবিষ্যৎ চরম লাঞ্ছনার কল্পনায় নায়েব মশাই জীবনে বোধহয় এই সর্বপ্রথম সত্যকার মর্মবেদনা অনুভব করলেন। কিন্তু নজের ধন-প্রাণ-সম্মান রক্ষার অনিবার্য তাগিদে তেত্রিশ কোটি দেবতার কাছে বারে বারে মাফ চেয়ে বললেন—আমি নিরুপায়, আমি নিরুপায়।

তবু, রাত্রে তাঁর ভাল ঘুম হয় না। বহুযুগ আগেকার বিদ্রোহী প্রজা নিহত শিবু সর্দারের বিশ্বনাশা হুঙ্কার শুনতে শুনতে স্বপ্নের ঘোরেই তিনি বিছানায় উঠে বসে ঘামতে থাকেন প্রায়ই।

শা-মাদার তলার পাশ দিয়ে জেলা বোর্ডের যে রাস্তাটা দুই হাটে গিয়ে মিলেছে তার ওপর দাঁড়িয়ে খোনার-বল্লামের ফলা-পরানো লাঠি হাতে, আর মশালের মতো বাধা নারকেলের পাতার কাড়ু বগলে চেপে নব বিশ্বাস সজোরে ডাক দেয়, এ-এ-হু-উ-উ-ই-ই—

সঙ্গে সঙ্গে তার শ'দুই গজ দূরে বিলের মাঝে কেউটি ঝোপের ভেতর দাঁড়িয়ে বগলে নারকেল পাতার কাড়ু আর হাতে লাঠি নিয়ে সাতভিটের নবীন মণ্ডল ডাক দেয়—এ-এ-হু-উ-উ-ই-ই—

সঙ্গে সঙ্গে শা-মাদার তলার কাছাকাছি আস্তাওড়া ঝোপের ভেতর দাঁড়িয়ে খোনা হাতে কাড়ু বগলে ভীম সর্দার ডাক দেয়—এ-এ-হু-উ-উ-ই-ই—

একের পর এক এই ডাকগুলো ধারাবাহিক হুঙ্কারে পরিণত হয়, আদিম মানুষের এই সাঙ্কেতিক আহ্বানে অন্ধকার রাত্রির বুক বিদীর্ণ হয়ে যায়, বিলের ওপর দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে ছুটে যায় এই আহ্বান, চাষীদের গাঁয়ে গাঁয়ে আছড়ে পড়ে বজ্রাঘাতের তীব্র আঘাতে, মরা মানুষের হাড়ও যেন জেগে ওঠে সেই আহ্বানে।

—চাষীদের গাঁ থেকে জবাব আসে—এ-এ-হু-হু-উ-ই—

চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি মেলে, সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে তিনটি লোক এসে মিলিত হয় শা-মাদার তলায়।

খস্-খস্ করে শব্দ ওঠে পাশের ঝোপটার ভেতর। মুহূর্তে ওরা লাফিয়ে সরে যায় দূরে দূরে, শব্দ লক্ষ্য করে খোনা উঁচিয়ে ধরে।

অন্ধকার ঝোপটার পাশে আরও অন্ধকার রং-এর দুটো জীবের মূর্তি দেখা যায়, তার পেছনে আরও।

নব নবীন আর ভীম আবার ঘন হয়ে দাঁড়ায় হাতচারেক করে ব্যবধান রেখে। পা পেছনে রেখে খোনাগুলো উঁচিয়ে ধরে শব্দ আর আঁধারের জীবদের লক্ষ্য করে।

শিকারী পশু যেমন শীকারকে শেষ সুযোগ দেয় তেমনি করে নব জিজ্ঞাসা করে—কিডা, কিডা দাঁড়ায়ে!

কোন জবাব আসে না।

নব উত্তেজিত হয়ে ওঠে। খোনা-ধরা হাত আরও সোজা আর দৃঢ় হয়ে ওঠে। দৃঢ়কণ্ঠে সে সাঙ্কেতিক প্রশ্ন করে—শত্তুর?

—না।

—মিত্তির?

—হ্যা।

উত্তর শুনে হতাশ হয় নব। একটা মারাত্মক ঘটনার আশায় স্নায়ু আর পেশী তার উগ্র আর দৃঢ় হয়ে উঠেছিল। এমন পরিচিত শিক্ষিত উত্তরে আর আপন জনের রক্তের নিরামিষ গন্ধে তার মনের কেন্দ্রীভূত উত্তেজনার খোরাক বন্ধ হয়ে গেল। সমগ্র মন তার অকস্মাৎ কেমন বিরক্তি আর নৈরাশ্যের স্পর্শে ভাঁটীয়ে ঝিমিয়ে নেমে পড়ে স্বাভাবিক স্তরে। বিরক্তি চাপতে চাপতে অবিশ্বাসের সুর কণ্ঠে ফুটিয়ে নব আবার বলে—শলক!

দু'পক্ষ থেকেই দেশলাই জ্বলে।

নব হেসে ফেলে—হ্যাদ্দ্যাখো, ভয় দিয়ে মারতিলে তুমি?—ও নয়নকা'? হ্যাদে সন্ন্যেসীকা, তুমিউ-যেন্।

তাদের দু'জনের হাতে দুটো দামড়া গরুর দড়ি। ঝোপটার পাশে বোঁচকায় বাধা কিছু মালপত্র।

অতি সন্দেহে নবীন জিজ্ঞাসা করে—অ্যাতো রাত্তিরি গরু, ওই সব মালপত্তোর? ব্যাপারডা কি কওদিন্ তুমরা?

নব এতবেলা এসব লক্ষ্য করেনি। দেখেই সে রেগে গেল। গামছাশুদ্ধ নয়নের গলা চেপে ধরে বললে—ভদ্দোরলোকগের মতো আরম্ভ করিছ নাকি চুরিচামারি?

নয়ন কথা বলতে পারে না, তার দম বন্ধ হবার উপক্রম। সন্ন্যেসী বললে—তুহাই খুড়ো, ছাড়ো ওরে। চুরিচামারি কিচ্ছু না এ হলো আমার ধলাই, এই ত্থাখো, আর উডা হচ্ছে ওর শিয়েলী, ওই ত্থাখো। আর ওই-যেন্ দেখতিচো, ওসবই বাড়ীর মাল।

নব চিনতে পারে এতক্ষণে গরু দুটোকে। নিজের গ্রামের গরু যে! ধলাইয়ের লেজ চুমরে টোক্কর দেওয়ার আকস্মিক ইচ্ছেটা সে বড় জোর চেষ্টাতেই সামলে গেল।

নবীন জিজ্ঞাসা করে—তা, হ্যাতো রাত্তিরি চলিচোই বা কনে সথা সব্বেবস্বো নিয়ে—কাশী, না ছিরিখেত্তোর?

নয়ন ছাড়া পেয়েছে। নবর হাতের অকারণ আপ্যায়নটা এখনও সে হজম করে উঠতে পারেনি। খেংরে উঠে বললে—ছিরিখেত্তোর না, ওই-গেন্ মামার বাড়ী।

মামার বাড়ীর নামে সবাই হেসে উঠলো। মামা মানে বাবার শালা। তাদের বাড়ী মানে থানা, না হয় পল্লীরক্ষী দলের অফিস। সরাসরি শালা বলতে না পেরে চাষীরা আজকাল পুলিশ আর পল্লীরক্ষী দলের নাম দিয়েছে 'মামা'।

সন্ন্যেসী বললে যে, অস্থাবর ক্রোক যে-ভাবে চলছে তাতে কোনো বাড়ীই আর বাদ যাবে না। গরু দুটো আর তল্পি-তল্পা যা আছে সেগুলো নিয়ে ওরা পালিয়ে এসেছে। ভোর রাত্রে আর শীলদাররা ধরতে পারবে না ওগুলো।

নব বললে যে, পালিয়ে আর কি হবে। দু'একবাড়ী হলে না হয় কথা ছিল, কিন্তু তা'তো নয়, মাত্র দু'এক বাড়ীই বাদ আছে। কাজেই সবাই মিলে একটা ব্যবস্থা করতে হবে। আজ মিটিং আছে ওদের। সেই মিটিং-এ সিদ্ধান্ত হবে অস্থাবর ক্রোকের ব্যাপার সম্বন্ধে। কাজেই ওদের পালিয়ে যাবার দরকার নেই। আপাততঃ নয়নকাকা তামাক সাজুক।

অনেক কালো কালো মূর্তি বিলের চারিপাশ থেকে এগিয়ে আসছে। সেইসব ছায়ামূর্তির দিকে চাইলে অতি দুঃসাহসীর মনেও যে ভয় জাগে তাদের দিকে চেয়ে সন্ন্যাসীও সেই ভয়ে অবসন্ন হয়ে যেতে যেতে বলে—পলাবো ও ভাইপো?

নব হাসে, দুঃসাহসী সৈনিক শত্রুবধের পরে যেমন করে আত্ম-প্রসাদের হাসি হাসে, তেমনি করে। ওরা দড়ি হাতে করে আগন্তুক মূর্তিগুলোর দিকে বিহ্বলভাবে চেয়ে থাকে।

আশায় উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে নবীন জিজ্ঞাসা করে—কাড়ুডা ধরাই?

নব তীব্রগতিতে এগিয়ে যায় তার দিকে, প্রায় চেঁচিয়েই বলে ওঠে—না, না, না! সব্বোনাশ করে না মিতে, এক্কোনি পিরতাপনগরের দুষমনে ঠিক পাবে আমারগে যায়গা। আজ ছোট্‌ঠাউর আসতেছে, তিনারে শুদ্দো ধরায়ে দিবা নাকি তুমি!

নবীন দেশলাই জ্বালিয়ে পাতার মশালের আগায় ধরেছিল। তাড়াতাড়ি হাতের বাতাস দিয়ে নিভিয়ে ফেলে নব শ্লেষের সুরে বলে ওঠে—মিত্তির হয়ে শত্তুরতা করবা? মামারগে ডাকে আনবা তুমি।

নবীন লজ্জা পেয়ে কাড়ু নামিয়ে দেশলাইটা গাঁটে গোঁজে। ছায়ামূর্তিগুলো শা-মাদার তলার খুব কাছে এসে গেছে ততক্ষণে।

—ছোট্‌ঠাউর কিডা, ও ভাইপো? নয়ন জানতে চায় ছোট্ঠাকুরের পরিচয়টা।

—ছোট্ঠাউররে চিনতি পারলে না? কওদিন্ হাত-পা নড়ে কার হুকুমি?

—মাথার।

—কওদিন্, মানুষ কেঁচো হয়না কি থাকলি?

—বুকির পাটা থাকলি।

—কওদিন সড়কি আটকায় কিসি?

—যতো তুমার বাজে ঝগুাই ঢালে আটকায়, তা কিডা না জানে?

—চটো ক্যানো। আচ্চা বোলোদিন, মাথা বুকির পাটা আর ঢাল একসঙ্গে করলি কি হয়?

নয়ন এতক্ষণে সত্যিই চটেছে। বললে—শুনবা, হয় অ্যাট্রো ঘণ্টু কুলু।

—না তা হয়না, হয় ছোট্ঠাউর।

নয়ন লজ্জা পায়। বলে বড্ডো অন্যাই হয়ে গেছে ভাইপো, বুলে না য্যানো তিনারে আমি যা বুললাম। তা, অ্যামোন মানুষ পালে কনে ও ভাইপো?

—লক্ষ্মণ সদ্দারগে মাওলা করতি যায়ে পাইচি। উকীল বাবুর বন্ধু-যেন্ উনি।

নবীন বলে—তিনার মূলির কথা জানো কেউ? পিরতাপনগরের মুখুজ্জে বাড়ীর ছবাল তিনি। আসল নাম হলো সুদরশোন মুখুজ্জে। দেখতি দেপতার মতো, চাষার জন্যি বোদকরি পরাণডাই দিতি পারে।

পরাণ আর সন্ন্যেসী অনুপস্থিত ছোট্ঠাউরের উদ্দেশে প্রণাম করলো কপালে দু'হাত ঠেকিয়েই। নত হয়ে পড়লো তারা শ্রদ্ধায়।

প্রতাপনগরের পার থেকে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ আর হুইসেলের তীক্ষ্ণ সুর ভেসে আসে।

নব বলে—মামারা গন্দো পায়েছে, খুজতেছে রায়দীঘির পাড়ে উঠে।

সবাই তাকিয়ে দেখে রায়দীঘির পাড়ে অনেকগুলো মশাল জ্বলছে,

তারই আলোয় আভাষ ফুটে উঠেছে ছোট ছোট পুতুলের মতো একদল মানুষের।

ভয় আর সাহসের লড়াই চলে শা-মাদার তলায়। নব দুঃসাহসী, হাসতে হাসতে বললে—মামারা ভয় পায়েছে বুঝলে মিতে। দেখতিচোনা, অ্যাক পা-ও বাড়াচ্চেনা আর।

রায়দীঘির পাড়ে দাঁড়িয়ে বাবুপাড়ার মহারথীরা জানোয়ার তাড়াবার মতো করে চিৎকার করছে—হেই-ধ্যেই-ধ্যেই—

গালে হাত দিয়ে বসে পড়লেন পাকা নায়েব নিবারণ মুখুজ্জে আর ডেকে পাঠালেন পাকা তালুকদার-মহাজন উদ্ধব ঘোষকে। উদ্ধব ঘোষ বিবরণ শুনে মাথায় হাত দিলেন।

চাষীরা দল বেঁধে ফাঁসিয়ে দিয়েছে তাঁদের অতবড় পরিকল্পনাটা।

সারা চাষীগাঁয়ের ভেতর লোকের বাড়ীতে গরু নেই, গরুসব আদাড়ে বাগানে মাঠে বিলে, ঘাস খেয়ে বেড়াচ্ছে অ্যাড়া–কালের মতো। পেছনের পায়ের ওপর গোল ছাপ মেরে একেবারে বাছুরটিকে পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছে ব্যাটাচ্ছেলেরা। ভদ্রলোকের জমিতে যে–ক'টা ধানচারা হয়েছিল অসময়ে এইসব অ্যাড়া গরুতে তাও ফিনিশ করে দিয়েছে। গরুগুলোও কি শিক্ষিত বাবা, ধরতে গেছি কি তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে কোথায় যে কেটে পড়েছে তার নাগালই নেই।

অস্থাবর ক্রোক করতে গিয়ে যদি গরুই না পাওয়া গেল তো ধরার মতো ধরবে কোন মাল যাতে ডিক্রীজারীর খরচাটাও অন্তত উশুল হয়? কি আছে ব্যাটাচ্ছেলেদের ঠোলা আর মাল ছাড়া?

ধান দু'মুঠো যা-ও বা ছিল, রাতারাতি হয় সব ধাম্মোগোলায় জমা করেছে, না হয়, যার কোন দেনা নেই তার বাড়ীতে আলাদা ডোল বা আউড়ী পেতে তাতে সরিয়ে দিয়েছে বেমালুম। কার ধান ধরবে

বলো ? অস্থাবর ক্রোক করতে গিয়ে কি ফ্যাসাদেই না পড়া গেছে দাদা; টাকা আদায় তো পড়ে মরুক, খরচাটাও যে জলে যায় !

কাছারীর গদীতে গালে আর মাথায় হাত দিয়ে বসে বসে ভাবেন নিবারণ চক্কোত্তি আর উদ্ধব ঘোষ।

উদ্ধব ঘোষের স্মৃতিশক্তি বড়ই প্রখর। তাঁর মাথায় এসে যায় রায় বাহাদুরের সেই উক্তিগুলো—"অস্থাবর ক্রোকটা এমন ভাবে করালেন যে প্রজারা বাধ্য হলো বাধা দিতে……।" ঘোষ মশাই মনে মনে আওড়ান—অস্থাবর ক্রোক শুধু করলেই হলো না, 'এমন ভাবে' করাতে হবে যাতে প্রজারা বাধ্য হবে বাধা দিতে, মানে 'এমন ভাবে,' যাতে মানে—

এবং নিবারণ মুখুজ্জেকে তিনি খুলে বলেন অস্থাবর ক্রোকের যে-তত্ত্ব স্বয়ং জমিদার সাহেব বাতলে দিয়ে গেছেন। প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা শুনে ঝানু নায়েব নিবারণ মুখুজ্জের জ্ঞানচক্ষু খুলে যায় এবং দিব্যজ্ঞানের প্রথম আঘাতে প্রায় অজ্ঞান হয়েই বসে থাকেন। এবং বিকেল বেলায় ডাক পড়ে বল্টুবাবুর। অস্থাবর ক্রোকের পুরোণো কায়দাটা পাল্টে এবার যে তাঁর দলের যুবকদের দিয়েই নতুন কায়দায় কাজ হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে বল্টুবাবুর পকেটেও যে কিঞ্চিৎ গোলাকার শ্বেতবস্তুর শব্দ উঠবে, নায়েব মশাই বেশ ভাল করেই সেসব কথা বুঝিয়ে বলেন। বল্টুবাবুও তাঁর অফিসে গিয়ে দলের লোকের সামনে গম্ভীর মুখে পল্লীরক্ষার এই চমকপ্রদ উপায় শ্লীল অশ্লীল নানাবিধ কথায় প্রাঞ্জল করে দেন। ভদ্রপাড়ার যুবকদের মুখে পল্লীর মান সম্ভ্রম রক্ষার মহৎ প্রেরণার আভাষ উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে অতীতের রাজসৈনিকদের মুখে দেশরক্ষার প্রেরণায় যেমনভাবে সাহস ও দেশপ্রেম ফুটে উঠতো।

অতঃপর অস্থাবর ক্রোক হয় আর পল্লীরক্ষীর যুবকরা মাঠ ঘিরে দলকে-দল গরু তাড়িয়ে নিজেদের গাঁয়ে নিয়ে যায়। আদালতের

চাপরাশী ভয় পায়। ক্রোকী পরোয়ানায় মোটে দুটো গরু আছে, কুড়িখানেক গরু ধরার রিটার্ণ সে কেমন করে দেবে। কাজেই আর গরুগুলোর দু'একটা বাদে সবই ফিরে আসে মাঠে এবং ফিরে আসার সময় ভদ্রলোকদের গাছপালা আর চারাধান খেয়ে তছনছ করে দিয়ে আসে।

ওদিকে আরও গোলমাল। পেছনের পায়ে চক্কোর—দেওয়া গরু কেউ নিলামেও কিনতে চায়না। শহরে নিয়ে গেলেও এমন দুর্বৎসরে গরু কেনার লোক জোটে না। বাধ্য হয়েই জমিদার পক্ষ নিজেরাই নিলাম ডাকেন এবং চল্লিশ টাকার বলদজোড়া আট টাকায় খরিদ করে কাছারী বাড়ীর গোয়ালে রেখে দেন। এমনি করে করে কাছারীর গোয়ালে গরুর সংখ্যা বেড়েই যায়। সেগুলোকে দিয়ে যে কি হবে, সেও এক সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

খবর দিয়ে নায়েব মশাই শহর থেকে কশাই আনালেন। তারা আট টাকা জোড়ার গরু ষোল টাকায় কিনে দল ধরে নিয়ে গেল। টাকাটা অবশ্য নায়েব মশাই খাতায় উশুল দিলেন সেই আট টাকা হারেই। ওদিকে মাইলখানেক যেতে না যেতে কারা জানি কশাইদের তাড়া করলে এবং ধরে ফেলে পেছনের পায়ে ছাপ—মারা গরু কেন কিনেছে জিজ্ঞাসা করলে আর জ্যান্তই তাদের চামড়া খুলে নেবে বলে জানিয়ে দিলে। কশাইরা বেকায়দায় পড়ে জনে জনে হানাদারদের পায়ে ধরলো এবং নিবেদন করলো যে, চামড়া খোলার কাজটা তারা ছাড়া আর কেউ করলে তাদের পেশাটা হাত-ছাড়া হয়ে যাবে, তাদের বেকার করার জন্যে এমন কাজ যেন দয়া করে আর কেউ না করেন। তার বিনিময়ে তারা গরু ছেড়ে দিয়ে দু'কাণ ধরে হটতে হটতে পেছনের পায়ে ছাপ—মারা গরু কোনদিন কোন জায়গা থেকে কিনবে না বলতে বলতে পালিয়ে যেতে শপথ

করলে। অতএব ক্রোকী গরু বিনি পয়সায় মালিকের বাড়ীতেই ফিরে গেল এবং চাষীপাড়ায় হাসির বান ডাকলো।

ক'দিন পরে তারা আরও জানতে পারলে যে, টাকা কেড়ে রেখে গরু দেওয়া হয়নি, এই অভিযোগে কশাইরা কাছারীর নায়েবের নামে ফৌজদারী করেছে। চাষীপাড়ায় আবার হাসির বান ডাকলো।

এবং জমিদার পাড়ায় যুবকদের মুখ চুন হয়ে গেল, নায়েব মশাই আবার গালে হাত দিলেন এবং উদ্ধব ঘোষ দিলেন মাথায় হাত

শেষরাত্রে দরজা ভাঙ্গার শব্দে কেষ্ট আর কেষ্টর বউ জেগে উঠলো। কেষ্টর বউ ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলো।

সঙ্গে সঙ্গে উঠোন থেকে কথার শব্দ এল—আমি রাঘব রায়, স্থায়ানী আদালতের প্যায়দা, মাল ক্রোক হচ্ছে, খালি হাতে বাইরে আসে দাঁড়াও সব।

দু'টি ছেলেমেয়ের হাত ধরে কেষ্ট আর তার বউ বাইরে না গিয়ে ঘরের ভেতরই বসে রইলো।

তাদের শুনিয়ে শুনিয়ে আদালতের পেয়াদা হাঁকতে লাগলো—ঘরের দরজা চারখান।

পল্লীরক্ষী বাহিনীর ছেলেরা শাবল দিয়ে দেওয়াল ভেঙ্গে চৌকাট-সহ দু'জোড়া দরজা খুলে নিলে।

পেয়াদা আবার বললে—জানালা ছয়খানা।

পল্লীরক্ষী দলের তরুণরা মহাকলরবে আবার শাবল দিয়ে খুঁড়ে তিনজোড়া জানালা খুলে নিলে।

পেয়াদা হাঁকলো—ধান তিন শলী।

পল্লীরক্ষী বাহিনীর ছেলেরা কেষ্টর ছোট গোলাটার দরজা ঘা মেরে খুলে দিলে। তখন অন্ধকার কাটেনি। ভেতরের কিছু দেখা

যায় না। ভেতর দেখবার জন্যে তারা গোলার চালটা ঠেলে ঠেলে ফেলে দেয় নিচে। ভারী চালখানা আচমকা মাটিতে পড়ে ভেঙ্গে যায়।

কেষ্ট ঘর থেকে লাফিয়ে পড়ে। চিৎকার করে বলে—কোরোপ করবা ধান, গুলার চাল ভাঙ্গলে ক্যানো আমার, ও প্যায়দাবাবু, গুলার চাল ভাঙ্গো কোন আইনী।

পেয়াদা হাসতে হাসতে বলে—ও বাবুসগোল, আপনারা গুলার চাল ফ্যালেন ক্যানো, উডাতো আইনা কয় না।

পল্লীরক্ষী বাহিনীর ছেলেরা পেয়াদার কথার রসটা উপভোগ করে। তারা মহাকলরবে খালি গোলাটাও ঠেলতে ঠেলতে ফেলে দেয় আর একপাশে। ছোট গোলাটা মাটীতে পড়ে ক্যাঁচ কোঁচ্ শব্দ করতে করতে গড়িয়ে যায় উঠোনের একপাশ থেকে আর পাশে।

বন্টুবাবু বলে—ছাখতো রাঘব, এটা বোধহয় আইনে আছে। বন্টুর দলের ছেলেরা হেসে ওঠে হো-হো করে।

কেষ্ট ক্ষেপে যায়। চিৎকার করে উঠোনের একপাশ থেকে আর একপাশে ছুটে যায় পাগলের মতো। দু'একজন প্রতিবেশী ঘুম ভেঙ্গে চোখ রগড়াতে রগড়াতে এগিয়ে আসে কেষ্টর বাড়ীর দিকে।

পেয়াদা হাঁকে—দামড়া গরু দুটো, গাই গরু একটা।

পল্লীরক্ষীর ছেলেরা ছুটে যায় গোয়ালে। গোয়াল খালি। বন্টু অশ্লীল ভাষায় চেঁচিয়ে ওঠে—ধেশ্বালা, একদম ফাঁক!

পল্লীরক্ষী বাহিনীর ছেলেরা আবার হাসে।

পেয়াদা আবার হাঁকে—হ্যা, এই গে ছাগল দুটো।

ওরা ছুটে আসে, বড় ঘরের বারান্দার ছাঁইচে ডোয়ায় লাগানো ছোট দরজাটা খুলে ফেলে। ছোট একটা কালো খাসী লাফিয়ে পড়ে, গলার ঘুঙুরগুলো বেজে ওঠে ঠুন্‌ঠুন্ করে। উঠোনে অনেক লোক দেখে ছাগলটা ঘাবড়ে যায়। প্রাণভয়ে বারান্দায় উঠতে

যায় পৈঠে দিয়ে। পল্লীরক্ষীর দলের সহকারী কাপ্তেন থাজাগুণ্ডা উপেন সেটার গলা ধরে টেনে নামায়, খাসীটা ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করে ডেকে উঠতেই কেষ্টর ছেলে আর মেয়ে কেঁদে ওঠে—ওরে মারে, আমাগের কালীঠাকুররি ধরে নেলে উরা।

কেষ্টর ছেলেটা ঘন্টিসুদ্ধ খাসীর গলার দড়ি টেনে ধরে সমানে চেঁচায়, দাদার কোমর টেনে ধরে মেয়েটাও কাঁদে। থাজাগুণ্ডা উপেন, গাঁয়ের পাঁঠা খাসী সেই-ই বলি দেয়, জিভটা তার সজল হয়ে ওঠে। হ্যাঁচকা টান দিয়ে খাসীটাকে সে ডাইনে থেকে ছাড়িয়ে বাঁয়ে রাখে। খাসীটা ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করে মরণ ডাক ডাকতে ডাকতে কাত হয়ে পড়ে পা ছিটকোয়। হ্যাঁচকা টান খেয়ে কেষ্টর ছেলেমেয়ে পড়ে গিয়ে কাঁদতে থাকে।

পেয়াদা জোর গলায় বলে—বাক্সো একটা।

পল্লীরক্ষী দলের একপাল ছেলে ঘরে ঢুকে যায়। বাক্স কই? চাষীর বাড়ীতো বাক্স থাকে না, তারা তন্ন তন্ন করে খোঁজে, হাঁড়ি কুঁড়ি উল্টে ভেঙ্গে তছনছ করে, চাল ডাল হলুদ তেঁতুল এক সাথ করে তাণ্ডব নৃত্য চালায় ঘরের ভেতর। অকস্মাৎ তারা চেঁচিয়ে ওঠে—এই যে, এই যে, পাওয়া গেছে!

দেওয়ালের মাথায় চালের কোণে ছোট একটা বেতের ঝাঁপি। মহা উল্লাসে সেইটে তারা টেনে নামায়। ছুটে যায় কেষ্টর বউ—কর কি, কর কি, ঝাঁপি নিয়ো না, ও ঝাঁপি আমার—বলে চিৎকার করতে থাকে।

ঝাঁপির ডালা খুলে বন্টুবাবু একগাছা রূপোর মাদুলী তুলে ধরে এবং তৎক্ষণাৎ প্যাণ্টের পকেটে পুরে ফেলে। তারপর বার করে একটা রূপোর নথ আর চারগাছা রূপোর চুড়ি। দলের ছেলেগুলো এগিয়ে আসতেই সেগুলো বন্টুবাবু প্যাণ্টের পকেটে রেখে দেয়।

কেষ্টর বউয়ের আর জ্ঞান থাকেনা। সে ঝাঁপিয়ে পড়ে চেপে ধরে বল্টুকে। মুখে চিৎকার করতে থাকে—আমার মাদুলী দ্যাও, আমার চুড়ি দ্যাও, ওসব আমার……

বল্টুবাবু ঘাবড়ে যায়। মেয়েমানুষে এমনভাবে অকস্মাৎ ধরে ফেলতে পারে ভাবতে পারেনি সে। কোমরটা তার নড়তে পারছে না, যেন কুমিরে ধরেছে। কেষ্টর বউ-এর চুল ধরে টানতে টানতে বল্টুবাবু অশ্লীল ভাষায় চিৎকার করতে লাগলো—হেই…মাগী, ছাড়, শীগ্‌গীর ছাড়, তোর…তোর মার…।

পেছন থেকে আর সব যুবক যে যেখানে পারে ধরে টানতে থাকে বউটাকে।

কেষ্টর বউকে যেন ভূতে পেয়েছে। বল্টুবাবুর কোমর ধরে শুধুই সে বলতে থাকে—আমার মাদুলী, আমার চুড়ি…

পল্লীরক্ষী বাহিনীর যুবকরা তখনও টানাটানি করছে বউটিকে ধরে। দু'তিনজনে তার কাপড় ধরে টানছে। টানা-টানিতে বউটি প্রায় উলঙ্গ হয়ে যায়। তার হাত খুলে যায় বল্টুর কোমর থেকে। দু'হাত দিয়ে কাপড় চেপে সে বল্টুবাবুর উরুদেশ কামড়ে ধরেছে।

আর্তনাদ করে ওঠে বল্টুবাবু—রাক্ষসী আমাকে খেয়ে ফেললে রে, খেয়ে ফেললে। তার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে লজ্জায় আর ভয়ে।

খাজাগুণ্ডা উপেন সজোরে ঘুসি মারে কেষ্টর বউয়ের মুখে। মুখখানা তার ঘুরে গেল একপাশে। বল্টুর উরুদেশের গা বেয়ে তার ভাঙ্গা দাঁতগুলো ঝর্ ঝর্ করে গড়িয়ে পড়ে প্যাণ্টের ওপর দিয়ে। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বেরোয় কেষ্টর বউয়ের মুখ দিয়ে। সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় মাটিতে।

ঠিক সেই মুহূর্তে কেষ্ট এক অদ্ভুত হুঙ্কার দিয়ে রান্নাঘরের বারান্দার একটি খুঁটি ভেঙ্গে নিলে, লাঠি খেলবার মতো পাক দিয়ে দিয়ে

পাঁয়তাড়া কষতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার চাষীরা লাঠি-ঠেঙ্গা নিয়ে ঘিরে ধরে পল্লীরক্ষী বাহিনীর অস্থাবর ক্রোককারীদের। পেয়াদা রাঘব রায় কাগজপত্র গুটিয়ে 'আমি স্থায়ানী আদালতের প্যায়দা' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে গোলার মাচায় জমা-করা ক্রোকী মালের ওপর উঠে দাঁড়ায়। তার দিকে কেউ নজর দেয় না। রোষে কম্পিত চাষীরা লাঠি উঁচিয়ে গোল চক্র করে এগিয়ে যায় শীলদার যুবকদের দিকে।

পল্লীরক্ষী বাহিনীর মহাবীরদের প্রাণ উড়ে যায় ভয়ে। বড় ঘরের পেছনের দেওয়ালের যে জায়গাটা থেকে একটু আগে তারা দরজা ভেঙ্গে এনেছিল, ছাগলকাটা উপেন তুড়ি লাফ দিয়ে সেই পথে পালিয়ে যায়। একদল চাষী তাকে তাড়া করে আগড়ের মাথায় চেপে ধরে এবং লাঠির গুঁতো দিয়ে তার দাঁত ভেঙ্গে দেয়। উপেনের সঙ্গীরা উপেনের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায় এবং চাষীদের হাতে বেশ উপযুক্ত ভাবেই আপ্যায়িত হয়। বল্টুবাবু সর্দার মানুষ, রান্নাঘরের বেড়া ফাঁক করে পালাতে গিয়ে তার গলাটা আটকে যায় বেড়ার ফাঁকে, না পারে সামনে এগুতে আর না পারে পেছনে পেছুতে, পা দু'খানা তার ঘরের মেঝেয় শুধু দাপাদাপি করতে থাকে। সেই অবস্থায় ধরে চাষীরা তাকে বেঁধে ফেললে এবং 'এ শালারে ছাড়া হবে না' বলে উঠোনের মাঝখানে ফেলে রেখে দিলে।

ইতিমধ্যে চাষীপাড়ার মেয়েরা এসে ক্রোকী মাল দখল করে নিয়েছে। পেয়াদা রাঘব রায় কখন জানি কেটে পড়েছে, কেউ টেরই পায়নি তা।

. .

দুপুর বেলা কাছারী বাড়ীর দোতালার ঘরে পাকা নায়েব নিবারণ মুখুজ্জে আর উদারচেতা তালুকদার-মহাজন উদ্ধব ঘোষ পরস্পরকে আলিঙ্গন করেন। ঘোষ মশাই নায়েব মশাইয়ের পদধূলি নিয়ে উঠে

দাঁড়ালেন। নায়েব মশাই আজকার সাফল্যের জন্যে মা-শ্মশান কালীকে জোড়া পাঁঠা ভোগ দেবেন বলে মানত করলেন।

ঠিক সেই সময়ে মুখে চুনকালী মাখা, চুল আর ভ্রু কামানো উলঙ্গ বল্টুবাবু ফিরে এলো কাছারী বাড়ী। সবাই আরও দেখলে তার সামনের ছ'টি দাঁত নেই।

—আগুন জ্বালিয়ে দেবো, গাঁ-শুদ্দু আগুন—

যাঁকে কেউ সাধারণত প্রকাশ্যভাবে বিচলিত হতে দেখেনি সেই উদ্ধব ঘোষ অকস্মাৎ অপমানে চিৎকার করে উঠলেন যাত্রাদলের সেনাপতির মতো এবং যে-ভাষা তাঁর মুখ দিয়ে বেরুবার কথা কেউ কোনদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি ক্রোধের দুর্জয় আবেগে সেই অশ্লীল ভাষায় তিনি চরম শপথ উচ্চারণ করলেন।

একদিন পরেই নায়েব মশাই আর উদ্ধব ঘোষের আশার গাছে ফল ধরলো—প্রজারা সরকারের সামনে গিয়ে পড়লো এবং আড়ালে পড়ে গেলেন জমিদার। লাল পাগড়ীতে ছেয়ে গেল বিল অঞ্চল, যে দু'চারটি ধানের চারা অবশিষ্ট ছিল ভারী বুটের তলায় সে-ক'টিরও শেষকৃত্য সুসম্পন্ন হলো। সন্তানহীন অনাথার মতো বন্ধ্যা বসুন্ধরা বর্ষণশ্রান্ত অন্ধকার রাত্রির তলায় দিগন্তলগ্না হয়ে রইলেন, পেচকের ডাকে আর ভারী বুটের শব্দে আবার ভীতিবিহ্বল হয়ে উঠলো সেই রাত্রিগুলো।

কিন্তু পুলিশ আর পল্লীরক্ষী বাহিনীর মহারথীদের গালে মাছি গেল রাজাপুরের নব বিশ্বাস আর তার দলের আট-দশজন লোকের যেমন কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না, তেমনি সাতভিটের নবীনের দলেরও কোন পাত্তা মিলছে না। গ্রেপ্তারী পরোয়ানা পুলিশের ফাইলে পচতে লাগলো, হুলিয়া বার করেও ফল হয়নি কিছু।

শুধু কেষ্টর তিনমাসের গর্ভবতী স্ত্রীকেই ধরা গেছে। তাকে ধরে প্রথমে বাছাড়ের বাড়ী, তারপর প্রতাপনগরের কাছারী, তারপর পুলিশ ফাঁড়ী, তারপর থানা এবং শেষ পর্যন্ত মহকুমার পুলিশ হাজত পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হলো এবং অসহায় চাষী স্ত্রীলোকের ওপর যা-যা করার দরকার সবই করে তাকে হাজতে রেখে দেওয়া হলো। অজস্র লাঞ্ছনায় আর ভাঙ্গা দাঁতের যন্ত্রণায় কেষ্টর স্ত্রীর প্রবল জ্বর হলো। সে জ্বরের চিকিৎসার কোন বন্দোবস্ত হলো না এবং সেই অবস্থাতেই হাজতের ভেতর যখন তার গর্ভপাত হয়ে গেল তখনও তাকে হাসপাতালে না পাঠিয়ে কুৎসিত গালাগালি দেওয়া হতে লাগলো। ফলে জ্বরে কেষ্টর স্ত্রী অজ্ঞান হয়ে গেল, তখনও তাকে হাসপাতালে পাঠানো হলো না।

এদিকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা হাতে নিয়ে পুলিশ চাষী অঞ্চল চষে ফেলতে লাগলো। যখন-তখন যার-তার ঘরে উঠে তারা যা খুশী নিতে আর করতে লাগলো। পুলিশের গন্ধ পেলে ছেলেরা যেমন গা-ঢাকা দিতে লাগলো মেয়েদেরও তেমনি লুকিয়ে থাকা ছাড়া গত্যন্তর রইলো না। পুলিশ আর ভদ্রলোকেরা, যা-যা পাবে মনে করেছিল তার সবই পেলো, পেলে না শুধু আসামীদের সন্ধান। শেষ দিকে তারা এমন এক আতঙ্কের রাজত্ব গড়ে তুললো যে আসামীদের তো দূরের কথা মানুষের সন্ধানই দুর্লভ হয়ে উঠলো।

এমনি এক সন্ধ্যায় ফাঁড়ির হেড্ কনষ্টেবল আর বল্টুবাবু মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নির্বাক হয়ে রইলো এবং শিয়ালের ডাক শুনে দু'জনে ঘন হয়ে দাঁড়ালো।

খানিকক্ষণ এমনি অবস্থায় থেকে হেড্ কনষ্টেবল বললে—আর ক্যানো, চলেন যাই সাতভিটেয়।

হতাশ কণ্ঠে বল্টু বললে—ধ্যিত্তুমার, কি হবে সেখেনে যেয়ে, না আছে আসামীর পাত্তা, আর না আছে একটা মনের মতো মাল।

হেড্ কনষ্টেবল বল্টুর একেবারে গা ঘেঁসে দাঁড়ালো এবং অন্ধকার আকাশে উড়ন্ত বাদুড়ের দিকে তাকিয়ে বললে—ঠিক কয়েছেন, কিচ্ছু আর বাকি নেই, বিল অঞ্চল সব ফাঁক, সব ফেরার!

বল্টু হেড্ কনষ্টেবলের সঙ্গে অত্যন্ত একাত্মতা অনুভব করলো এবং তার কাঁধে হাত রাখলো। হেড্ কনষ্টেবলও বল্টুর কাঁধে হাত রাখলো। খানিকক্ষণ পরে তারা দু'জনে সাতভিটেয় না গিয়ে গেলো প্রতাপনগরের চক্কোত্তি মশাইয়ের বাড়ীতে এবং এই সর্বপ্রথম শেষরাত্রে তারা দু'জনে গলা ধরাধরি করে বেরিয়ে এলো চক্কোত্তি মশাইয়ের বিধবা মেয়ের ঘর থেকে। চক্কোত্তি মশাই বাধা দিতে পারলেন না শুধু নিগ্রহের ভয়ে নয়, প্রাণধারণের উপায় হাতছাড়া হবার ভয়েও।

অতঃপর বল্টু আর হেড্ কনষ্টেবল অচ্ছেদ্য বন্ধুত্বে আবদ্ধ হয়ে পড়লো। ভদ্রপাড়ার অনেক ঘর উপলক্ষ করে ঠিক এমনি ভাবেই অনেক ভদ্রসন্তানের সঙ্গে অনেক কনষ্টেবলের এমন অচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব গজিয়ে উঠলো যে সর্বংসহা বসুন্ধরা পর্যন্ত লজ্জায় ও বেদনায় কাতরে উঠলেন।

চোদ্দ

জমিদারের পক্ষে যতদূর চেষ্টা করা যায় রায়বাবুরা, বিশেষতঃ রায়বাহাদুর প্রসন্ননারায়ণ রায় তার কোন পথই বাদ দেননি। কিন্তু কোনই লাভ হলো না তা'তে। মেজ আর ছোট তরফের সরিকরা যেমন সে চেষ্টায় খুশী হননি বরং বিপরীত সমালোচনাই করেছেন, তেমনি দিন দুনিয়ার মালিক সিংহরূপী ইংরেজ সরকারও থাবা বাড়াতে

দেরী করেনি। যথাসময়েই সুবে বাংলার রাজস্ব বোর্ডের সদস্যের স্বাক্ষরযুক্ত সরকারী সিদ্ধান্তের নোটীশ পৌঁছে গেল রায়বাহাদুরের কাছে। নোটীশে কোন কৈফিয়ৎ চাওয়া হয়নি, কোন সময় দেওয়া হয়নি, শুধু স্পষ্ট করে লেখা হয়েছে যে, অন্যান্য সরিকদের আবেদনক্রমে প্রতাপনগরের রায় পরিবারের সকল জমিদারী কোর্ট অফ্ ওয়ার্ড্স-এর পরিচালনায় আনবার সিদ্ধান্ত খুশীর সঙ্গেই সরকার গ্রহণ করেছেন। এ-সম্পর্কে যদি কোন আপত্তি জানাবার থাকে তবে যেন অমুক তারিখের মধ্যে জানানো হয়। অন্যথায় সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহের কালেক্টরদের উপযুক্ত নোটীশ দিয়ে জমিদারী দখলের নির্দেশ দেওয়া হবে।

এই নোটীশ পেলে যা-যা হয় স্বাভাবিক ভাবেই তাই-তাই ঘটলো। অর্থাৎ রায়বাহাদুর আবহাওয়ার আলোচনা বন্ধ করলেন, মুসৌরীতে গিয়ে হিমালয় অভিযানের নতুন ব্যবস্থার পরিকল্পনা আর জোর গলায় প্রচার করতে পারলেননা, এমন কি জমিদার সমিতির আসন্ন নির্বাচনে দলাদলি পাকাবার অতি জরুরী কথা পর্যন্ত ভুলে গেলেন। কাছারী ঘরের দরজা না মাড়িয়ে সারাদিন নিজের ঘরে আটকা থেকে বহু শতাব্দীর বিখ্যাত রায়বংশের যোগ্যতম সন্তান প্রসন্ননারায়ণ পিঠের ওপর দুহাত বেঁধে পায়চারী করলেন। তাঁর চোখে অনেক যুগের রক্তাক্ত ইতিহাস, সেই ইতিহাসের বুক থেকে অনেক বংশের করুণ মহাপ্রয়াণ, এবং নিজের বংশের পূর্বপুরুষ প্রতাপ রায়ের রাজ্য স্থাপনের অভিযান ছায়াচিত্রের মতো উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠলো। রাজ্যহীন নবাব মীরকাশেমের শেষ জীবনের দুর্দশা তাঁর মনে করুণার উদ্রেক করলো এবং তিনি যে গ্রেটার বেঙ্গল ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়েছিলেন তাতে লাল বাতি জ্বলবার দু'দিন আগের ম্লান হবার চিত্র কল্পনায় ভেসে উঠলো। একবার তাঁর মনে হলো—পাঠান যুগ যদি আবার ফিরে আসতো, আবার

যদি খান জাহানআলি সুন্দরবন অভিযানে অগ্রসর হতে হতে তাঁদের বংশের পুরোনো রাজধানী দখল করে নিতেন তাহলে তিনিও আজ তাঁর সেই রাজ্যহারা পূর্বপুরুষ প্রতাপ রায়ের মতো মুক্তিশ্বরীর তীর ধরে-ধরে জঙ্গল ভেঙ্গে-ভেঙ্গে ক্রমাগত দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে যেতেন এবং আবার এক ত্রিমোহিনীতে হাজির হয়ে নতুন এক রাজ্য গড়ে তুলতেন। হয়তো জলাভূমির কোন সর্দারকে দিয়ে বন কাটিয়ে নতুন রাজধানীর পত্তন করতেন এবং শেষকালে কোন অমাবস্যার রাতে সেই সর্দারকে মা-কালীর কাছে বলি দিয়ে নিজেই রাজা হয়ে সিংহাসনে বসতেন আর রাজধানীর নতুন নাম অভিষেকের দিনে হাজারো প্রজার সমাবেশে ঘোষণা করে দিতেন। নতুন বশীভূত প্রজাদলের সগু পরাধীন ম্রিয়মান মুখগুলো তাঁর কল্পনায় ভেসে উঠলো। রায়বাহাদুর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন এবং খান জাহানআলির হাতে পরাজিত হয়ে তাঁর পূর্বপুরুষ প্রতাপ রায় যে-বেদনা অনুভব করেছিলেন শত শত বৎসর অতিক্রম করে সেই বেদনা তাঁর সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়লো। এবং সেই বেদনার্ত অনুভূতির অস্পষ্টতার ভেতর থেকে তিনি এই সত্যই অনুভব করলেন যে, পাঠান আমলে খান জাহানআলি যা করতে পারেননি ইংরেজ আমলে বাংলার রাজস্ব দপ্তর সেই কাজ অতি অবহেলাভরে সমাপ্ত করে ফেলেছে অর্থাৎ পাঠান সম্রাটদের অনুচর খান জাহানআলির হাতের অসমাপ্ত পরাজয় আজ বৃটীশসিংহের হাতে সমাপ্ত হলো, আর রায়বংশের পতনের ধারাটাও সম্পূর্ণ হয়ে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে রায়বাহাদুরের পিঠে-বাঁধা হাত দু'খানা শিথিল হয়ে ঝুলে পড়লো তাঁর দু'পাশে। সেই আজানুলম্বিত বাহু কয়েকবার প্রসারিত হলো শেষ অবলম্বন সংগ্রহের অদম্য কামনায় এবং কিছুই না পেয়ে আবার ঝুলে পড়লো হাঁটু পর্যন্ত। প্রতাপনগরের রায় বংশের যোগ্যতম শেষ বংশধর রায়বাহাদুর প্রসন্ননারায়ণ রায় মৃত্যু

যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে মেঝের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর সমগ্র দেহ মন, পেশী আর স্নায়ু মৃত্যুকালীন শিথিলতায় নিস্তেজ হয়ে এলো।

তবু প্রসন্ননারায়ণ শেষ চেষ্টা করলেন। কোর্ট অব ওয়ার্ডস্-এর পোষ্য হবার অপমানের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে তিনি মেজ আর ছোট তরফের সরিকদের কাছে গেলেন। কিন্তু সরিকরা তাঁর প্রস্তাবে রাজী হলেন না। ইদানীং জমিদারী থেকে মেজ আর ছোট তরফ বিশেষ কিছুই পাচ্ছিলেন না, তার ওপর ঘর থেকে কিস্তিতে কিস্তিতে রেভিনিউ গুণছিলেন। এ অবস্থার জন্যে তাঁরা রায়বাহাদুরকেই দায়ী করেছিলেন। তাঁদের ধারণা হয়েছিল যে, দুর্বৎসর-টৎসর সবই বাজে কথা, জমিদারী লোকসানে ফেলে হয় সরাসরি, না-হয় রেভিনিউ সেলে কিনে নেওয়ার উদ্দেশ্যে রায়বাহাদুরই কৌশল করে জমিদারীর এই লোকসানী অবস্থা সৃষ্টি করেছেন। কাজেই ঘরে এখনও যা-দুপয়সা আছে তা শেষ হবার আগে জমিদারী কোর্ট অব ওয়ার্ডস্-এ নেওয়ার জন্যে তাঁরাই অগ্রণী হয়ে তদ্বির তদারক করেছিলেন এবং দুর্ধর্ষ রায়বাহাদুরের জানবার আগেই সরকারী সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার ব্যবস্থাও করেছিলেন। কাজেই রায়বাহাদুর থাই পেলেন না সরিকদের কাছে।

রায়বাহাদুর এতেও দমলেন না। রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করলেন এবং তারপর দেখা করলেন গভর্ণরের সঙ্গে। গভর্ণর রাসভারী হলেও রায়বাহাদুরের কাছে একেবারে মাইডিয়ার, বিলেতে পরিচয়টা কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে, সেই স্মৃতিটা এখনও বন্ধুত্বের বাঁধন না বাঁধলেও হাল্কা আতিথ্যের সরু বোঁটায় কাজটা চালিয়ে দেয়। তিনি বললেন যে, অফিসের কথা সবই গোপনীয়। তবে উঠে আসার সময় তিনি ঘরের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এসে একজন লোকের নাম করলেন। রায় বাহাদুর পরে খোঁজ নিয়ে জানলেন

সেই লোকটী আর কেউ নয়, বৃটিশ মন্ত্রীসভা নিয়ন্ত্রণকারী ব্রাউনিং কোম্পানীর কলকাতার প্রতিষ্ঠানের নবাগত ম্যানেজিং ডিরেক্টর স্যার হালহেড। জেনেই হাল ছেড়ে দিলেন রায়বাহাদুর, কারণ তিনি আরও জানতেন লোকটী মেজ তরফের রায় সাহেবের, বিলেতে থাকার তো বটেই, এখানকারও বোতলের ইয়ার।

রায়বাহাদুর বুদ্ধিমান লোক, হাল ছাড়লেও স্রোতের উজানে পাল তুলতে দেরি করলেন না। ম্যানেজারকে হুকুম দিলেন, নায়েবরা যাতে প্রতিদিনের আদায়ের টাকা রোজই মনি অর্ডার করে কলকাতার সদর অফিসে ম্যানেজারের নামে পাঠিয়ে দেয় তার জন্যে কাছারীতে কাছারীতে হুকুমনামা পাঠাতে। অন্যথায় সঙ্গে সঙ্গে চাকুরী যাবার ভয় দেখাতেও বলে দিলেন। রায় বাহাদুর স্বয়ং-ই যে-কোনদিন যে-কোন কাছারীতে যেতে পারেন সে কথাও জানিয়ে দিতে বললেন। অতি মৃদু স্বরে দৃঢ় ও রূঢ় কথায় তিনি ম্যানেজারকে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের পত্রের কথা একান্তভাবে গোপন রাখবার নির্দেশ দিলেন এবং এ-ও জানিয়ে দিলেন যে, তিনি বেঁচে থাকতে ম্যানেজারের চাকুরী যাবে না।

এরপর গেলেন তিনি জমিদারী অঞ্চলের বিভিন্ন জেলার কালেক্টরদের সঙ্গে দেখা করতে।

অম্বুবাচীর সময় বৃষ্টি হয়ে সেই-যে থেমে গেছে, তারপর থেকে দেবতার আর মাটিতে নামার নাম নেই। পথ-ঘাটের কাদা শুকিয়ে উঠলো, খানা ডোবায় যত জল জমেছিল তাও পচে পচে শুকিয়ে উঠেছে। নানাবিধ মশা আর পোকার ডিমের ওঠা নামায় সেই কালচে পচা জল সব সময় নড়ছে ছোট ছোট অসংখ্য ঢেউয়ের বৃত্তে

রচনা করে। পথের কাদা শুকিয়ে প্রথমে ঘন ক্ষীরের মতো হ'লো, তারপর হ'লো গুড়ের দলার মত, তারপর হ'লো শক্ত আঠার মতো দলা দলা। দোআঁশ কাদা শুকিয়ে পায়ের চাপে-চাপে ধুলো হয়ে উঠলো।

মাঠের জলও শুকিয়ে উঠেছে এর ভেতর। যেসব জমিতে ব্যাঙ লাফাতো, পুঁটী আর ঝিঁয়া মাছেরা খেলে বেড়াতো, মাঝে মাঝে বকেরা সেখান থেকে উড়ে উড়ে চলে যায় নিচের বিলের দিকে। মাছরাঙ্গারা কিরি-রি-ই করতে করতে বিল পাড়ি দিয়ে মাঠের পাশে জিওলের ডালে বসে থাকে। আবার নীল হয়ে গেছে আকাশ। তারই তলা দিয়ে রোজ সকালে আবার নীলকণ্ঠ পাখীরা উড়ে যায় ডেকে ডেকে। আবার লক্ষ কোটী দুর্বাসার ক্রোধ আর অভিশাপ নিয়ে সূর্যের চোখ থেকে রোদের ঝাঁক ঝক্‌ঝকে তীরের ফলার মতো অবিশ্রান্ত ধারায় নেমে আসে।

জমিতে দু'চারটে যা বোনা-ধান হয়েছিল জলে টান লেগে সেগুলোর মাথা শুকিয়ে উঠেছে, গোড়ার দিকে পাতার ডগাটুকুই যা সবুজ আছে। এতদিন জলের তলায় ঘাস পচেছে, প্রথম বর্ষায় যে-সব ডাঙ্গার উদ্ভিদ তাড়াতাড়ি মাথা খাড়া করে উঠেছিল সেগুলোও পচেছে, শুকন্ত মাঠের তলা থেকে তাদের ধ্বংসাবশেষ বেরিয়ে বেরিয়ে অদ্ভুত গন্ধ ছড়াচ্ছে। রোদের তাত্‌ লেগে লেগে মাঠের উদ্ভিদ পুড়ে পুড়ে মরে যাচ্ছে, মরে মরে পচে পচে এমন এক সর্বব্যাপক রূপ নিচ্ছে যে মনে হয় যেন এক দিগন্তজোড়া মৃত্যুর গালিচা পাতা হচ্ছে সারা দিন ধরে।

নবীনের বারান্দায় বেদে পাটীতে শুয়ে সেই মৃত্যুর গালিচার দিকে অপলকে তাকিয়ে আছে মেজগিন্নি আর মাদারী।

মেজগিন্নি রোগা হয়ে গেছে অনেক। তার ফরসা রং মলিন হয়েছে, চুলে জটা পড়েছে, চোয়ালের হাড় উঁচু হয়ে বয়স বাড়িয়ে

দিয়েছে যেন। রাধিকার মতো যেন এক সুদীর্ঘ প্রতিক্ষায় তার সর্ব অঙ্গ ঘিরে নতুন অবসাদ নেমেছে, মনের ওপর ধীরে ধীরে যেন এক কালো যবনিকা নেমে আসছে। সকাল থেকে বিকেলে আর বিকেলের ছায়া থেকে রাত্রির অন্ধকারে প্রসারিত হতে হতে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে সেই যবনিকা তার মনের সর্বাঙ্গে, হৃদয়ের অবহেলিত কোণগুলোয় যেখানে ছোট ছোট কামনারা ধূলোর মতো হয়ে জমে আছে। মাঠের দিকে তাকিয়ে তাই ভাল লাগে মেজগিন্নির, তার মুমূর্ষু মনের সঙ্গে যেন মিল আছে এই মৃত্যুর ছায়ায় ঢাকা দিগন্তে প্রসারিত উদ্ভিদ জীবনের প্রাণক্ষেত্রের। ওর মতোই যেন মাঠখানা গুমরে যাচ্ছে যুগ-যুগান্তের আশা নিয়ে, শস্য ধারণের অপূর্ণ কামনা নিয়ে, শক্তিশালী এক জোয়ান চাষীর প্রতীক্ষায় থেকে-থেকে। ওর মন থেকে আর দেহ থেকে, ওই মাঠের শুকিয়ে-আসা মাটি থেকে আর পুড়ে-যাওয়া ধানের গোছা থেকে নিরন্তর যেন কত যুগের করুণ আবাহন নিঃশব্দে বেরিয়ে বেরিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে, ছড়িয়ে যাচ্ছে, মূর্ছায় ভেঙ্গে পড়ছে।

—হেই মেজ বউ।

ফিস্-ফিস্ করে ডাক দেয় মাদারী। অকস্মাৎ মেজগিন্নির দু'টি চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, সমগ্র অন্তরের প্রতীক্ষা দুটি চোখে নিবদ্ধ করে মাঠের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে চেয়ে থাকে। নাঃ, কিছুই তো নয়। চোখের তারায় আবার তার হতাশা নেমে আসে। সেই নিষ্প্রভ চোখে সে মাদারীর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়।

মাদারীর সর্ব অঙ্গে কে-যেন বিদ্যুতের শিহরণ জাগিয়েছে। আনন্দে আর খুশীতে এখনি যেন ভেঙ্গে পড়বে সে। মৃদু-মৃদু কাঁপছে তার ঠোঁট দুখানি, চোখের তারায় আলো জ্বলছে যেন সন্ধ্যার আকাশে সাঁঝ তারা জ্বলবার মতো, দপ্-দপ্ করে তার তলা দিয়ে আনন্দের অশ্রুর বাঁকা রেখা অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এমন অনুভূতির এই অভিপ্রকাশের সঙ্গে পরিচয় নেই মেজগিন্নির। সে বুঝতে পারে না অকস্মাৎ সেই ধীর-স্থির নিশ্চিত মাদারীর মধ্যে কি ঘটলো। তবু তার মনে শিহরণ জাগে মাদারীর এই দুর্বোধ্য অনুভূতির ছোঁয়া লেগে, অকস্মাৎ যেন তার উঠে বসতে ইচ্ছে হয়, গায়ের কাপড় সামলে মাথায় ঘোমটা টানবার জন্যে হাতে চাঞ্চল্য অনুভব করে।

মাদারী কোন জবাব দিতে পারে না মেজগিন্নির জিজ্ঞাসু দৃষ্টির। মনের ভাব দমন করার জন্যে সে ঠোঁট চাপতে থাকে। ঠোঁট চাপতে গিয়ে তার চোখ বুঁজে আসে আর সঙ্গে সঙ্গে চোখের কোণে দু'ফোঁটা জল টল্-টল্ করে দাঁড়িয়ে থাকে। সেই অবস্থায়ই সে ঠাট্টা করে, কেউ শুনতে না-পায় এমনি করে বলে—কানা গরুর ভেন্ন পথ। মাঠে তোর কিডা আছে? উই দ্যাখ্ বিলির মধ্যি তেশীষে কূয়োর পাড়ে। দু'টি চোখ যতদূর সম্ভব প্রসারিত করে সে তেশীষে কূয়োর পাড়ে দেখিয়ে দেয়। সে আঙ্গুল দিয়ে দেখায় না, বা কিছু দেখাচ্ছে এমন কোন ভঙ্গীও বাইরের লোকের চোখে পড়বার মতো করে প্রকাশ করে না।

মেজগিন্নি অতি সতর্ক আর তীক্ষ্ম চোখে নির্বাকে চেয়ে থাকে জোড়া কূয়োর পাড়ের দিকে। সহজে কিছু বোঝা যায় না। ভাল করে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় কূয়োর পাড়ের নতুন কাঠ-শোলার ঘন বন আস্তে আস্তে আন্দোলিত হচ্ছে, চারা পিঠে-গড়ার উঁচু ডাল নড়ছে ধীরে ধীরে, মাঝে মাঝে পাখী উড়ে পালাচ্ছে বসতে গিয়েই।

মাদারী উঠে বসে। চুলের আগায় গেরো বেঁধে মাথার ওপর চূড়ার মতো করে তুলে দিতে দিতে বলে—বেলা তো পড়ে আ'লো। বলতে বলতে হাই তোলে, হাই তুলে তুড়ি দেয়। গায়ের কাপড় ঠিক করতে করতে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে—উঠিরে মেজগিন্নি। আমার

তো মরণ সার, বাবু ভগ্নিপতির বাড়ী গ্যালেন তো গ্যালেনই। অ্যাখোন আবার ঘাস কাটতি যাতি হবে ওই বিলির মদ্দি, কেউটের কামড়ে যদি মরিতো বুলিস তোর হ্যাওররে, যেন্ ছিরাধা সপ্‌ পাবাতে পরাণ দেছে। বলে মিটিমিটি হাসে আর মেজগিন্নির দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায়।

মেজগিন্নি সবই বোঝে। ছ'হাতের ওপর ভর দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে বসে। হাত ছু'খানা মাথার ওপর তুলে আড়ামোড়া খায়, আলস্য ভাঙ্গে, সশব্দে হাই তোলে, তুড়ি দেয়। তারপর চুল বাঁধতে বাঁধতে জোরে জোরে বলে—আমিউ উঠি দিদি। বাড়ীর মানুষ যেন্ কনে গেল জোন খাট্‌তি, তা যদি এট্টু কাগের মুখিউ বাত্তা পাঠায়! এই গরু বাছুর নিয়ে কি করি কওদিন। অ্যাখোন এই ভর ছুপোরে গরু সরাও আর সেই মাঠ জঙ্গল ভাঙ্গে বেড়াও। সন্নোসী হয়ে যাবো কুনদিন। বলে মুখখানি ছুঃখে মলিন করে বেঁকিয়ে ফেলে আর মাদারীর দিকে তাকায় অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে।

মাদারী ততক্ষণে উঠে পড়েছে।

একটু পরে মেজগিন্নি ফিরে আসে, কাঁখে একখানা ঝুড়ি, তার ভেতর গামছাখানা দলা করে ফেলে রাখা।

মাদারী একখানা কাস্তে আর একটা ডালা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে পথে। সে যেন কিছুই জানে না এমনিভাবে জিজ্ঞাসা করে মেজগিন্নিকে—গরু সরাবা না? ঝুড়িতি কি?

—সরাবো না তো এই পুড়া বরাতে আর কি করবো কও। ঝুড়িখান নিয়ে যাচ্ছি ছুডো গাধাপুন্নিমে শাগ তোলবো বুলে। তার আবার লবণ নেই এক ছিটে, তাই গামছাখান নিয়ে যাচ্ছি।

—আমি চলি, এ বিলি তো আর ঘাস নেই, সেই গেন্—মাদারী বলতে থাকে আর পা বাড়ায়।

মেজগিন্নি প্রার্থনার সুরে বলে—সেই পয়সাডুড়ো ছাওদিনি আজ, সুন কেনবো।

—কোন্ পয়সা? ফিরে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে মাদারী জিজ্ঞাসা করে।

—ক্যানো, সেই-যেন্ সিবার ছিরাবোন মাসে লেবু নিইলে, সেই-যেন্।

মাদারী গাছ থেকে পড়ে। এতবড় হাঁ করে তাকিয়ে থাকে মেজগিন্নির দিকে।

মেজগিন্নি খেংরে ওঠে—অমোন করে তাকাও ক্যান্ আজ? সুমায় মতো পয়সা দিবা না, আর যেই চাবো সেই-গেন্ হা করে গিলতি আসপা—

মাদারী যেন সামলে নিয়েছে, তেমনি করে ভীষণভাবে চেঁচিয়ে ওঠে—কোন্ ভাতার পুতখাগি তোর নেবু নেছেরে, হেই মিথ্যোপাদী···

মেজগিন্নিও ছাড়বার পাত্র নয়, মাদারীর চেয়েও জোরে জোরে চেঁচিয়ে বলে—তুমার মতো ভাতার পুতখাগি ছাড়া আর কিডা নেবে কও?

—কি! কি বুল্লি? তুই আমারে ভাতার পুতখাগি——

ওরা দু'জনে ঝগড়া করে, ভীষণ ঝগড়া, যা না-বলার তাই বলে পাড়া-মাতানো ঝগড়া। পাড়ার মেয়ে পুরুষ জড়ো হয়। তারা ঝগড়ার কারণ জানতে চায়, কারণ শুনে মিটিয়ে ফেলবার নানাবিধ উপায় নির্দেশ করে। কিন্তু কিছুতেই মিটতে চায় না সে ঝগড়া। এদিকে বেলা পড়ে আসে। দুজনে দুজনকে শাসিয়ে দুদিকে চলে যায় পরস্পরের দিকে পেছন ফিরে, যেন এ জন্মের দেখা-শোনা সব শেষ হয়ে গেল। পাড়ার লোকেরা নানাবিধ মন্তব্য করতে করতে ঘরে ফেরে। শুধু হরিবোলের বউ মনে মনে হাসে আর চুপ করে দাঁড়িয়ে ওদের রাগে-দ্রুতগামী দেহ দুটির দিকে তাকিয়ে থাকে। নিখুঁত ছলনা দেখে সে খুশীও হয়।

এমনি করে আজকাল প্রায়ই ঝগড়া হচ্ছে মেজগিন্নি আর মাদারীতে। পাড়ার লোকের দুঃখ হয় সেজন্যে, মণ্ডলবংশের শেষদিন ঘনিয়ে

আসছে ভেবে তাদের হালকা দুঃখ গভীর হয়। তবু পাড়ার কেউ কেউ জানে এ-ঝগড়া কেমন ঝগড়া, যেমন জানে হরিবোলের বউ তেমনি করেই, কিন্তু মুখ ফুটে কেউ কিছু বলে না।

মাঠের ভেতর সোজাসুজি না গিয়ে মাদারী খালের মুখ দিয়ে বিলে নামতে যায়। খাল-মুখে ঘাস আছে, সেই ঘাস কাটতে কাটতে এগোনো যাবে, কেউ কিছু সন্দেহই করতে পারবে না।

গ্রামের পথটা যেখানে মোড় ফিরেছে চণ্ডীর বেড়ার পাশ দিয়ে খালের দিকে, সেখানে পা দিতেই মাদারীর গাটা কেমন ছম্ ছম্ ওঠে পেছনে তাকিয়ে দেখলো কেউ কিনা। ডাইনে বাঁয়ে ঝোপের ভেতর উঁকি মারলো। সামনে খানিক দূরে পড়ন্ত বেলার দীঘল ছায়া পড়েছে ডালভাঙ্গা হিজল গাছটার। সেই ছায়ার শেষপ্রান্তে একটা মানুষের মাথার ছায়া। শিউরে ওঠে মাদারী, এমন ভয় পায় যে, পা-দু'খানা তার নিশ্চল হয়ে যায়। নিথর পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকে মাদারী কাঁধে ডালা আর হাতে কাস্তে নিয়ে। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে একসময় তার গতিশক্তি ফিরে আসে। আস্তে আস্তে সে ওপরের দিকে তাকায়। হিজল গাছের মগডালে পরগাছার ঝোপ। তারই ঠিক ওপরে একটা দোডালা। সেখানে একটা লোক বসে। পরগাছার ঝোপ থাকায় তলা থেকে সহজে দেখাও যায় না, বোঝাও যায় না। লোকটা অপলকে চেয়ে আছে বিলের দিকে, মুখের সামনে একটা ছোট হিজলের ডাল বিলের দিকে কুমড়ে ধরেছে যাতে বিলের দিক থেকে তাকে দেখতে পাওয়া না যায়।

মাদারীর স্নায়ুগুলো নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে যেন, গাছের মাথার লোকটা যেন একটা পাতরাজ সাপ, শীকার ধরবার জন্যে ওত পেতে আছে।

খালের মুখে আস্তে আস্তে ঘাস কাটে মাদারী, নতুন গজানো চেঁচো আর আরালি কেটে কেটে ডালায় রাখে। কাটতে কাটতে খাল-রেখা ধরে এগিয়ে যায় বিলের নিচে।

তেশীষে খালের অনেকটা আগে থাকতে অবস্থা বোঝবার জন্যে মাদারী উঁচু জায়গার সন্ধান করতে থাকে। একটু দূরেই ভীমের কূয়ো, পাড়টা বেশ উঁচু আর খাল-রেখারও অনেক কাছে। ঘাসও হয়েছে সেখানে অনেক। মাদারী ঘাসের ডালাটা বাঁ-কাঁধে আর ডান হাতে কাস্তেখানা নিয়ে আস্তে আস্তে গিয়ে সেই কূয়োর পাড়ে উঠে দাঁড়ায়, এবং দাঁড়িয়েই সে ভয়ে ও বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে যায়।

বাছাড় আর অচেনা একটা লোক তেশীষে কুয়োর দিকে মুখ করে ভীমের কূয়োর জলে ছিপ ফেলে বসে আছে। বছরের এই সময়ে কেউ-যে কূয়োয় মাছ ধরেনা, মাদারী সে কথা ভাল করেই জানে। লোক দু'টোর নজরও ফাতনার দিকে নয়। তেশীষে কূয়োর দিকে তাকিয়ে তারা এত তন্ময় হয়ে গেছে যে মাদারীর উপস্থিতিও টের পায়নি।

মাদারী আর বিলম্ব করলো না। মাঠের ধারের হিজল গাছটার দিকে একবার তাকিয়ে সে আস্তে আস্তে নেমে পড়লো বিলে। হিজল গাছের মগডালটা আগের মতোই নিচু হয়ে আছে, বাতাস লেগে দুলছে ফলভরা ডালের মতো। না, তেশীষে কূয়োয় আর যাওয়া হলো না তার। কুকুরে শীকারের গন্ধ পেয়েছে।

খালের পাড়ে উঠে মাদারী ঘাসের ডালা মাটীতে নামায়, কাস্তেখানা গুঁজে দেয় ঘাসের ভেতর। তারপর তেশীষে কূয়ো আর বাড়ীর মাঝ কোণে মুখ ফিরিয়ে মুখে হাত লাগিয়ে চিৎকার করে ডাকে—ওরে দোনারে-এ-এ-এ, ও-ও-ও দোনা-আ-আ..., ওরে তোর মামা—আ-আ-আয়েছে, তোর মা-আ-আ-মা-আ-আ..., তোর মা-আ-আ-মা-আ-আ আয়েছে-এ-এ।

গাঁয়ের ভেতর থেকেও কে যেন একজন চেঁচিয়ে উঠলো—ও-ও দো-ও-না—আ-আ,...তোরগে-এ-এ মা-আ—আ-মা-আ-আ...

মাদারী একটু অপেক্ষা করে, চারিদিক ভাল করে তাকিয়ে দেখে, আর ঘাসের ঝুড়ি কাঁকালে আর কাস্তে হাতে নিয়ে গাঁয়ের দিকে এগিয়ে যায়। মোড়ের মাথার সেই হিজল তলায় গিয়ে আপনিই তার গতি থেমে যায়, আপনিই চোখ হু'টো উঁচু হয়ে সেই মগডালটায় অনুসন্ধান করে। কিন্তু, না, এখন আর সে লোকটা নেই। অন্য ডালগুলো সে ভাল করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। সেখানেও কেউ নেই। মাটীর দিকে তাকিয়ে দেখে একটা পোড়া বিড়ি আর খান ছুই পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি পড়ে আছে। বিড়ি খাওয়ার গন্ধ তখনও গাছতলায় ভুর্-ভুর্ করছে।

মাদারী বুঝতে পারলো লোকটা সবেমাত্র নেমেছে গাছ থেকে এবং গাছতলায় দাঁড়িয়ে বিড়িও খেয়েছে। তার জন্যে যে সময় নষ্ট হয়েছে সেখানি সে কেন ব্যয় করেছে অমন প্রকাশ্য যায়গায় দাঁড়িয়ে? এই শত্রু-গাঁয়ের ভেতরও তার ভয় করেনি? লোকটা তাহলে নিশ্চয়ই তাদেরই গাঁয়ের, নইলে সাহস করতোনা বিড়ি খেয়ে আরাম করবার। গাঁয়ে তামাকের বদলে বিড়ি খায় কে? বাছাড়ের ছেলে? না, না। ও, ঠিক হয়েছে—বাছাড়ের বাড়ীতে আজকাল যে নতুন লোকটা থাকে সেই-ই বিড়ি খায়।

হিজল তলাটা মাদারী ভাল করে পরীক্ষা করে। কোথায়ও কিছু নেই। তবুও তার গা ছম্-ছম্ করে। হিজল তলার যে পাশটা বিলের দিকে সেদিকে ছোট একটা আস্তাওড়ার জঙ্গল, বন মরচের লতায় ঝোপ বানিয়েছে সেখানে। পড়ন্ত বেলায় ঝোপটার ভেতর ভাল করে দেখা যায় না। শুধু হু'টি জলজ্বলে চোখ মাদারীর চোখে তাকিয়ে আছে।

মাদারীর অঙ্গ হিম হয়ে আসে। অনেকক্ষণ ধরে সে জলন্ত সেই দুটি চোখ থেকে নিজের চোখ ফেরাতে পারে না। যায়গাটায় আবার চন্দ্রবোড়া সাপের ভয় আছে। বোধ হয় সেই চন্দ্রবোড়াই হবে, নইলে সে চোখ ফেরাতে পারছে না কেন।

সন্ধ্যার ঠিক মুখেই বাছাড় মাদারীদের উঠোনে গিয়ে দাঁড়ায়। গলায় প্রাণঢালা সহানুভূতি ফুটিয়ে জিজ্ঞাসা করে—ও দোনা, তোর বোলে মামা আইলো, গ্যালো কনে ?

দোনারা কেউ ঘরে ছিল না। মাদারীই বলে বাছাড় যাতে শুনতে পায় তেমনি করে—ও দোনা, বোল যে আইলো, সে হাটে গেছে, রাতির বেলা আবার আসপেনে।

বাছাড় দয়া দেখিয়ে বলে—নব্নে তো বাড়ী নেই, কুটুম মানুষ আয়েচে, যদি কিছু লাগে তো—

মাদারী বলে,ও দোনা, বোল-যেন্ দরকার হলি যায়ে নিয়ে আসপানে।

বাছাড় সেখান থেকে যায় মেজগিন্নিদের বাড়ীতে। সেখানে দেখে তারই ছেলে সহদেব বারান্দায় বসে আছে। মেজগিন্নি বাছাড়কে দেখেই মাথায় ঘোমটা টেনে ফস্ করে ঘরে ঢুকে গেল। বাছাড় আরো দেখলে সহদেব পান খাচ্ছে। বাছাড়ের রাগ হলো ছেলের নতুন উন্নতি দেখে। কিন্তু সেটা চেপে সে বললে—আমার ভগীরথ ভাইডি কি পাঠায়েছে কিছু হাটুরেগের দিয়ে ? বৌমারে জিজ্ঞাসা কর্‌দিন্ সহদিবে। জোন খাটতিতো যায় সগোলে, অ্যামোন নিখোঁজ তো হয় না কেউ।

সহদেব জিজ্ঞাসা করবার আগেই মেজগিন্নি ঘর থেকে বলে—ও ঠাউরপো, বলো-যেন্ কিচ্চুই পাটায়নি। সেই-যেন্ গ্যালো আর খোঁজও দেলে না অ্যাটা। তুমরা যা আথাগুনো কর্‌তিচো, না হলি কি-যেন হতো। আর বলো-যেন্ শতুরির জ্বালায় কি ভাশ ছাড়বো ?

সহদেব তার বাবাকে বললো যে, মেজগিন্নির মতো নিপাট ভাল মানুষ পেয়ে মাদারী জ্ঞাতিশত্রুর কাজ সাধছে। এমন করে পেছনে লাগলে মেজগিন্নি হয়ত চলেই যাবে।

বাছাড়ের আবার রাগ হলো ছেলের ডেঁপোমী দেখে। মেজগিন্নির সঙ্গে একটা লট্‌ঘট্‌ বাধিয়ে ফেলেছে বোধ হয়। তবে এই চিন্তায় আর মাদারীর সঙ্গে শত্রুতার সংবাদে সে খুশী হয়, মনে মনে ভাবে শত্রুতার সুযোগ নিয়ে মেজগিন্নিকে কাজে লাগানো যাবে। নানাবিধ উপদেশ ও সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে সে সহদেবকে তাড়াতাড়ি বাড়ী যেতে বলে ঘরে ফিরলো।

পথে যেতে যেতে বাছাড় শুনতে পেলো মণ্ডলপাড়ায় শাঁখ বাজছে তিন চার বাড়ী থেকে। অনেকদিন পরে শাঁখের শব্দ শুনে বাছাড় একটু বিস্মিতও হয়।

সন্ধ্যার পরই মাদারী ঘরের পেছনে নারকেলের পাতার কাড়ু জ্বালায়। হু-হু করে কাড়ুর আগুনের শিখা অনেক উঁচুতে ওঠে। সেই শিখার দিকে তাকিয়ে মাদারী ভাবে তেশীষে কূয়ো থেকে নিশ্চয়ই দেখা যাবে বিপদের নিশ্চিত এই সঙ্কেত।

ঘাসের ডালার তলা থেকে কলাপাতায় মোড়া চালের গুঁড়োর রুটি, গুড় আর নারকেল কোরা বার করে রাত্রিবেলা ছেলেমেয়েদের ভাতের পাতে ভাগ করে দেয় মাদারী। খেতে খেতে দোনা জিজ্ঞাসা করে—কখোন বানালে এগুলোন, ও মা ?

মাদারী রুটি তৈরীর সাজানো গল্প শোনায়। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে তার কল্পনায় তেশীষে কূয়োর পাড়ে জঙ্গলের ভেতর পালিয়ে থাকা নবীনের ক্ষুধায় পীড়িত চেহারাটা ভেসে উঠলো। নবীনের সাথী নব, ভগীরথ, ভীম আর হরিবোলের কথাও তার মনে পড়লো, মনের পর্দায় ভেসে রইলো তাদের ক্লান্ত ক্ষুধাতুর চেহারাগুলো।

মাদারীর চোখের জলের বাঁধ অনেকদিন পরে আজ ভেঙে যায়। ছেলেমেয়েরা সেই দিকে তাকিয়ে খাওয়া থামিয়ে নির্বাকে বসে থাকে। ল্যাম্পোর কম্পিত আলোয় তাদের ছায়াগুলো নড়তে থাকে বেড়ার গায়ে।

পনেরো

রায় বাহাদুর প্রসন্ননারায়ণ রায় দেশে এসেছেন একটা ছোটখাট বাহিনী নিয়ে। বলতে গেলে কলকাতার বাড়ী ঝেঁটিয়েই যেন নিয়ে এসেছেন দেশের বাড়ীতে, বুড়ো কাকীমাকে পর্যন্ত আনতে ভোলেন নি।

কাকীমা বুড়ো মানুষ, যৌবনকালে দেশে থেকেছেন প্রায়ই, এসেই পুরোনো পরিচয়ের সুযোগ-সুবিধে নেবার কোন কসুরও করছেন না। অন্দর থেকে সদর পর্যন্ত কোন স্থানই তাঁর আর এখন অগম্য নয়, ভোর থেকে অনেক রাত্রি পর্যন্ত সারা বাড়ীতে তাঁর অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। থপ্-থপ্ করে কোলা ব্যাঙের মতো চলবার তাঁর বিরাম নেই, চাকর বাকরদের আদেশ নির্দেশ দেবারও তাঁর কার্পণ্য নেই, বাতের ব্যথা, ব্রংকাইটিসের হাঁপানী, সবই যেন তাঁর নিরাময় হয়ে গেছে, পুরোনো বাড়ীর ইঁটকাঠ থেকে তাঁর বার্ধক্যের অঙ্গে অঙ্গে যেন শক্তি সঞ্চারিত হয়েছে নতুন করে। রায় বাহাদুর দেখেন আর হাসেন। বলেন, দিদিমা আর দাদামশাই বুঝি স্বপ্নে তোমাকে অমৃত খাইয়ে গেছেন, খুড়ীমা?

বুড়ী অকস্মাৎ জমিদারনী হয়ে যান। রাশভারী মুখ করে গলার স্বর গম্ভীর করে বলেন—পেসোন, গুরুজনদের কথা অমন করে যে বলতে নেই সে কথা তোকে আর কতদিন শেখাবো। বলতে বলতে বুড়ীর বাঁধানো দাঁত বেসামাল হয়ে যায়, জিভ আর ঠোঁটের সাহায্যে

সেটা ঠিক করতে করতে ভেতর বাড়ীর দিকে চলে যান তিনি। তাঁর প্রকাণ্ড দেহ চালিয়ে যাবার থপ্-থপানিতে সারা ঘর কাঁপতে থাকে।

রায় বাহাদুরের ভাল লাগে এই অনুযোগ, নিঃসন্তান বুড়ী ক[illegible]র সস্নেহ এই রাগের কথা। তবু বুড়ী চলে গেলে তাঁর মনে থপ্-থপানি লেগে থাকে, পাঠান আমলের জমিদার বাড়ীর বার্ধক্য তাঁর দেহ-মনেও সঞ্চারিত হয়। মুমূর্ষু জমিদার বংশ আর যুগ যুগান্তের প্রাসাদপুরী তাদের সমগ্র পুরাতন ঐতিহ্য যেন এই বুড়ীর মধ্যে রেখে যেতে চায়, বেতো-কেশো বুড়ীও তাই যেন নতুন জীবন পেয়েছে, সমগ্র রায় বংশের বার্ধক্য যেন শেষ মুহূর্তে বেঁচে থাকতে চাইছে বুড়ীকে অবলম্বন করে। সারা দেহ-মনে বুড়ীর প্রভাব অনুভব করেন রায় বাহাদুর। সর্বাঙ্গ তাঁর শির্-শির্ করে ওঠে, শীতকালের পাষাণদুর্গের পুরু পুরু কালো ঠাণ্ডা পাথর যেন স্থবির হাতে তাঁকে আদর করছে।

রায় বাহাদুর ইচ্ছে করে দেশে আসেন নি, আসতে বাধ্য হয়েছেন। বিভিন্ন জেলার কালেক্টরদের সঙ্গে দেখা শেষ করে তিনি গিয়েছিলেন কৃষ্ণনগরের সদর কাছারীতে। জেলার ম্যানেজার সেখানে তাঁকে এক খানা চিঠি দেখালো। চিঠিখানা রায় বাহাদুরের সরিকরা যৌথভাবে লিখেছেন আদেশনামা হিসেবে। তাতে স্পষ্ট করে বলা আছে—রায় বাহাদুরের নামে যেন একপয়সা খরচ করা না হয় এবং আদায়ের কাণাকড়িও যেন তাঁকে না দেওয়া হয়।

এই চিঠি দেখবার পর কর্মচারীদের ওপর জবরদস্তি করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাছাড়া তাঁর অহঙ্কারের গোড়ায়ও আঘাত লেগেছিল মারাত্মক ভাবে। এতকাল ধরে এইসব কর্মচারী তাঁরই হুকুমে কাজ করে এসেছে, তিনিই ছিলেন জমিদারীর শক্তিশালী ধারক স্তম্ভ। তাঁর কথা আজ আর কর্মচারীরা শুনতে চাইবে না. বা অবমাননা করবার জন্যে অন্তরে অন্তরে উদ্বুদ্ধ হবে এবং তাঁকে জমিদারীর পক্ষে প্র[illegible]জনায়

বলে মনে না করে, মনে করবে একটা সরিক—এই ভাবনায় যেমন তিনি লজ্জা ও ক্ষোভে মুসড়ে গেলেন, তেমনি নিজেকে আর জমিদার বলে ভাবতেও তাঁর নিজের ওপর করুণা হলো। এর পরে জোর করে অধিকার ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গেলে যে ছ্যাঁচড়ামীর কাদায় ডুবতে হবে সেকথা ভাবতেও রায় বাহাদুরের প্রতাপশালী জমিদারী সত্বা লজ্জায় ও ঘৃণায় সঙ্কুচিত হয়ে উঠলো।

কলকাতায় ফিরে যখন তিনি জানতে পারলেন যে, তাঁদের ঘরের অনেক কথাই শুধু জমিদার মহলে নয়, কর্মচারী মহলে, ভৃত্য মহলে, এমন কি কলকাতার ভদ্রলোক মহলেও সুমধুর পরচর্চার রস যুগিয়েছে এবং যখন দেখলেন যে সরকারী তরফ তাঁর কৌশল ধরে ফেলে আরও কঠোর মনোভব অবলম্বন করেছে, যখন দেখলেন জমিদারী নিংড়ে আর এক ফোঁটাও রস পাওয়া যাবে না, তখন এবং শুধু তখনই, জমিদার সমিতির সহ-সভাপতির পদে ইস্তফা দিলেন রায় বাহাদুর এবং গড়ের মাঠে আর অভিজাত ক্লাবে যাওয়া বন্ধ করলেন। গীতা পড়লেন, মার্কণ্ডেয় পুরাণে সুরথ রাজার রাজ্যহীন হবার কাহিনী পড়লেন, সেক্সপীয়রের সব কটা রাজা হেনরী পড়লেন এবং অবশেষে বুড়ী খুড়ীমার হাতে আত্মসমর্পন করে তাঁরই প্রাগৈতিহাসিক কামনা বাসনার মরা স্রোতে গা ঢেলে দিলেন। দেবতা ও অপদেবতার ওপর বুড়ীর যে অগাধ শ্রদ্ধা এতকাল মনের গুহায় পাষাণ-চাপা ছিল, হঠাৎ তা নানাবিধ হোম-যজ্ঞ থেকে সুরু করে শনি পূজোতেও ফুটে বেরিয়ে জমিদার বাড়ী ভারাক্রান্ত করে তুললো। স্বয়ং রায় বাহাদুর থেকে সুরু করে বাড়ীর ছেলেমেয়ে বউ ঝি চাকর-বাকর কুকুর-বিড়াল পর্যন্ত সবারই গলায় হাতে কোমরে বহু উপকারী সর্বদোষঘ্ন তাবিজ কবচ ঝুলতে লাগলো।

ঠিক এমনি অবস্থায় মাঝখানে বর্ষণ-ঘন এক ধোঁয়াটে সকালে রায় বাহাদুর নিজেকে দেখলেন এবং দেখলেন বহু যুগের পরিত্যক্ত পূর্বপুরুষের

দুর্গসদৃশ গ্রামের বাড়ীতে, দেখলেন সে বাড়ীর চারিপাশে পুরোনো আমলের গড়খাই বুঁজে এসেছে, কচুরী পানার আস্তরণ ভেদ করে তার জল দেখা যায় না, সন্ধ্যাবেলা তার ওপর লক্ষ লক্ষ উড়ন্ত মশার শত শত স্তম্ভ আকাশে ওঠে, পাড়ে তার গহীন জঙ্গল।

রায় বাহাদুরের কাকীমা বুড়ী জমিদারনীও শেষ পর্যন্ত গাঁয়ে ফিরেই বুঝতে পারলেন যে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। দিনের ভরা আলোয় খাদ্য সন্ধানী পাখীরা যেমন গোধূলীর আলোয় ঝাঁক বেঁধে-বেঁধে মুখে খাবার আর বাসা বাঁধবার খড়কুটো নিয়ে ঘরে ফেরে, রায় বংশের জমিদারীর আলোয় যারা খুঁটে খাচ্ছিল, তারা যখন ঘর গুছাবার একান্ত ইচ্ছায় ঠিক তেমনি করে দলে দলে ভাঙ্গা চেয়ারের হাতল থেকে সুরু করে আঁস্তাকুড়ের ভাঙ্গা ইঁটগুলো পর্যন্ত চোখের ওপর দিয়েই নিয়ে যেতে লাগলো, তখন বহু-দর্শী জমিদার গৃহিনীর জরাজীর্ণ বুদ্ধিও শেষ আলোর মতো দপ্ করে জ্বলে উঠলো। এরপর যখন দু'একজন বাল্যসখী বার্ধক্যে-ঝুলে-পড়া ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে মাড়ী বার করে জমিদারীর শেষ দশা সম্পর্কে শোক প্রকাশ করতে লাগলেন এবং তাদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের খুশী যখন ঝোলা চামড়ায়-ঢাকা চোখের তারায় জ্বল্-জ্বল করে উঠলো তখনই বুড়ী-জমিদারনী রায় বাহাদুরকে বললেন—পেসোন্, তোকে আর কতদিন বলবো ?

রায় বাহাদুর প্রায় তুরীয় মার্গেই পৌঁছেছিলেন। গায়ের চামড়া তাঁর এই ক'দিনেই খানিকটা গণ্ডারত্ব অর্জন করেছে। বুড়ীর কথার ঝঙ্কারে উত্তাপটার প্রকৃতি তিনি সহজেই ধরে ফেলেছিলেন। কিছু করবার নেই বলেই চুপ করে রইলেন। বুড়ী মনের সাধেই ঝাল ঝাড়লেন রায় বাহাদুরের ওপর এবং নিরপরাধ মেষশাবকের মতো রায় বাহাদুরও সব সহ্য করলেন।

শেষ পর্যন্ত বুড়ী স্থির সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন যে, আগের দিনে রাজ্য গেলে রাজারা সপরিবারে বনে যেতেন। এ-যুগে যখন সেটা সম্ভব হচ্ছে না তখন হাজারবার বেড়িয়ে-আসা কাশী গয়া মথুরা বৃন্দাবনই হলো শেষ আশ্রয়। আর একদিনও নয়, যতদূর পারা যায় বোঁচকা বুঁচকি বেঁধে ভোর বেলাতেই পাড়ি জমাতে হবে।

রায় বাহাদুর প্রস্তুতই ছিলেন মনে মনে। বুড়ীর প্রস্তাবে তিনি বিনা প্রতিবাদেই রাজী হয়ে গেলেন। তবে ভোরবেলায় পালাবার সময়টা পালটে দু'একদিনের ভেতরে যে শুভদিন আছে তারই এক মাহেন্দ্রক্ষণে যাত্রার ব্যবস্থা করতে সম্মতি জানালেন।

কিন্তু শুধু সম্মতিতেই বুড়ী সন্তুষ্ট হলেন না, তীর্থে যাওয়ার আগে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের বিদায় ভোজে আপ্যায়িত করবার বিরাট খরচার দায়িত্বটাও রায় বাহাদুরের ঘাড়ে একান্ত স্নেহবশেই চাপিয়ে না দিয়ে পারলেন না।

শেষ রাত্রের শেয়াল ডেকে গেল। মাদারীর ঘুম ভাঙ্গলো সেই শব্দে। অতীতের অসংখ্য ঘটনা তার কল্পনায় ভীড় জমায়। সমগ্র জীবনের সুখ-দুঃখ নিয়ে তন্ময় হয়ে যায় সে।

টুক্-টুক্-টুক্, টুক্-টুক্-টুক্!

এ শব্দের অর্থ বোঝে মাদারী, আস্তে আস্তে উঠে ঘরের ঝাঁপ খোলে।

ভীমের বউ দাঁড়িয়ে আছে ছায়ামূর্তির মতো। ফিস্-ফিস্ করে বলে—চলো এটু।

এমন অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারে না মাদারী, এ-যেন এক অমোঘ নির্দেশ, সমগ্র সত্তা ওর উদগ্র হয়ে ওঠে। দরজার ঝাঁপ বন্ধ না করেই মাদারী রওনা দেয়।

ভীমের বাড়ী আর মণ্ডল বাড়ীর মাঝখানে ছোট নালা। তার পাড়ে

আস্তাওড়া আর ভাঁটা গাছের খুচরো জঙ্গল। তার পাশে বাঁশের ঝাড়। ভীমের বউ সেখানে নিয়ে গিয়ে মাদারীকে দাঁড় করায়। তারপর গরু তাড়াবার মতো 'হেই'-'হেই' শব্দ করতে করতে চলে যায়।

—আমি দিদি!

মেজগিন্নির গলার স্বরে চমকে ওঠে মাদারী। তারপর বিরক্ত হয়ে বলে—তুমি? তা অ্যাতো কাণ্ড কিসির।

—কাণ্ড আছে বুলেই তো। কুকুরি-যেন্ গন্দো পায়েছে।

মাদারী শিউরে ওঠে। কম্পিত কণ্ঠে ফিস্-ফিস্ করে বলে—জানি তা। গন্দো তো সারা যাগায়। আসল যাগার গন্দো পালে কিনা তাই বল আগে।

—হ্যাঁ, পায়েছে।

—জানলি ক্যামোন করে।

—সহদেব সব বোললে-যেন্।

খালধারের পথে দলবদ্ধ ভারী বুটের আওয়াজ ওঠে। বাতাসে সিগারেটের আর বিড়ির গন্ধ ভেসে আসে। পাষাণের মতো নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ওরা। বুটের আওয়াজ ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়।

মেজগিন্নি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

—কাঁদিস ক্যানো?

—যদি কিছু হয়!

—কার কি হবে! অলক্ষুণে কথা বুলতি নেই।

জবাব দিতে পারে না মেজগিন্নি, তবু কাঁদে। মাদারীর দেহমনে অসংখ্য বিষধর সাপের মতো ভয়ঙ্কর অথচ শিথিল আশঙ্কারা ছড়িয়ে পড়তে থাকে পায়ের পাতা থেকে মাথা পর্যন্ত।

—এইডে ধরো দিদি। মেজগিন্নি কলার পাতায় জড়ানো একটা জিনিষ মাদারীর হাতে দেয়।

শুকনো গলায় মাদারী জিজ্ঞাসা করে—কি দিলি, কার জন্তি?

—সরুচাকলী কয়খান।

মাদারী বুঝতে পারে কার জন্যে চরম উদ্বেগে কাঁদছে মেজগিন্নি। সরুচাকলী যে ভালবাসে সে-যে আজ এই মুহূর্তে কোথায়, কে জানে!

—দিও কিন্তুক। মেজগিন্নি মিনতি জানায়।

যন্ত্রণাদায়ক বেদনা ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাদারী।

চৌকিদার হাঁক দেয় ও-ও-হো-ও—উ-ই…। বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ হয় অনেক দূরে, বোধ হয় প্রতাপনগরে।

সারা শেষরাত্রি ধরে ভীমের বউ আর মাদারী দড়ি আর কুঁড়োর ধামা নিয়ে তাদের হারানো গরু খোঁজে গ্রামের পথে পথে আর জঙ্গলে জঙ্গলে।

জাগরণ ক্লান্ত পাহারাওলারা সন্দেহ করবার কারণ পায় না জেরা করেও। কিন্তু সহদেবকে সুড়সুড়ি দিয়ে অনেক গোপন কথা আর একবার জেনে নিলে মেজগিন্নি। ফলে, রাত পোহাবার আগেই ভীমের বউ আর মাদারী গ্রাম পেরিয়ে আরও যে কোথায় কোথায় ঘুরে এলো বোধকরি কাকপক্ষীতেও তা টের পেলে না।

বিদায়-ভোজের দিন সকালেই রায়বাহাদুর মায়ের জন্যে, বাবার জন্যে, রায় বংশের সকল পূর্বপুরুষের জন্যে গভীর শোক অনুভব করলেন। তিন শতাব্দীর পুরোনো প্রাসাদের খসে-পড়া জমাটের জন্যে দুঃখ বোধ করলেন, সমগ্র বিল অঞ্চলের গ্রামগুলোর জন্যে আত্মীয়ের বিয়োগ বেদনা অনুভব করলেন এবং মরা দীঘির অগভীর জলে আছড়ে-পড়া বাতাসের শব্দে পিতৃপুরুষদের হাহাকার শুনতে পেলেন। সেই সঙ্গে অপরিণত এক বালিকার মিহিসুরে টেনে টেনে গাওয়া অস্পষ্ট গান শুনবার জন্যে মনটা তাঁর অকস্মাৎ আকুল হয়ে উঠলো।

এই ভোজটাকে নিজেদের ঘর গুছাবার শেষ সুযোগ মনে করে চাকর-বাকর আত্মীয়-স্বজন ও গ্রামবাসীরা সপরিবারে এমন প্রবলভাবে

কর্মে লিপ্ত হয়েছে যে, সদর থেকে অন্দর পর্যন্ত বিরাট জমিদার বাড়ীটা এক গগনবিদারী কোলাহলের রাজ্যে পরিণত হয়েছে। তার ভেতর থেকে হাসির উল্লাস আর শোকের উচ্ছ্বাস মাঝে মাঝে প্রবল শব্দে উৎসারিত হয়ে দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ছে।

এমনি অবস্থায় কাকীমা বুড়ী ঘরে ঢুকে বললেন—পেসোন উঠেছিস্? যার কাছেই দাওনা কেন, নোট দিলে বাকী টাকা আর ফেরত দিচ্ছে না কেউই, বল্‌তো এ কি কাণ্ড! তুই যদি বাবা একটা——

রায় বাহাদুরের সারা অন্তর রী-রী করে উঠলো হীনতার স্পর্শে। কাকীমাকে পর্যন্ত কঠোর কথা বলতে ইচ্ছে হলো তাঁর। মনের সে ভাব দমন করে বললেন—রাজ্য আর রাজবাড়ী দুই-ই যখন ছাড়ছি তখন সামান্য দু'টো টাকা নিয়ে শেষ দিনে আর টানা-হ্যাঁচড়া করতে মন চাইচে না খুড়ীমা।

বুড়ীও জমিদার গৃহিনী, ভাসুরপোর রাজকীয় ঔদার্য এখনও অটুট আছে দেখে খুশীই হলেন এবং রায় বাহাদুরের আরাম বিধানের জন্যে পুরোনো চাকর আর তরুণী ঝিকে ডেকে দিলেন।

রায় বাহাদুরের কাদার মতো নরম মনটা আবার বিরক্তির আঘাতে পীড়াগ্রস্ত হয়ে উঠলো।

জমিদার বাড়ীর একদিনের উৎসবও যে এমন শব্দময় দানবীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হতে পারে রায় বাহাদুর আজ সকালে তা প্রথম আবিষ্কার করলেন অতি মর্মান্তিক স্নায়বিক যন্ত্রণায়। চোখ বুঁজে থাকতে থাকতে তাঁর মনে হলো, যেন এক ঘুমন্ত রাক্ষসপুরী সন্ধ্যার অন্ধকারে জেগে উঠেছে আর অসংখ্য রাক্ষস যেন সারাদিনের শীকারলব্ধ নরমাংসের চারিপাশে মেতে উঠেছে বীভৎস উৎসবে।

প্রায় টলতে টলতেই বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। পুরোনো চাকর পুরোনো যুগের ইজি চেয়ারটা টেনে ঠিক করে ঝাড়ন দিয়ে

ঝেড়ে দিলে। রায় বাহাদুর বসলেন না। আস্তে আস্তে পুরোনো আমলের মোগলাই রেলিং—এর ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন। সামনে প্রকাণ্ড মজা দীঘি, ওপারে তার যুগযুগান্তের ঝাউগাছ। ঝাউগাছের মগডালে শকুনে বাসা বেঁধেছে। বাতাসের ধাক্কায় ঝাউগাছের মাথা জোরে জোরে দুলে উঠলেই শকুনের বাচ্চাগুলো ডানা ঝাপটে উঁচু হয়ে মুখ বাড়াচ্ছে, বাতাস থামলে নামিয়ে নিচ্ছে।

বহু শতাব্দীর জমিদার বাড়ীর বাইরের আলসেয় চিল বসে আছে। সামনে বিস্তৃত আদিম পৃথিবী জমিদারীর সখের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ধ্বংসাবশেষ শিয়রে নিয়ে দাঁড়িয়ে, আর এপারে এই রাজ পরাক্রমের শেষচিহ্ন যুগান্তরজীবি পাষাণপুরী তাঁর চারপাশে দাঁড়িয়ে আছে, এই মুহূর্তে এক রাক্ষসপুরীতে রূপান্তরিত হয়ে। রায় বাহাদুর আর সহ্য করতে পারেন না, এগিয়ে চলেন পায়ে পায়ে। পুরোনো চাকরটা প্রভুভক্ত কুকুরের মতো তাঁর পেছনে পেছনে চলতে থাকে।

রায় বাহাদুর চলতে লাগলেন, কখনও ধীরে কখনও দ্রুত, কখনও ডাইনের বারান্দা দিয়ে কখনও বাঁয়ের বারান্দা দিয়ে, কখনও ওপরে চেয়ে, কখনও সামনে চেয়ে, কখনও জানালা দিয়ে পাশের ঘরে উঁকি মেরে আর অধিকাংশ সময় নিচের মাটিতে চেয়ে চেয়ে।

কোন ঘর খোলা আর কোন ঘর বন্ধ, কোনটায় তালা লাগানো, কোনটায় শুধু শিকল দেওয়া। প্রায় সব ঘরেরই জানালা খোলা, জানালার কপাটগুলো খসে পড়ে গেছে বলে। দরজাগুলো সাবেক আমলের লোহার গজাল বসিয়ে খোপ কেটে কেটে তৈরী। তার ওপরকার রং বার্ণিশ উঠে গেছে বহুকালের অযত্নে, আবহাওয়ার উপদ্রবে কাঠের আঁশ বেরিয়ে পড়েছে পাঁজরা বেরুনো কঙ্কালের মত। বারান্দার থামের আর আলসের, ঘরের বাইরের ভেতরের দেওয়ালের আর ভেতরকার ছাদের পলাস্তারা খসে গেছে, পাঠান আমলের অসমান পাতলা পাতলা ইঁট

বেরিয়ে পড়েছে। ছাদের মেঝের সান উঠে গেছে ঘরে বারান্দায় সর্বত্র। যতদূর চোখ যায়, উবড়ো-খাবড়া ছাদ শুয়ে আছে উপুড় হয়ে। ভেতরকার ছাদে বরগা নেই। খিলানের ওপর ছাত তৈরী, পলাস্তারা আর জমাট খসে পড়ায় খিলানের ধনুকের মতো বাঁকা রেখা দেখা যাচ্ছে, তারও ফাঁকগুলো দিয়ে চুণসুরকী খসে পড়েছে আর বৃত্তরেখায় সাজানো ইঁটগুলো কঙ্কালের দাঁতের পাটির মত হাসছে। রায় বাহাদুরের মনে ভয় হয় এখনি হয়তো কথা কয়ে উঠবে এরা প্রেতাত্মার ভাষায়।

পাঠান আমলের দক্ষিণ দেশের এই বিখ্যাত দুর্গপ্রাসাদ আজ জরাজীর্ণ হয়ে ভেঙ্গে পড়ছে। কালজয়ী মানুষের শক্তি একদা যাকে অমর করে গড়ে গিয়েছিল, কাল আজ তাকেই ধীরে ধীরে অথচ নিশ্চিত ভাবে ক্ষইয়ে দিচ্ছে। মানুষের শক্তি আজ পরাজিত হয়েছে মহাকালের অনিবার্য শক্তির কাছে। সমগ্র বাড়ীটা যেমন দুর্জয় মানুষের শক্তির প্রতীক, খসে পড়া পলাস্তারার ফাঁক দিয়ে পাঁজরা বেরুনো ইঁটের গাঁথনীটাতেও তেমনি যেন ইতিহাসের অমোঘ পতন কাহিনী লেখা। অসুস্থ অস্থির মন দিয়েও ইতিহাসের সে-লেখা পাঠ করতে আর বুঝতে পারছেন রায় বাহাদুর। সে কাহিনী যেমন সত্য তেমনি মর্মান্তিক, ঐতিহাসিক নাটকের শেষ অঙ্কে সিংহাসনাসীন রাজার শত্রুহস্তে নিহত হওয়ার চেয়েও করুণ।

রায় বাহাদুর তবু এগিয়ে যান। দরজা-জানালা-ভাঙ্গা ঘর থেকে বেরিয়ে ছড়িয়ে-পড়া পারসী উর্দু ইংরেজী বাংলায় লেখা রাশি রাশি দলিলপত্রের পাশ দিয়ে, স্তূপীকৃত ভাঙ্গাচোরা ছেঁড়া-ফাঁড়া চেয়ার, বেঞ্চি, আলমারী, খুরসী, চৌকী, সিন্দুক, তক্তাপোষ, পালঙ্ক, বেতের বাক্স, ঝাঁপি, ছবির ফ্রেম, পুরু কাঁচ আর আয়নার ফ্রেমের গা ঘেঁষে—গদির চামড়ার খোল, মশকের চামড়া, সতরঞ্চ, মেঝেয় পাতা ভেলভেট,

পাপোষ, গড়গড়া, ফরসী, হুঁকো রাখার বৈঠক, বিবর্ণ জরিতে জড়ানো গড়গড়ার নল, বিবর্ণ মখমলের তাকিয়ার খোল, আরও হাজার রকমের ঐশ্বর্যের চূর্ণ নিদর্শনের পাশ কাটিয়ে ডিঙ্গিয়ে ডিঙ্গিয়ে এঁকে বেঁকে এগিয়ে যান রায় বাহাদুর। সদর দেউড়ী থেকে আরম্ভ করে অন্দরের ঠাণ্ডা ঘর পর্যন্ত ছয় মহলা গোটা বাড়ীটাই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আঁকা বাঁকা প্যাঁচ দিয়ে দিয়ে লাগোয়া করে এমন ভাবে তৈরী যে, সদর দেউড়ীর পাশের সিঁড়ি দিয়ে উঠে প্রয়োজন হলে অন্দর মহলে চলে যাওয়া যায় অপর পাঁচটি মহল অতিক্রম করে। সে-যুগের জমিদার কর্তারা প্রাতঃভ্রমণের নামে এই ছয় মহলা বাড়ী পরিভ্রমণ করতেন আর সারা রাজপুরী কর্মচঞ্চল হয়ে উঠতো।

অতীত যুগে যে-পথে মহাপরাক্রমশালী পূর্বপুরুষরা মন্থর পদবিক্ষেপে রাজেন্দ্র-গমনে অগ্রসর হয়ে গেছেন, সেই পথে পা ফেলতে পেরে সেই-যেন আজও পড়ে-থাকা পদধূলির ওপর শেষ বংশধরের শেষ পদধূলি মিলাতে পেরে রায় বাহাদুর নিজেকে ধন্য মনে করলেন। বুকের কোথায় জানি অব্যক্ত দুঃখ বেদনা ভেদ করে রাজকীয় অহঙ্কার মাথা তুলে দাঁড়াতে চায়। কিন্তু একথাও তিনি অনুভব করেন— তাঁর চলার সামনে পেছনে ডাইনে বাঁয়ে উষ্ণীষধারী কোন শরীররক্ষী আর উদ্যত ভল্ল বহন করছে না, সৈনিক বেশধারী কোন বলবান ভাট আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে হাঁকছে না—"বাদশা ইনামদার শের-ই-দখিন মহামহিম মহিমার্ণব দক্ষিণ-রায়-কুলচূড়ামণি প্রজাকুল-দুঃখহারী শত্রুদমন"; দেওয়ান মনসফদার খাজাঞ্চি নিকাশী সিপাই বরকন্দাজ হুঁকোবরদার ছাতাবরদার খানসামা বাঁদী বেরিয়ে এসে হুজুর সেলাম দিতে দিতে মাথা নিচু করে পিছিয়ে যাচ্ছে না; সামনে পিছনে দেউড়ীতে দেউড়ীতে অকস্মাৎ ঘণ্টা বেজে উঠছে না; নদীর তীর থেকে অসংখ্য ব্রাহ্মণের কণ্ঠনিঃসৃত সূর্য-প্রণামের সুর ভেসে আসছে না, অন্তঃপুরীর

মন্দিরে চণ্ডীপাঠ সুরু হলো না, সদর দেউড়ীতে অকস্মাৎ সাতটা বন্দুকের আওয়াজ উঠলো না, এমন কি মাটির তলায় ঘর থেকেও কোন বন্দী প্রজার কান্নার ধ্বনি প্রাসাদের অঙ্গে আছড়ে পড়ে মিলিয়েও গেল না। আজ পেছনে আছে শুধু পৈত্রিক আমলের চাকরটা। সেদিন আর এদিনের এই শোচনীয় ঐতিহাসিক পার্থক্য বুঝতে বিলম্ব হয় না রায় বাহাদুরের।

তবু তিনি এগিয়ে যান। গতি এখন তাঁর মন্থর, দৃষ্টি ঝাপসা, মর্মক্ষয়ী বেদনার রস গেঁজিয়ে উৎলে উঠেছে হৃদয়ের কানায় কানায়। আজানুলম্বিত দুটি হাত ঝুলে পড়েছে শিথিল হয়ে পক্ষাঘাতগ্রস্ত মানুষের মতো।

কখন যে বাড়ীর সর্বোচ্চতলায় উঠলেন, রায় বাহাদুর তা টেরও পেলেন না। সেখান থেকে ধীরে ধীরে তিনি গম্বুজে গিয়ে উঠলেন। গম্বুজটা প্যাগোডার মতো। এখানে আগের আমলে ছোট কামান সাজানো থাকতো দুটো, একটার মুখ নদীর দিকে, আর একটার মুখ গাঁয়ের দিকে। তিনি নিজেই দেখেছেন বন্দুকধারী প্রহরীরা বসে বসে পাহারা দিচ্ছে আর খইনী টিপছে সেখানে। কিন্তু আজ সেই গম্বুজের এককোণে ভাঙ্গাচোরা বাক্স-প্যাটরা স্তূপীকৃত করে রাখা হয়েছে, ভেতরকার ছাদের কোণে কোণে ছেড়ে-যাওয়া পাখীর বাসা ভেঙ্গে-চুরে ঝুলে পড়ছে। মাঝখানে ঘণ্টা ঝোলাবার শিকলটা কিন্তু আজও ঝুলছে। তার গায়ে মরচে ধরেছে বহুকাল ধরে। মেঝেয় উঁচু গাছের ঝড়ে-উড়ে আসা পাতা আর শিমুল তুলো পচে পচে স্তর জমেছে, শিমুলের চারাগুলো বাতাসে দুলছে। বাইরের আলসেয় বনমূলো আর বনতুলসার চারা গজিয়েছে কোণে কোণে। ঠিক মাথার ওপর একটা অশ্বত্থ প্রবল শক্তিতে গম্বুজের সর্বাঙ্গ ফাটিয়ে শাখামূল ছড়িয়ে দিচ্ছে। সেইদিকে তাকিয়ে রইলেন রায় বাহাদুর। দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে তাঁর মনে হলো প্রকৃতির অমোঘ প্রতিশোধ উদ্যত হয়ে উঠেছে রায় বাড়ীর ঠিক মাথার ওপরই।

বাইরে তাকালেন। যতদূর চোখ যায় শুধু আকাশ আর আকাশ, নিচে তার সবুজ গালিচায় ফলশস্যহীনা বন্ধ্যা পৃথিবী আলস্যভরে শুয়ে আছে দিগন্তে সর্বাঙ্গ এলিয়ে। দূর থেকে আরও দূর, আকাশ আর পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত স্পষ্ট ধরা পড়েছে এই রায় বাড়ীর বিপুল উচ্চতায়। দশ দিকে যা কিছু আছে সবার ঊর্ধ্বে দাঁড়িয়ে আজও এই জমিদার বাড়ী পাহারা দিচ্ছে বন্ধ্যা পৃথিবীকে, আজও এর উঁচু মাথায় বজ্র আর শিলার ধারায় আকাশের অভিশাপ বর্ষিত হয়, আজও এর কানে কানে ক্লান্ত সব নিশীথ রাত্রে অন্ধকারের বুক থেকে মাটির হৃদয় থেকে বিশ্ব চরাচরের মর্মতল থেকে নিস্ফল চাপা কান্না ভেসে আসে।

অকস্মাৎ রায় বাহাদুর খাড়া হয়ে দাঁড়ান মেরুদণ্ড সোজা করে। বুকে তাঁর ক্ষীণ শক্তির মৃদু অহংকার জেগে ওঠে। অকস্মাৎ তাঁর মনে হয়, এই রায় বাড়ীর মতো আজও যেন তিনি রায়বংশের শেষ সন্তান দিগন্ত-জোড়া এই পৃথিবীর অধীশ্বর। শক্তিশালী ডান হাতের দ্রুতবদ্ধ মুষ্টি দিয়ে আপনার অজ্ঞাতেই সজোরে পাশের বন্ধ দরজায় ঘা মারেন। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে যায় আর্তনাদের মতো অদ্ভুত এক শব্দ করে।

ভাল লাগে নিজের এই শক্তির স্পর্শে। নিজের সবল অস্তিত্বের মধুর আস্বাদে সর্বাঙ্গ পুলকিত হয়ে ওঠে, ক্ষণিকের জন্যে এই সুধাময় মুহূর্তটা পান করেন তিনি। আঙুলের ব্যথা ভুলে ধীরে ধীরে কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। দরজার বাজু ধরে নিচেয় তাকিয়ে দেখেন। সিঁড়ি নেমে গেছে সোজা হয়ে ধাপে ধাপে, একটা দুটো করে যেন শতে-শতে হাজারে-হাজারে নিচে অনেক নিচে পাতালে পৃথিবীর হৃৎপিণ্ডে। আনন্দে সব দুঃখ ভুলে যান রায় বাহাদুর।

: —বড় সায়েব!

অনেকগুলো সিঁড়ির নিচে থেকে ওপরে তাকিয়ে রায় বাহাদুর খুশীতে হেসে ওঠেন। পুরোনো চাকর হাঁপিয়ে গেছে, তাঁর গতির সঙ্গে তাল রাখতে পারেনি, করুণ কণ্ঠে থামতে বলছে। তাঁর মাথার ওপর পায়রা উড়ছে একঝাঁক গোল চক্র রচনা করে, রায় বাড়ীর বাসায় নামবে তারা। মধুর! মধুর!! রায় বাহাদুর হাসি-হাসি মুখে চাকরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। চাকরটা হাঁপাতে হাঁপাতে খাড়া সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকে।

সিঁড়ির শেষ প্রান্ত, যেখানে মাটি, সেখানেই হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তা হয়নি, আরও নিচে নেমে গেছে। মাটির সমসূত্রে নেমে রায় বাহাদুর একবার ইতস্তত করেন, তারপর আবার নামতে থাকেন। পেছনে তাকিয়ে দেখেন চাকরটাও তাঁর অনুসরণ করছে। তীব্র উত্তেজনার মধ্যেও গা ছমছম্ করে, রায়বাড়ীর সম্বন্ধে একটা প্রবাদ মনে পড়ে তাঁর। রায়বাড়ী থেকে নাকি পাতালে যক্ষপুরীতে যাওয়ার একটা পথ আছে। রায় বাবুদের ভেতর যিনি সিদ্ধ পুরুষ হন তিনি প্রতি রাত্রিতে সেই পথে যক্ষ রাজার সভায় যাতায়াত করেন। যক্ষের কৃপাতেই তাই রায় বংশের পতন হয় না, ধন দৌলতে রায় বাড়ী ভরে থাকে কানায় কানায়।

মকারাদিসহ চতুর্বর্গ সাধনার বহু মার্গে দৃঢ়বদ্ধ রোমাঞ্চকর এই কাহিনীর আরও লতাপাতা আছে। সেগুলো মনে পড়বার আগেই রায় বাহাদুর একটা দরজার সামনে দাঁড়ালেন। সিঁড়িগুলো এখানে এসে ফুরিয়ে গেছে। সামনে একটা চত্বর। চত্বরের কোণে কোণে চারিপাশে মাঝখানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড থাম। মাটির তলায় এসেছেন একথাটা রায় বাহাদুর অনেক আগেই বুঝতে পেরেছেন, কিন্তু এখনও কেন ঘোর অন্ধকার হচ্ছে না, কেন চত্বরটায় আলো বাতাসের অভাব হয়নি সেকথাটা বুঝতে পারছেন না ঠিকমতো।

গোটা চারেক সিঁড়ি ভেঙ্গে চত্বরের প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দেখে বিস্মিত হলেন তিনি। মাটির ওপরে প্রকাণ্ড বাড়ীটায় কালের ছাপ পড়েছে, কিন্তু তলায় সবই অবিকৃত আছে। বহুকাল মানুষের হাত পড়েনি, তবু চত্বরের মেঝের সানের ওপর একহাঁটু ধুলো জমেনি, কোথায়ও গর্ত হয়নি, উবড়ো-খাবড়াও হয়নি।

চত্বরটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন। মেঝের ওপর দিয়ে চলবার শব্দ দেওয়ালে দেওয়ালে ছাদের গায়ে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। একদল প্রকাণ্ড আকারের চামচিকে চত্বরে উড়তে থাকে পাক দিতে দিতে। অনেক টিকটিকির চোখ জ্বল্ জ্বল্ করে উঠলো। অদ্ভুত কল্পনায় রায় বাহাদুরের মনে হলো সত্যিই যেন তিনি যক্ষ রাজ্যে এসে কোন জনহীন সরাইখানায় উঠেছেন। প্রতি মুহূর্তে তিনি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ময়ালের বন্ধুত্ব লাভের আশা করতে লাগলেন। কিন্তু টিকটিকিদের চোখ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলেন না।

ওপরের দিকে চাইলেন। প্রকাণ্ড খিলান হুমড়ে পড়েছে চারিদিকে। খিলানের জমাট আর রং যেমন ছিল ঠিক যেন তেমনিই আছে। আবহাওয়ার দুর্জয় শক্তি কেমন করে ব্যর্থ হলো এখানে বুঝতে পারেন না তিনি। দেওয়ালের গায়ে আঙ্গুল ঘসলেন। খানিকটা জমাট খসে গেল। যেন আলতো করে লাগানো ছিল দেওয়ালের গায়ে, ছোঁয়া লাগতেই ঝরে গেল। দেওয়ালের গায়ে থাবা মারলেন। ঝর্-ঝর্ করে জমাট ঝরে গেল। দেওয়ালে আর খিলানে প্রতিধ্বনি উঠলো আবার। আবার চামচিকে উড়লো, টিক্‌টিকিরা ছুটোছুটি করলো। ভয়ে পালাবার আকস্মিক প্রয়াসে ছাদের খিলানে আর দেওয়ালে চামচিকেদের ডানা আর মাথা ঠুকে যেতে লাগলো। আর সেই আঘাতে জমাটের টুকরো মেঝেয় পড়ে চূর্ণ হয়ে গেল, দেওয়ালের চুনকাম ধুলো হয়ে ছড়িয়ে পড়লো। সেই শব্দ পাক দিয়ে দিয়ে প্রতিধ্বনিত হলো দেওয়ালে দেওয়ালে আর ছাদের গায়ে।

অকস্মাৎ স্থির হয়ে দাঁড়ালেন রায় বাহাদুর। অকস্মাৎ আবিষ্কার করলেন রায় বাহাদুর রায়বাড়ীর শেষ সন্তান প্রসন্ননারায়ণ রায়কে, আবিষ্কার করলেন প্রসন্ননারায়ণের কঙ্কালকে এক মজে যাওয়া ঝিলাম নদীর অখ্যাত অনৈতিহাসিক বাঁকে যেখানে এক সানবাঁধানো ভাঙ্গা ঘাটের ডাইনে বাঁয়ে স্মরণ ফলকের তলায় তলায় ঘুমিয়ে আছেন তাঁর পূর্বপুরুষরা ফণীমনসার গভীর বনে। আর সেই ঘাটের তিনদিকে পাহাড়ী টিলা থেকে ভেঙ্গে—চুরে খসে-ঝরে নেমে আসছে আদিম যুগের এক দুর্গপ্রাসাদ অথচ শেষ হয়নি তার ভাঙ্গার পালা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলেন রায় বাহাদুর, জীবনের সব চেয়ে গভীর আর সব চেয়ে বেদনাময় দীর্ঘশ্বাস।

চামচিকে ওড়া বন্ধ হয়েছে, জমাট ভেঙ্গে পড়াও বন্ধ হয়েছে। কিন্তু ধ্বনি-প্রতিধ্বনির রেশ এখনও গম্-গম্ করছে যেন। মাঝে মাঝে সিঁড়ির পথ ধরে বাইরের বাতাস ঢুকছে চত্বরে। পাক খেয়ে খেয়ে ভেতরের বাতাস বাইরে ফিরে যাবার বেলায় আগন্তুক বাতাসের সঙ্গে ধাক্কা লেগে কেমন এক রকমের শস্-শস্ শব্দ হচ্ছে। সেখানে দাঁড়িয়ে রায় বাহাদুর কামনা করলেন এই অদ্ভুত মুহূর্তটাকে দুহাতে আঁকড়ে ধরে—হঠাৎ সমগ্র রায়বাড়ীশুদ্ধ এই চত্বরটা যদি বসে যায়, ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়, একটা ময়াল না হোক গোখরো সাপও যদি ছোবল না দিক অন্তত তাড়া করেও আসে, চত্বরের দেওয়াল থেকে অকস্মাৎ কোন জানোয়ার কিংবা অপদেবতা যদি বিকট আকার নিয়ে বেরিয়ে আসে, যদি——

রায় বাহাদুর একটুও নড়বেন না, সেই ধ্বংসের প্রবল বন্যায় বিনা প্রতিরোধে গা ভাসিয়ে দেবেন, ভাসাতে ভাসাতে যেখানে খুশী নিয়ে যাক তাঁকে, না হয় চূর্ণ-বিচূর্ণ করে কোন জনহীন দ্বীপে রেখে দিক তাঁর ধ্বংসাবশেষ!

ধ্বংস হবার এক অবরুদ্ধ কামনায় চত্বরের দেওয়ালে দেওয়ালে, থামে থামে ঘা মারতে থাকেন তিনি। জমাট খসে খসে দেওয়াল আর থামের গোড়ায় স্তূপীকৃত হয়ে ওঠে, চূণ বালির ধূলোয় আধা-অন্ধকার চত্বর পূর্ণ অন্ধকার হয়ে আসে, তার ভেতর দিয়ে চামচিকেরা পাক দিয়ে দিয়ে উড়ে বেড়ায়। তাঁর দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়, পুরোনো চাকরটা কাসতে থাকে খক্-খক্ করে। রায়বাহাদুর খুশী হয়ে ওঠেন। আরও তীব্র আরও অদ্ভুত এক কামনায় মন তাঁর ডেকে ওঠে ভয়ঙ্করকে আহ্বান জানিয়ে—প্রতাপ মণ্ডল! প্রতাপ মণ্ডল! একখানা হাড়, প্রতাপ মণ্ডলের নিভৃত করোটি আর কঙ্কাল!

—বড় সাহেব! আর্তনাদ করে ওঠে পুরোনো চাকরটা। খক্-খক্ করে কাসির বিরাম নেই তার।

রায়বাহাদুর পেছন ফিরে দেখলেন চাকরটা টলতে টলতে এগিয়ে যাচ্ছে চত্বর থেকে বেরিয়ে যাবার সিঁড়ির দিকে। সেই অবস্থায় তখনও সে কাসছে অবিশ্রান্ত। রায় বাহাদুরও তার পেছন পেছন এগিয়ে গেলেন। অত্যন্ত তাড়াতাড়ি যাবার চেষ্টা করেও পদক্ষেপ দ্রুত করতে পারলেন না। মাটির তলার স্যাঁৎসেঁতে বাতাসের সঙ্গে ধুলো খেয়ে খেয়ে তাঁরও সর্বাঙ্গ দুর্বল হয়ে উঠেছে, শিথিল হয়ে এসেছে পা দুখানাও।

যে দরজাটার সামনে সিঁড়িটা শেষ হয়ে একটা সরু পথ এসেছে চত্বরের সিঁড়িতে, সেই দরজাটায় পিঠ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাসতে লাগলো চাকরটা। মাথাটা তার বাঁকা হয়ে রইলো, বুকে-চাপা ডানহাতখানা ঝুলে প'লো, মুখ দিয়ে গড়িয়ে প'লো খানিকটা শ্লেষ্মা আর লালা।

অক্লান্ত চেষ্টায় অতি শিথিল পদক্ষেপে রায় বাহাদুর তার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন।

কাছে পৌছাবার আগেই চাকরটা আবার কাসতে লাগলো

প্রাণপণে। কাসিতে শব্দ হলোনা বেশী, শুধু একটা হাঁপানীর টানের মতো ফ্যাঁস্-ফ্যাঁস্‌নি ছাড়া। প্রবল শক্তি প্রয়োগ করার জন্যে তার পেশীগুলো ফুলে উঠলো, রক্তের চাপে শিরাগুলো কুঁকড়ে গেল। আস্তে আস্তে তার পেছন দিককার দরজাটা যতই খুলতে লাগলো চাকরটা ততই ঢলে পড়তে লাগলো তার ভেতরে। রায় বাহাদুরের মনে হলো কে-যেন ওকেরটাকে সবলে টেনে নিচ্ছে দরজার ভেতর দিকে।

সেই আধখোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চোখ দুটি প্রসারিত করার পর আর একবারও পলক পড়লোনা রায় বাহাদুরের। সারা জীবন ধরে পিতৃপুরুষদের বীরত্বের যে-কাহিনী তিনি শুনে এসেছেন, প্রতাপ মণ্ডল হত্যার যে প্রবাদ বলতে গেলে সারা বাংলার জমিদার কুলের গর্বের সম্পদ হয়ে আছে, প্রতাপ মণ্ডলের প্রতিষ্ঠিত মা-কালীর যে ভীমা ভয়ঙ্করী রূপের বর্ণনা আজও শিশুদের আতঙ্কের উপাদান হয়ে আছে, রায় বাহাদুর এই সঙ্কট মুহূর্তের অদ্ভুত পরিবেশে তারই মুখোমুখী দাঁড়িয়েছেন। সম্মুখে বহুযুগের কল্পনায় ভয়াল রঙ্গে রঞ্জিত কাহিনীর মূল বিষয়বস্তু তার সত্যকার রূপ নিয়ে পড়ে আছে ভাঙ্গা-চোরা ছোট একখানা বেলে পাথরে, প্রকাণ্ড একটা দেওয়াল আলমারীতে গাঁথা হয়ে। পাথরখানা খোদাই করে করে অপটু হাতে একটা কালীমূর্তি তৈরী হয়েছে। বহু যুগের আবহাওয়ার প্রভাবে সর্বাঙ্গ ক্ষয়ে ঝরে অসমান হয়ে গেছে সেখানা। তার ওপর পাথরটা আবার চৌচির হয়ে ফেটে যাওয়ায় কোন্‌টা যে মা-কালীর হাত আর কোন্‌টা যে তাঁর জিভ বোঝাই কঠিন।

ভাল করে দেখবার জন্যে সোনার পাতে মোড়া সিগারেট লাইটারটা জ্বাললেন রায় বাহাদুর। সেই আলোয় আলমারীর ভেতরটা যেন জেগে উঠলো অকস্মাৎ। মাকড়সাদের ঘুম ভেঙ্গে গেল, বাসা ছেড়ে তারা

ভাঙ্গা মা-কালীর সর্বাঙ্গের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে ছুটে চলে গেলো, মাথার ওপর দিয়ে ছুটো বড় বড় টিক্‌টিকি লাফিয়ে পড়লো। একটা পড়লো আলমারীর তলার খোপে চিত করে রাখা মাথার খুলিটার ওপর, আর একটা লুকিয়ে পড়লো একটা ব্রোঞ্জের জগের ভেতর। মাঝারি ধরনের একটা কাঁকড়াবিছে মা-কালীর মাথার ওপরকার ফাটল দিয়ে ছু'পা বাড়িয়ে মাথাটা যেন ছু'বাহু দিয়ে জড়িয়ে রইলো। ভাঙ্গা বেলে পাথরে আঁকা মা-কালীও যেন প্রাণহীন শবের মূর্তিতে কবরের ভেতর থেকে জেগে উঠলেন।

রায় বাহাত্বরের সমগ্র সত্বা মেদ মজ্জা রক্তধারা হৃদয় মন অতি নাটকীয় বেদনায় আর্তনাদ করে উঠলো একসঙ্গে। প্রতাপ মণ্ডলের মা-কালীর আকাশ ছোঁয়া মাথা কই! বিশ্বগ্রাসী তাঁর রক্তাক্ত জিহ্বা লক্‌-লক্‌ করে বেরিয়ে এলো কই! কই তাঁর গলায় আর কোমরে লক্ষ অস্থরের রক্তঝরা মুণ্ড আর ছিন্ন হাতের মালা! আলুলায়িত কৃষ্ণ-কালো কেশের জালে বিশ্বভুবন আচ্ছন্ন হয়ে গেল কই! কই সে উন্মাদিনী রণরঙ্গিনীর রক্তচরণের বেতাল-নৃত্যে চরাচরনাশী ধ্বংসের বন্যা নেমে এলো কই! যে-দেবী প্রতাপ মণ্ডলের প্রতি বাম হয়ে প্রতাপ রায়কে সদয় হয়েছিলেন, যে-দেবী তাঁর পিতৃপুরুষের হাতে প্রতাপ মণ্ডলের 'বিজয় খড়্গ' তুলে দিয়ে এই দক্ষিণ দেশের রাজা করে দিয়েছিলেন, যে-দেবী যুগ যুগ ধরে রায় বংশের ভিত্তিতে তেজ ও শক্তি সঞ্চার করেছেন, যে-দেবী যুগ যুগ ধরে রায় বংশকে ধন-ধান্যে, সুখে ঐশ্বর্যে, যশে সম্মানে দক্ষিণ বাংলার নেতৃত্বে বসিয়েছেন, কই, কই, ভূলোক-দ্যুলোক উদ্ভাসিনী তেজোপুঞ্জময়ী সে মহাশক্তি কই! নেই, সে দেবী নেই! সে শক্তি আজ শিলীভূত, সে দেবী আজ চূর্ণ-বিচূর্ণ, প্রত্নতাত্বিক যুগের বেলে পাথরের অতি সামান্য এক শিলালিপি !!

বিকেলের পড়ন্ত রোদে রায় বাহাদুর নিজেকে প্রায় সুস্থ মনেই আবিষ্কার করলেন রায়বাড়ীর সেই গম্বুজ-ঘরে। হাতে তাঁর একখানা ছোট খাঁড়া, আগাটা তার ভাঙ্গা, ধার বলতে কিছুই নেই—বোধহয় প্রতাপ মণ্ডলের মা-কালীর মরচেধরা খাঁড়াই তিনি কুড়িয়ে এনেছেন। পাশে তাঁর দু'হাঁটুর ভেতর মাথা দিয়ে পুরোনো আমলের চাকরটা বসে আছে।

অবস্থাটা ভালভাবে বোঝবার আগেই তাঁর মনে হলো তিনি যেন পাণ্ডবরাজ যুধিষ্ঠির। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সবাই মরে গেছে। পৌত্র পরীক্ষিতকে রাজ্যভার দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন তাঁরা পঞ্চপাণ্ডব আর দ্রৌপদী। মহাপ্রস্থানের পথ পরিক্রমা তাঁর শেষ হয়ে গেছে। পঞ্চপাণ্ডবের চারজন আজ আর নেই, নেই প্রিয়তমা সৈরিন্ধ্রী। যাত্রা শেষে স্বর্গের দ্বারদেশে এসে একাকী তিনি বিশ্রাম করছেন, পাশে সেই সর্বজয়ী সারমেয় এই প্রভুভক্ত পুরোনো চাকরটা।

নিজের প্রতি কঠিন ব্যঙ্গে মুখে তাঁর হাসি ফোটে, এখনই বোধ হয় ইন্দ্র আর যম এসে তাঁকে শেষ পরীক্ষায় পাশ করিয়ে স্বর্গের অন্তঃপুরে নিয়ে যাবেন। বৈকালিক মুমূর্ষু আলোকে ধূসর পৃথিবীর দিকে চেয়ে চেয়ে যমরাজের আগমন প্রতীক্ষা করেন তিনি।

ষোল

—ও ঠাউরপো, অ্যাট্টা কথা আছে, শুনবা?

মেজগিন্নির কথায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে সহদেব। অনেক দিন থেকেই সে প্রতীক্ষা করে আছে মেজগিন্নির মুখ থেকে একটি কথার, অতি গোপনীয় অথচ অতি সার্থক একটি কথার, যা শুনলেই সমগ্র দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠবে, শিরায় উপশিরায় ঢেউ উঠবে দুরন্ত রক্তস্রোতে, স্নায়ুতে

নারীদেহ স্নায়ুতে পেশীতে পেশীতে তাণ্ডব বাধাবে একটি কামনা, নরম পিষে-পিষে অতৃপ্ত পিপাসা মিটাবার একটিমাত্র পাশব কামনা।...

মেজগিন্নির কাছে, অনেক কাছে, সরে গিয়ে সে ফিস্-ফিস্ করে জিজ্ঞাসা করে—কি কথা, কি কথা ও মাজেবউ?

—সদর উঠোনে কওয়া যায়না সেকথা। চলো ঘরের মদ্দি।

মেজগিন্নির আগেই সহদেব ঘরের ভেতর ঢুকে যায়। মেজগিন্নি কিন্তু উঠোনে ঘুরে ঘুরে এটাসেটা করতে থাকে। সহদেব ডাকে চাপা কণ্ঠে—কৈ ও মাজেবউ, আসো?

মেজগিন্নিও চাপা কণ্ঠে বলে—তুমার কাণ্ডাকাণ্ডি নেই এট্টুউ, মানুষজনও মানতি চাওনা।

সহদেব উঁকি মেরে দেখলে—ঘরের পেছনে তামাক খেতে-খেতে যাচ্ছে মথুর পাড়ই খালের দিকে। সে অদৃশ্য হলে সহদেব আবার ডাকে—কি করতিচো তুমি অ্যাতোক্ষোণ—

মেজগিন্নি আস্তে আস্তে বারান্দায় ওঠে, আস্তে আস্তে ঘরের ভেতর পা বাড়ায়। সহদেবের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে—রক্তের চাপে বেগুনে হয়ে উঠেছে সে মুখ, চোখ দুটো অবিলম্বে শিকার ধরবার জন্যে উন্মুখ জানোয়ারের মতো জ্বল্-জ্বল্ করছে, সারাদেহ কাঁপছে তার উত্তেজনায়।

অকস্মাৎ খিল্-খিল্ ঝঙ্কারে ভেঙ্গে পড়ে মেজগিন্নি, প্রাণ খুলে হাসে ঘরের মেঝেয় লুটিয়ে লুটিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে।

বিমূঢ় সহদেব এক পা এগিয়ে যায় মেজগিন্নির দিকে। মেজগিন্নি উঠে দাঁড়ায় বিদ্যুৎ ঝলকের মতো, পিছিয়ে দাঁড়ায় এক পা। নিরাপদ ব্যবধানে দাঁড়িয়ে বলে—অ্যাকোন না।

—কখোন?

—সন্ধ্যের মুখায়। তুমি আর আমি, চলে যাবো গিরাম ছাড়ায়ে, বা'র গিরাম ছাড়ায়ে, বিল ছাড়ায়ে, দূরি, শতো দূরি—পারবা?

—পারবো, ঠিক পারবো।

—আমি বলবো—যাচ্ছি ভাইরি দেখতি, বড্ড অসুখ না বাঁচার মতো।

অনেক দূরে বাড়ীর সীমানার বাইরে এইসব দাঙ্গাদাঙ্গির মাঝে সন্ধ্যের সময় থাকতে হবে ভেবে সহদেবের উত্তেজনা কমে আসতে লাগলো কাপুরুষতার পথ ধরে। বললে—অদ্দূর যাবার দরকার হবেনা। আজ সন্ধ্যেই ভালো সুমায়। বাবা থাকপেনা, সেই নতুন লোকটা থাকপেনা, চৌকীদার পুলিশ পাহারাদার কিচ্ছু থাকপেনা, আজই ভালো।

—কনে যাবে তারা? অতি উদাসীন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে মেজগিন্নি।

—ক্যানো পিরতাপনগর যাবে। তাও বুঝি জানো না। নব আর নবীনির দল নাকি পিরতাপনগর পুড়ায়ে দেবে ঠিক করেচে। বাবা জানতি পারে বলে দেচে পুলিশরে। পুলিশরা তাই অ্যাথোনেত্তে পিরতাপনগর পাহারা দেবে। এ-গিরামে থাকপে শুধো অ্যাট্টা চৌকিদার, তার সঙ্গে মাঝে মাঝে বা'র হবো আমি।

মেজগিন্নির সারা অন্তর নেচে ওঠে। সেই খুশি মুখ ছড়িয়ে বলে ওঠে—তা'লি আজ সন্ধ্যেই ভাল দিন, কি বলো—বলেই সে ভেঙ্গে পড়লো আবার বিজয়িনীর হাসিতে। সে হাসি সহ্য করতে না পেরে পালিয়ে যায় সহদেব শেলবিদ্ধ বুকখানা চেপে ধরে।

একটু পরেই হরিবোলের বউ এলো, কাঁখে তার মাদারীর দেওয়া ঘুঁটের ঝুড়ি। চারিদিকে একবার নজর বুলিয়ে ফিস্‌-ফিস্ করে মেজগিন্নিকে বলে এর মদ্দি আছে সব, সাতটা চিরা আর দুটো ছিড়া—

ঘুঁটের ঝুড়িখানা রান্নাঘরে রেখে এসে মেজগিন্নি হরিবোলের বউকে নিয়ে ঘরে ওঠে। ফিস্‌-ফিস্ করে ওরা অনেক কথা বলে। মাদারীর নির্দেশ খতিয়ে খতিয়ে জিজ্ঞাসা করে আর মুখস্ত করে মেজগিন্নি। শেষে মেজগিন্নি সহদেবের কীর্তিটা জানায়। দু'জনে ওরা হাসে প্রাণভরে।

হরিবোলের বউ উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলে যাতে অনেক দূর থেকেও লোকে শুনতে পায়—আমার ঘুঁটে কিন্তুক সুদি-আসলে শোধ দিবা।

মেজগিন্নিও চেঁচিয়ে বলে—হায় সুদ! বোলে আসল ঘরের মুষল নেই তার আবার সুদ। ফিস্‌-ফিসিয়ে বলে—বুলিস কিন্তুক দিদিরি সব কথা, সহদেবের কথাও।

থানার সীমান্তবর্তী অপর থানার গ্রাম উত্তমনগর, মাঝখানে ছোট খাল। এক থানার পুলিশ আর এক থানার গাঁয়ে যেতে পারে না, তবু বাঁশের সাঁকো মিলন ঘটিয়েছে দুই থানার দুই ছোট গাঁয়ের।

সুরথ মণ্ডল ছিল উত্তমনগরের সম্পন্ন চাষী। মরে গিয়ে বিষয়-আশয় চাপিয়ে গিয়েছিল জোয়ান ছেলে অধিরথের ওপর। বুদ্ধিগুণে অধিরথ আজ সামান্য কয়েক বিঘে জমির মালিক এক সাধারণ চাষী। তবে, বাবার সঙ্গে পার্থক্যটা ধনে যতটা হয়েছে, মানে এখনও ততটা হয়নি। বেগার বন্ধ আন্দোলনের সময় থেকে অধিরথ এসে যোগ দিয়েছে নবদের দলে। গাতার দলের সর্দারের চেয়েও সে বেশী ভালবাসে আর মান্য করে নবকে।

বাবার রেখে-যাওয়া দুটো জিনিষ আজও সে অক্ষত রেখেছে। ধানে ভরুক আর না ভরুক, গোলাটা সে ছায় সময় মতো, আর লোক আসুক আর না আসুক বাইরের ছোট ঘরখানা রাখে নিকিয়ে পুঁছিয়ে। সেই বাইরের ঘরে সন্ধ্যার পর বসে আছে নব, নবীন, অধর গায়েন আর অধিরথ নিজে। ওরা নীরবে প্রতীক্ষা করছে কাদের যেন।

ল্যাম্পো জ্বলছে কোণা-পেঁচি দেওয়ালের ত্রিকোণ কুলুঙ্গিতে। তার অস্পষ্ট আলো পড়েছে ওদের গায়ে আবছা হয়ে, ওদের ছায়া পড়েছে উল্টো দেওয়ালে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দৈত্যের মতো। মৃদু বাতাসে নড়ছে আলোর শিখা। ছায়াও নড়ছে, যেন তৈরী হচ্ছে ছায়া-দানবরা কোন কিছু করবার জন্যে।

অনেক দূর থেকে একটা ধ্বনি ভেসে এলো—এ-এ-হ-উ-উ-ই-ই-ই—

আর একটু নিকট থেকে অবিকল ধ্বনি উঠলো প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। অকস্মাৎ একসঙ্গে দাঁড়ালো ওরা। উৎকর্ণ হয়ে চুপ করে পা বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে রইলো বাইরে চেয়ে। একটা শব্দ এগিয়ে আসতে লাগলো ওদের দিকে থপ্-থপ্ করতে করতে। রোমাঞ্চিত দৃঢ়তায় দেহগুলো ওদের দাঁড়িয়ে রইলো একই ভাবে।

একটু পরই অধিরথের ঘরে ঢুকলো একটি ছেলে এবং দরজার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে। নব আর নবীন মুখ তুলে প্রায় একসঙ্গেই বলে উঠলো—মাজে বউ!

নবীন বললে, আসো, ঘরের মদ্দি আসো, আমরাই সব আর কেউ নেই।

মেজগিন্নি ঘরের মধ্যে ঢুকে কাঁখের ছোট ধামিটা নামিয়ে রাখলো নবর নয়, নবীনের সামনে। আস্তে আস্তে বললে—দিদি পাঠায়েচে।

নবীন তাড়াতাড়ি ধামি থেকে জালি কুমড়ো আর কাঁকুড় নামিয়ে ফেললে মেঝেয়। তার তলায় কতকগুলো পুনর্নবা শাক। সেগুলো নামালে দেখা গেল কলাপাতায় জড়ানো একদলা পুরোনো তেঁতুল। সেটা হাতে তুলতেই মেজগিন্নি বললে—ওতেই আছে সব। নয়ডা বাঁশের পাতা জড়ানো আছে কলাপাতার তলায়। যারগে কাছে পাতা পাঠানো হইলো তারা সব চিরে দেছে। শুধো দুড়ো পাতা ছিঁড়ে দেছে কাটাথালীর নটবর—জোদ্দার মহাদেব বিশ্বেসের খুড়তুতো ভাই, আর গাবোথালীর নালু—বাছাড়ের বন্ধু উত্তোমের জ্যাঠাতো ভাই। ইরা দুইজন ও-কাজে রাজী না, আরো বোলে বাদী হবে। আর সাত গিরাম রাজী হয়ে মত দেছে। তবে এট্টু দেখা হবার জন্যি বুলেচে তারা।

মেজগিন্নি যে বিল অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ নয়খানা গ্রামের যুবক নেতাদের সঠিক মতামত এমন কৌশলে জেনে আনতে পারবে ওরা তা ধারণা করতে পারেনি। তার যোগ্যতায় সবাই বিস্ময় বোধ করে।

এই কাজটার ভার ছিল মাদারীর ওপর। কিন্তু তার ওপর কিছুদিন ধরে কড়া নজর রেখেচে পুলিশের লোকেরা। মাদারী কর্তব্যটা তাই সম্পাদন করিয়েছে মেজগিন্নি, হরিবোলের স্ত্রী আর ভীমের স্ত্রীকে দিয়ে। সে কথাটা নেতারা কেউ জানে না। নেতাদের কাছে মেজগিন্নি আজ প্রত্যক্ষ, তাই সশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে তারা মেজগিন্নির প্রতিই।

অধর গায়েন বলে—বউমা তুমি যা করেচো তা পুরুষ মানষির খ্যামোতায়ও কুলোতো না, তুমারে-যেন্ কি বুলে আশীব্বাদ করবো আজ।

নব বলে—তুমারে মাথায় তুলে নাচতি ইচ্ছে করে আমার। মণ্ডল বাড়ীর যুগ্যি বউ হয়েচো তুমি, তুমি মুখ রাখপা আমারগে।

অধিরথ বলে—এট্টু পদোধুলি দ্যাও বউদি। তুমার পা'র ধুলো মাথায় দিলি গোজম্মো আর হবে না বোধ করি। অধিরথ নীচু হয়ে পায়ের ধুলো নেয় মেজগিন্নির।

অধিরথের বন্ধু জয়রাম ঘরে ঢোকে। তার সর্বাঙ্গে দীর্ঘ পথ অতিক্রমের ক্লান্তি।

জয়রাম ভাল করে ঘরের ভেতরটা দেখে নেয়। মেজগিন্নিকে দেখে সে সঙ্কোচ বোধ করে। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায় অধিরথের দিকে। অধিরথ বলে—ও-তো আমাগের বউদি, নিজির লোক। কি হ'লো কও।

জয়রাম বলে—সারা পথ ভাঙ্গে তো গ্যালাম উকীলবাবুর বাসায়। উকীলবাবু সব শুনে বোললে যেন্—তুমারগে কাজটা তো খুব ভাল। তবে ধানতো কেউ সহজে দেবে না। জোর করে গোলার ধান নিলি তো দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধবে। তা যাতে না বাধে তা ঠিকমতো খ্যাপপে কিডা। তুমারগে ছোটঠাকুর তো চলে গেছে অন্য যাগায় বড় সভায়, অ্যাখোন তারে পাওয়া যাবে না। সে থাকলি তুমারগে অনেক সাহায্যি করতি পারতো অ্যামোন সুমায়। নিজিরে খুব বুঝেসুঝে কাজ করবা অ্যাখোন। ভুল হলিই মরোন সার।

ছোটঠাকুরের প্রতীক্ষাই সবাই করছিল আজ। চুপ করে বসে থেকে ধরা পড়তে চায়না ওরা। চাষীদের সত্যকার মঙ্গলের কাজ করতে করতে যদি ধরা পড়ে ক্ষতি নেই, বরং গৌরব আছে তাতে। চাষীদের ঘরের ধান ফুরিয়ে গেছে। অর্ধেকের অনেক বেশী কেড়ে নিয়েছে জমিদার মহাজনে, বাকীটা গেছে খোরাকীতে। এখন পেট চলবে কিসে হাজার হাজার লোকের। জমিদার মহাজনরা এবার ধান ছাড়বেনা সহজে, ছাড়লেও সুদ চাইবে তে-ডবল, আর তাও ছাড়বে একান্ত বিশ্বাসী দু-চারজনের কাছে। সেই জন্যে ওরা স্থির করেছে, জমিদার-মহাজনদের কাছে যাবে ওরা দল বেঁধে, ধান চাইবে, না দিলে নিজেরাই জোর করে গোলা ছুটিয়ে নিয়ে আসবে জমিদার-মহাজনের খোরাকী ধান রেখে। সে-ধান অবশ্য ফিরিয়ে দেবে ওরা। তবে আজ কাল নয়, ঘরে ফসল হলে, সুদ দিতে পারবে না। আর, এমন করে ধান নেওয়া তো নতুন নয়। দুর্বৎসর যেবারেই হয় সেবারেই সবাই চাষী জোদ্দারদের গোলা খুলে জোর করে ধান নিয়ে আসে, শোধও দেয় আবার। সেই পুরোনো কাজটাই করবে তারা। তবে, শুধু চাষী জোদ্দারদের গোলাতেই ওরা হাত দেবেনা এবার, জমিদার গাঁয়ের যে শ'আড়াই গোলায় চাষীর ঘরের জোর-করে কেড়ে-নেওয়া ধান এখন কড়কড় করছে সেগুলোকেও ওরা রেহাই দেবেনা এবার। এই কাজটা সহজ নয় এখন। জমিদাররা ওৎ পেতে আছে, ফাঁক পেলেই পুলিশ লেলিয়ে বেঁধে ফেলবে ওদের। সেইজন্যে দরকার ছিল ছোট্‌ঠাকুরের, বুদ্ধি দিয়ে তিনি ওদের পথটা সঠিক নির্দেশ করে দিতে পারতেন। ছোট্‌ঠাকুরকে পাওয়া যাবে এই ধারণাটা ওদের নিশ্চিত ছিল। কিন্তু এই গুরুতর সময়ে সেই লোকটাই কোথায় সরে পড়েছে। ওদের মনে আজ কেমন যেন খট্‌কা লাগে। ছোটঠাকুর কি শেষে—

নবীন বলে—ভদ্দোর লোক সব এক জাতির, ছোট্‌ঠাকুরই হোক আর উদ্ধব ঘোষই হোক।

নব পুরোপুরী সায় দিতে পারেনা। তবু সন্দেহ দোলা দিতে থাকে তার মনে।

যেন গভীর সংকটে পড়েছে এমন ভাবে ওরা ভাবতে লাগলো। জয়রাম একসময় বসে পড়ে বললে—উকীলবাবু বলে দেছে—যদি কেউ ধরা পড়ে তো য্যানো দিনির বেলা পড়ে। আর অ্যাকা-জুকা না পড়ে, য্যানো অনেক লোকের মদ্দি ধরা পড়ে। রাত্তির বেলা য্যানো কুনু হাঙ্গামের কাজে কেউ না যায়।

ওদের চিন্তা নানা পথে এঁকে বেঁকে চলে। গভীর থেকে গভীরতর ভাবনায় যেন দিশা হারিয়ে ফেলে ওরা।

মেজগিন্নি বলে—আর অ্যাট্টা কথা আছে। সিডা খুব বিপদের কথা। এথেনে বোলা যায়না তা।

সবাই ওরা মুখ তুলে তাকায় মেজগিন্নির দিকে। এমন কি কথা থাকতে পারে তার যা বিপজ্জনক অথচ নেতাদের সামনে বলা যায় না। ঘরখানার ভেতর ভাল করে চোখ ফেলে নব বলে—না, আমরাই তো সব। এথেনেই বলো, ভয় নেই কুসু।

মেজগিন্নি আস্তে আস্তে বলে সকাল বেলার কথাটা। তার কৌশলী ব্যবস্থায় সহদেবের মুখ থেকে যেসব গোপন সংবাদ বেরিয়ে গেছে গুছিয়ে গুছিয়ে সেগুলো জানিয়ে দেয়।

আবার গভীর চিন্তায় ডুবে যায় ওরা। দু'মুঠো ধান চাইবে প্রাণ ধারণের জন্যে। সে ব্যাপারটাকেও যে জমিদার গাঁয়ের লোকে। কত সাংঘাতিক করে নিতে পারে, ভেবে ওরা বিস্মিত হয়। জমিদার গ্রাম যেন লড়াই করবে, তৈরী হয়ে অপেক্ষা করছে তারই জন্যে। ওদের পারিকল্পনা কি বানচাল হবে শেষে। না, পরিকল্পনা ত্যাগ

করা যায়না, পেছুবার পথ নেই। পেছুলে নবজাগ্রত চাষীরা ভেঙ্গে পড়বে নৈরাশ্যে, আর তাদের জাগানো হবে অসম্ভব। যত বিপদই হোক, এগুতেই হবে।

নিভু নিভু ল্যাম্পোর আলোয় স্বল্পোদ্ভাসিত চিন্তামগ্ন মুখগুলো ধীরে ধীরে ঘন হয়ে আসে একসময়। ফিস্-ফিস্ করে আলোচনা চলে অনেকক্ষণ। বিরুদ্ধ পক্ষ কতটা সজাগ হয়ে আছে, কেমন ভাবে সজ্জিত হয়েছে, শক্তি সংহতই বা করেছে কেমন কায়দায়—আগে জানতে হবে সেকথা। তারপর স্থির করতে হবে পরবর্তী কর্মপন্থা বিভিন্ন গাঁয়ের নেতাদের ডেকে এনে।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে স্থির হয়ে বসে থাকে ওরা। ল্যাম্পোর কম্পিত শিখা আলো ফেলে ওদের সর্বাঙ্গে দুলিয়ে দুলিয়ে। সে আলোতেও রক্তিম দেখালো ওদের দৃঢ়বদ্ধ মুখ আর কপাল। কাঁখে ধামি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মেজগিন্নি। তার মনে হলো, যেন একদল মহাবীর বসে আছে ভাবী সংগ্রামের দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে। ওদের ভেতর নবকে দেখাচ্ছে যেন মহারথীর মত অচল অটল।

প্রথম প্রহরের শিয়াল ডেকে গেল।

মেজগিন্নিকে পাঠাবার বন্দোবস্ত করতে গেল নব। থালধার থেকে দলের একটি ছেলেকে দিয়ে পরের গ্রামের দলের হেপাজতে পাঠাবে তাকে। এমনি করে কয়েকটি গ্রাম পার হতে পারলে রাত্রি শেষ হয়ে আসবে। তখন ধামির ভেতর শাক তুলতে তুলতে মেজগিন্নি একাই পারবে বিল পাড়ি দিতে। বন্দোবস্তের কথা বলে নব জিজ্ঞাসা করে—পারবা তো, ও কুনো বউ?

মেজগিন্নি হাসতে হাসতে বললে—কোন্‌ডা না পারলে কও? আজকে নিয়ে কয়ডা কানডলা হলো এই। মদ্দগের লজ্জা থাকলি এ-কথা কি আর মুখে দিয়ে বার করতি পারতো?

আত্মবিশ্বাসের উঁচু সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে মেজগিন্নি আঘাত করলো নবকে। নেতাদের প্রশংসা আর অনুমোদনের ফলে আজ তার নিজের যোগ্যতা সম্পর্কে সকল সন্দেহ দূর হয়েছে। আজ সে নিজেকে আবিষ্কার করেছে সম্পূর্ণ ভাবে। আজ তার লজ্জার জড়তা ভেঙ্গে গেছে। অসঙ্কোচ আত্মপ্রকাশে এই মুহূর্তে সে কলরব করে উঠতে চায় সকাল বেলার ছাতারে পাখীর মতো।

—তুমারে যেন্ কি বুলে মান ছাখাবো আজ তা বুঝতি পারিনে আমি। বুদ্ধিতি আর কাজে সত্যিই তুমি হারায়ে দেছ আমাগের, য্যানো উপরি উঠে গেছ আমাগের চেয়ে অনেকখানি। এট্টু পা-র ধূলো ছাও মাজেবউ।

নব মেজগিন্নির পায়ের ধূলো নিতে সত্যিই নিচু হয়ে পড়ে।

—খবদ্দার, তুমি আমার পা পস্‌সো করবা না। পিছনে ছিটকে দাঁড়িয়ে তর্জন করে ওঠে মেজগিন্নি।

নব আঘাত খেয়ে তাকিয়ে থাকে মেজগিন্নির মুখের দিকে। খোলা মাঠের অল্প আঁধারে মেজগিন্নির চোখের আলো স্পর্শ করে তার চোখের তারায়। কেমন-যেন শির্-শির্ করে তার অন্তর। অস্পষ্ট এক নতুন উপলব্ধির ভেতর থেকে সে জিজ্ঞাসা করে—পা-র ধূলো নিবার যুগ্যি বুলেও কি মনে করোনা আমারে?

—না, করিনে। শান্ত কণ্ঠে জবাব দেয় মেজগিন্নি।

নবর গোপন মনের আলো-আঁধারী থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে এক নবজাত প্রশ্ন ডিম থেকে শাবক বেরিয়ে আসার মতো। সে আরও কিছু জানতে চায়। আজ যেন তার জীবনের চরম মুহূর্ত এসেছে, এর পরে আর দিন নেই, সময় নেই। সব সন্দেহ দূর করতে হবে আজ সময়ের এই শেষ বিন্দুতে। বলে—ক্যানো, কি অপরাধ করলাম তুমার কাছে।

—কথায় কি বুঝোনো যায় সব কথা। তুমার মন নেই, পরাণ নেই?

নব বুঝতে পারছে। ঘুম-চোখে ভোরকে যেমন করে বুঝা যায়, এ-যেন তেমনি—বুঝা যায়, তবু যায় না। পুরোপুরি বুঝবার জন্যে হৃদয় ওর উন্মুখ হয়ে উঠেছে আধ-ফুটন্ত কুঁড়ির পুরোপুরি আলো স্পর্শ করবার একান্ত প্রয়াসের মতো। ঠিক কোন্ কথাটি বললে এই মুহূর্তে যে ঠিক জবাবটি পাওয়া যাবে তারই সন্ধান করে সে।

নীরবে চলতে চলতে মাঠের সঙ্কীর্ণ পথে কখন জানি পাশাপাশি চলতে সুরু করেছে ওরা। নতুন ঘাসে পা ছুঁয়ে যাচ্ছে ওদের, মেঠো হাগড়া আর হাতীশুঁড়োর গাছ গায়ে লেগে লেগে সরে যাচ্ছে সস্-সস্ শব্দ তুলে তুলে। ভিজে মাটি শুকিয়ে যাবার জলো গন্ধ বাতাসের বুকে।

এতক্ষণে যেন ঠিক কথাটি খুঁজে পেয়েছে নব। জিজ্ঞাসা করে—দ্যাখা করবা মাজদার সঙ্গে?

মেজগিন্নি জবাব দিতে পারে না একথার অতি সহজে। ক্ষণিক ইতস্তত করে, মনের ভেতর ছোট একটা বেদনাও অনুভব করে যেন।

—কাছেই আছে, খালপারে। নব আবার বলে, যেন একতারার ওপর মৃদু-মৃদু আঘাত করছে।

আজ আর কিছু ঢাকা রাখতে ইচ্ছা হয় না মেজগিন্নির। কঠিন একটা স্বীকারোক্তির জন্যে মন তার তৈরী হয়ে ওঠে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—সারা জনমই তো দ্যাখলাম তারে। সগ্‌গেই উঠি আর নরকেই পড়ি সে-তো আমার সিঁথের সিঁদুরির মতো অথ্যায়। আর ক্যানো তারে নিয়ে টানাটানি করি। মা কালীর সন্তান, মা কালীই তারে রক্ষে করবেন।

বলতে বলতে থেমে যায় মেজগিন্নি। পাথর-চাপা অনুভূতি আজ জেগে উঠছে তার মধ্যে। তাকে সে উপলব্ধি করতে পারে, কথা

দিয়ে পুরোপুরি প্রকাশ করতে পারে না। হৃদয় যেন তার ফুটে উঠেছে। তার জীবন মাটির বেদনারস থেকে শক্তি সঞ্চয় করে যেন জেগে উঠেছে নীল রংয়ের এক ভুঁইচাঁপা, দল মেলেছে সে বসন্ত কালের ভোর বেলায়। ভাঁড়ভাঁড় গন্ধ ছড়িয়ে চাইছে সে সূর্যের প্রথম স্পর্শে শেষ কথা কয়ে শুকিয়ে যেতে।

ধীরে ধীরে আবার বললে সে—চড়কের সন্ন্যেসি, শিবঠাকুরির নাকি আর অ্যাট্টা চোখ বেশী আছে, তোমার কি নেই তা। থাকলি কি দেখতি পা'তে না তুমার মাজদার কালী মন্দিরিত্তে কুন পথ যায়ে ঠ্যাকলে শিব মন্দিরি?

নবর মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে থাকে মেজগিন্নি। অস্পষ্ট অন্ধকারে সে-মুখের রেখা পড়তে পারে না, গভীর আগ্রহে শুধু তাকিয়েই থাকে।

নবও কথা বলতে পারছে না। অপূর্ব এই মুহূর্তে ভোর নেমেছে তার হৃদয়ে স্পষ্টতর হয়ে। মেজগিন্নির কথাগুলো যেন বহুদূর থেকে ভেসে-আসা পাখীদের সূর্য-আবাহন, তার আবেদন যেন উষার আলোকে মৃদু উদ্ভাসিত দিগ্বলয়ের মতো, যার নিচে রক্তিম বনরেখার বঙ্কিম আভাষ। পাশে পড়ে আছে বিরাট কামনার সুপ্ত প্রান্তর, তার ওপরে তার কুয়াশার জাল, আকাশের রংয়ের আভায় জেগেছে সেখানে সহস্র রামধনু।

মেজগিন্নি বলে—ও সন্ন্যেসীঠাউর, শোন। কাছে আ'সো এট্টু।

নব একেবারে কাছে এসে দাঁড়ায় মেজগিন্নির।

মেজগিন্নি ধীরে ধীরে তার কাঁধ থেকে গামছাখানা তুলে নেয়। কম্পিত কণ্ঠে বলে—জোর করে নিলাম, রাগ ক'রেনা কিন্তক।

অসহ্য যন্ত্রণায় নবর দেহ ঝঙ্কৃত হয়ে উঠতে চায় বেহালার চরম মূর্ছনার মত। ক্ষত্রিয়সুলভ দৃঢ় সংযমে সে আত্মরক্ষার জন্যে ব্যাকুল

হয়ে ওঠে। আর নয়, আর নয়। সামনের পথ ওর আগুনজ্বালা, সেই আগুনে পুড়ে সে ছাই হয়ে যাবে কিনা কে জানে। এই মুহূর্ত, তার জীবনের সমগ্র কামনার আলো হয়ে ঝরে-পড়া এই প্রথম মুহূর্ত সে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে সেই আগুনজ্বালা পথের ওপর দিয়ে। দেহের কলুষ আর বাসনার মালিন্য বর্জিত এই লগ্নটুকু হয়ে থাক তার অক্ষয় স্বপ্ন। আর নয়, আর নয়!

খালের সাঁকোর মুখে আড়বাঁশী হাতে প্রহরারত ছেলেটির হাতে মেজগিন্নিকে সমর্পণ করে ফিরে যায় নব যেখানে তার জন্যে অপেক্ষা করছে সঙ্কল্পবদ্ধ যোদ্ধার দল।

নবর অন্ধকারে মিলিয়ে-যাওয়া দেহের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মেজগিন্নি ডেকে ওঠে—শোন, ওই শোন, আবার কবে দেখা হবে।

নব আর ফিরেও তাকায় না। তার পদক্ষেপ সুস্থির ও নিশ্চিত।

উত্তরের প্রত্যাশায় সাঁকোর মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মেজগিন্নি অনুভব করে সে কাঁদছে আর সারা অঙ্গে তার ছড়িয়ে পড়ছে সদ্য মৌচাক-ভাঙ্গা টাটকা মধুর সুগন্ধি আস্বাদ।